প্রকাশক : শ্রীমতী বিদিশা মুখোপাধ্যায়
নবার্ক
ডি সি ৯/৪ শাস্ত্রীবাগান, পোঃ দেশবন্ধুনগর
কলকাতা ৭০০ ০৫৯

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ১৯৫৯

মুদ্রক : শ্রী অসীম সাহা
দি প্যারট প্রেস
৭৬/২ বিধান সরণী, ব্লক কে-১
কলকাতা ৭০০ ০০৬

প্রচ্ছদ : শ্রী অপরূপ উকিল

মুখবন্ধ

এই মুখবন্ধ যাঁর লেখার কথা, তিনি নেই। অগত্যা সম্পাদক তাঁর হ'য়ে এই কঠিন কর্মভার আমার উপরেই ন্যস্ত করেছেন। বুদ্ধদেব বসু এই পার্থিব জগৎ থেকে বিদায় নেবার পরে এই প্রথম আবার বিরামবাবুর সম্পাদনায় তাঁর বই বেরুচ্ছে। আমার পক্ষে এর চেয়ে আনন্দের বিষয় আর কিছু নেই। বুদ্ধদেব তাঁর লেখা বিষয়ে যতো খুঁতখুঁতে ছিলেন, তার ছাপা কাগজ বানান ইত্যাদি বিষয়েও ততোই খুঁতখুঁতে ছিলেন। তাঁর সেই সতর্ক মনোযোগের একমাত্র সঙ্গী এবং বন্ধু ছিলেন বিরাম মুখোপাধ্যায়। তাঁর হাতে বই গেলে বলতেন, 'আমার অনেক ভুল হয়, কিন্তু বিরামবাবু? অসম্ভব। বিরামবাবুর চোখ আমার চেয়ে অনেক বেশী সতর্ক। মানুষ মৃত্যুর পরে কোথায় যায় জানি না, আত্মা নামে সত্যই কিছু আছে কিনা জানি না, যদি থাকে এই প্রকাশ নিশ্চয়ই তাকে তৃপ্ত করবে। বিরামবাবু আমার কাছে তাঁর এই প্রবন্ধ-নির্বাচন সঠিক হয়েছে কিনা জানতে চেয়েছিলেন, বিরামবাবুর নির্বাচনের উপর হাত দেব এমন স্পর্ধা আমার নেই। তবে বুদ্ধদেবের আরো অনেক লেখার কথা আমার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গিয়েছিলো। একটি খণ্ডে সব লেখার প্রকাশ সম্ভব নয়। এটিকে পাঠক পাঠিকারা যদি প্রথম খণ্ড হিশেবে গ্রহণ করেন তবেই ঠিক হবে।

প্রতিভা বসু

সূচিপত্র

রামায়ণ

ছন্দের আনন্দ, কবিতার উন্মাদনা জীবনে প্রথম যে বইতে আমি জেনেছিলুম, সেটি উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর 'ছোটুরামায়ণ', ছোট্ট, সচিত্র, বিচিত্র, বিচিত্র-মধুর, সে-বই ছিলো আমার প্রিয়তম সঙ্গী : যোগীন্দ্রনাথ সরকারের পদলালিত্যের আদর খেতুম, মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রের 'শিশু' পত্রিকার পাতাবাহারে চোখ জুড়োতো— কিন্তু এমন নেশা ধরতো না আর-কিছুতেই। বার-বার পড়তে-পড়তে সমস্ত বইখানা আমার রসনাগ্রে অবতীর্ণ হয়েছিলো। —কিন্তু শুধু পদাবলি আউড়েই আমার তৃপ্তি নেই, রাম-লীলার অভিনয়ও করা চাই। বাঁশের তীরধনুক হাতে নিয়ে বাড়ির উঠোনের রঙ্গমঞ্চে আমার লম্ফঝম্ফ : আমিই রাম এবং আমিই লক্ষ্মণ, আর ওই যে মাচার লাউ-কুমড়ো ফোঁটা-ফোঁটা শিশিরে সেজে আছে— ঐ হ'লো তাড়কা রাক্ষসী। সীতাকে না-হ'লেও তখন আমার চলতো, এমনকি, রাবণকে না-হ'লেও— কেন না রাম-লক্ষ্মণের বনবাসের অমন অপরূপ ফূর্তিটা মাটি হ'লো তো সীতা-রাবণের জন্যই। কী ভালো আমার লাগতো সে-সব নদী, বন, পাহাড়— পম্পা, পঞ্চবটী, চিত্রকূট— ছবির মতো এক-একটি নাম— ছবির মতো, গানের মতো, মন্ত্রের সম্মোহনের মতো উপেন্দ্রকিশোরের মুখবন্ধ :

> বাল্মীকির তপোবন তমসার তীরে,
> ছায়া তার মধুময়, বায়ু বহে ধীরে।
> খড়ের কুটিরখানি গাছের ছায়ায়,
> চঞ্চল হরিণ খেলে তার আঙিনায়।
> রামায়ণ লিখিলেন সেথায় বসিয়া,
> সে বড়ো সুন্দর কথা, শোনো মন দিয়া।

'চঞ্চল'-এর যুক্তবর্ণ নিয়ে আমার রসনা সুখাদ্যের মতো খেলা করতো, তার অনুপ্রাসের অনুরণনে বুক কাঁপতো আমার। যোগীন্দ্র সরকার পদ্য পড়িয়েছিলেন অনেক, কিন্তু কবিতার জাদুবিদ্যার সঙ্গে সেই আমার প্রথম পরিচয়।

কৃত্তিবাসের সঙ্গে পরিচয় হ'লো আরো একটু বড়ো হ'য়ে। কৃত্তিবাস আমাকে কাঁদালেন, বোধহয় দুই অর্থেই – কেন না যদিও মনে পড়ে সীতার দুঃখে চোখে জল এসেছে, তবু সে-রকম অসম্ভব ভালো লাগার কোনো স্মৃতি মনে আনতে পারি না। বয়স যখন কৈশোরের কাছাকাছি তখন একখানা মূল বাল্মীকি উপহার পেয়েছিলুম —তার পাতা ওল্টাবার মতো উৎসাহ যখন আমার হ'তে পারতো তার আগেই বইখানা হারিয়ে গেলো। আর তারপর এই এত বছর কাটলো। এর মধ্যে অনেকবার মনে

হয়েছে বাল্মীকি প'ড়ে দেখবো— অন্তত চেখে দেখবো— কিন্তু এই অপব্যয়িত জীবনের অনেক সাধু সংকল্পের মতো এটিও বিলীন হ'য়ে গেছে ইচ্ছার মায়ালোকে। কালীপ্রসন্ন সিংহের কল্যাণে মূল মহাভারতের স্বাদে আমার মতো অবিদ্বানও বঞ্চিত নয়, কিন্তু বাল্মীকি আর বাঙালির মধ্যে দেবভাষার ব্যবধান উনিশ-শতকী উদ্দীপনার দিনে কেন ঘোচানো হয় নি জানি না। হয়তো কৃত্তিবাসের অত্যধিক লোকপ্রিয়তাই তার কারণ। বলা বাহুল্য, কৃত্তিবাস বাল্মীকির বাংলা অনুবাদক নন, তিনি রামায়ণের বাংলা রূপকার; তাঁর কাব্যে রাম লক্ষ্মণ সীতা শুধু নন, দেব দানব রাক্ষসেরা সুদ্ধু মধ্যযুগীয় গৃহস্থ বাঙালী চরিত্রে পরিণত হয়েছেন, গ্রন্থটির প্রাকৃতিক এবং মানসিক আবহাওয়া একান্তই বাংলার। এ-কাব্যে বাঙালীর মনের মতো হ'তে পারে, এমনকি বাংলা সাহিত্যে পুরাণের পুনর্জন্মের প্রথম উদাহরণ ব'লেও গণ্য হ'তে পারে, কিন্তু এর আত্মার সঙ্গে বাল্মীকির আত্মার প্রভেদ রবীন্দ্রনাথের 'কচ ও দেবযানী'র সঙ্গে মহাভারতের দেবযানী-উপাখ্যানের প্রভেদের মতোই, মাপে ঠিক ততটা না-হ'লেও জাতে তা-ই। আমাদের আধুনিক কবি-ঠাকুরদের প্রশংসায় আমরা কখনো ক্লান্ত হবো না, কিন্তু সেই সঙ্গে এ-কথাও মনে রাখবো যে আদিকবিদের চরিত্রলক্ষণ জানতে হ'লে আদিকবিদেরই শরণাগত হ'তে হবে। ভুল করবো, মারাত্মক ভুল, যদি মনে করি কৃত্তিবাসের রম্য কাননে আদিকবির, মহাকাব্যের, ধ্রুপদী সাহিত্যের, ফল কুড়োনো সম্ভব। বাল্মীকিতে রামের বনবাসের খবর পেয়ে লক্ষ্মণ খাঁটি গোঁয়ারের মতো বলছেন, 'ওই কৈকেয়ী-ভজা বুড়ো বাপকে আমি বধ করবো'; বনবাসের উদ্যোগের সময় রাম সীতাকে বলছেন, 'ভরতের সামনে আমার প্রশংসা কোরো না, কেন না ঋদ্ধিশালী পুরুষ অন্যের প্রশংসা সইতে পারে না'; এবং লঙ্কাকাণ্ডে যুদ্ধের পরে সীতাকে যখন রাম পরিত্যাগ করলেন, তখন সীতা তাঁকে বললেন প্রাকৃতজন, অর্থাৎ ছোটোলোক— এই সমস্তই, সতীত্ব, ভ্রাতৃত্ব ও পুত্রত্বের আদর্শরক্ষার খাতিরে বর্জন করেছেন ব'লে দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় কৃত্তিবাসকে তারিফ করেছেন। হয়তো তারিফ করাটা ঠিকই হয়েছে, হয়তো এর ঐতিহাসিক কারণ ছিলো, তৎকালীন বঙ্গসমাজের পটভূমিকায় এর সমর্থনও হয়তো খুঁজে পাওয়া সম্ভব— কিন্তু সে-সব যা-ই হোক, এই বর্জনে আদিকবির আত্মা যে উবে গেলো তাতে সন্দেহ নেই। আদিকবির লক্ষণ, পৃথিবীর আদি মহাকাব্যগুলির বৈশিষ্ট্য আমি যা বুঝেছি, তার নাম দিতে পারি বাস্তবতা, সে-বাস্তবতা এমন সম্পূর্ণ, নিরাসক্ত ও নির্মম যে তার তুলনায় আধুনিক পাশ্চাত্ত্য রিয়ালিজ্‌ম-এর চরম নমুনাও মনে হয় দয়ার্দ্র। যাকে বলা যায় সম্পূর্ণ সত্য, মহাকাব্য তারই নির্বিকার দর্পণ; মহাকাব্যে ট্র্যাজেডির মত্ততা নেই, কমেডির উচ্ছলতা নেই; তাতে গলা কখনো কাঁপে না, গলা কখনো চড়ে না; বড়ো ঘটনা আর ছোটো ঘটনায় ভেদ নেই— সমস্তই সমান, আগাগোড়াই সমতল— এবং সমস্তই ঈষৎ ক্লান্তিকর। বস্তুত, মহাকাব্য তো পৃথিবীর সেই কিশোর বয়সের সৃষ্টি, যখন পর্যন্ত সাহিত্য একটি সচেতন শিল্পকর্মরূপে মানুষের মনে প্রতিভাত হয় নি; এবং পরবর্তীকালে সাহিত্যকলার বিচিত্র ঐশ্বর্য

যুগ-যুগ ধ'রে অবিরাম উদ্ভাসিত হ'তে পারতো না, যদি আদিকাব্যের সেই কৈশোর-সরলতাকে, সেই অচেতন সত্যনিষ্ঠাকে মানুষ চিরকালের মতো পরিত্যাগ না-করতো। মহাকাব্যের বাস্তবতা এমনই নির্ভীক যে সংগতিরক্ষার দায় পর্যন্ত তার নেই; তুচ্ছ আর প্রধানকে সে পাশাপাশি বসায়, কিছু লুকোয় না, কিছু ঘুরিয়ে বলে না, বড়ো বড়ো ব্যাপার দু-তিন কথায় সারে, এবং সবচেয়ে বড়ো ব্যাপারে কিছুই হয়তো বলে না। মানবস্বভাবের কোনো মন্দেই তার চোখের পাতা যেমন পড়ে না, তেমনি ভালোর অসম্ভব আদর্শকেও নিতান্ত সহজে সে চালিয়ে দেয়। সেইজন্য মহাভারতে দেখতে পাই চিরকালের সমস্ত মানবজীবনের প্রতিবিম্বন: তাতে এমন মন্দেরও সন্ধান পাই যাতে এই ঘোর কলিতে আমরা আঁৎকে উঠি, আবার ভালোও অপরিসীম ও অনির্বচনীয়রূপে ভালো; জীবনের এমন-কোনো দিক নেই, মনের এমন-কোনো মহল নেই, দৃষ্টির এমন-কোনো ভঙ্গি নেই, যার সঙ্গে মহাভারত আমাদের পরিচয় করিয়ে না দেয়। শুধু পৃষ্ঠাসংখ্যায় নয়, জীবনদর্শনের ব্যাপ্তিতেও রামায়ণ অনেকটা ছোটো; কিন্তু কাব্য হিশেবে — এবং কাহিনী হিশেবেও— তাতে ঐক্য বেশি, এবং আমরা যাকে কবিত্ব বলি তাতে রামায়ণ সম্ভবত সমৃদ্ধতর। এটা ভালোই, যদি আধুনিক সাহিত্যের ঐশ্বর্যজটিল বিশাল প্রাসাদ ছেড়ে আমরা কখনো-কখনো বেরিয়ে পড়ি বাল্মীকির তপোবনে, পৃথিবীর কৈশোর-সারল্যে, মানবজাতির শৈশবের স্বতঃস্ফূর্ততায়।

দুই

ভালো নিশ্চয়ই, কিন্তু যাতায়াতের পথ বিঘ্নবহুল। সে-পথ সম্প্রতি সুগম ক'রে দিলো শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু-কৃত বাল্মীকি-রামায়ণের সারানুবাদ। হাস্যরসিক আর ফলিত বিজ্ঞানীর, ভাষাবিজ্ঞানী আর ভাষাশিল্পীর যে সমন্বয় বসু-মহাশয়ে ঘটেছে, এই বিশেষীকরণের যুগে তা রীতিমতোই বিরল; এবং অধুনা তাঁর রঙ্গস্রোত প্রায়-রুদ্ধ ব'লে আমরা যতই না আক্ষেপ করি, সেই সঙ্গে এ-কথাও বলতে হয় যে তাঁর অবিশ্রাম সক্রিয়তাই আমাদের সৌভাগ্য। বিশেষত এই রকম সময়ে, যখন দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর রুশ ও মার্কিন লেখকদের বঙ্গানুবাদে বাঙালীর লেখনী এবং দুর্লভ কাগজ ও মুদ্রাযন্ত্র ভূরিপরিমাণে ক্ষয়িত হচ্ছে, তখনো যে বাল্মীকি অনুবাদ করবার মতো মানুষ দেশে পাওয়া গেলো, উপরন্তু সে-গ্রন্থের প্রকাশকও জুটলো, তাতে এমন আশা করবারও সাহস হয় যে বইখানা কেউ-কেউ প'ড়েও দেখবেন। অন্তত, বসু-মহাশয় সাধারণ পাঠকের পথে একটি কাঁটাও প'ড়ে থাকতে দেন নি; সংক্ষেপী-করণের নৈপুণ্যদ্বারা গ্রন্থের কলেবর সাধারণের পক্ষে সহনীয় করেছেন, অনুবাদ করেছেন গদ্যে, সহজ সরল বাংলায়, অপরিহার্য অল্প কিছু পাদটীকা মাত্র দিয়েছেন, ভূমিকা যেটুকু লিখেছেন তাতেও পাণ্ডিত্যের ভার চাপান নি। বস্তুত, বইখানা উপন্যাসের মতো আরামে প'ড়ে ওঠার কোনো বাধা যদি থাকে, সে শুধু মাঝে-মাঝে উদ্ধৃত বাল্মীকির মূল শ্লোকাবলি; আর সেগুলিও, বসু-মহাশয় ভূমিকায় ব'লেই

দিয়েছেন (বোধহয় আমাদের শ্রমবিমুখতাকে ব্যঙ্গ ক'রেই), পাঠক ইচ্ছে করলে 'অগ্রাহ্য করতে পারেন'। কিন্তু কোনো অর্থেই গ্রহণের অযোগ্য নয় সেগুলি; সংস্কৃতের সঙ্গে অল্পস্বল্প মুখচেনা যাঁদের আছে, এমন পাঠকেরও একটু খোঁচাতেই সন্ধি-সমাসের ফাঁকে-ফাঁকে রস ঝরবে, কেন না সৌভাগ্যক্রমে বাল্মীকির সংস্কৃত খুব সহজ। রাজশেখর বসুকে ধন্যবাদ, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে বর্ষা ও শরৎঋতুর মধুর বর্ণনাটুকু বাল্মীকির মুখেই তিনি আমাদের শুনিয়েছেন— এ-বর্ণনা কৃত্তিবাস বেমালুম বাদ দিয়েছেন ব'লে তাঁকে প্রশংসা করা যায় না, কেন না কবিত্ব, নাটকীয়তা এবং চরিত্রণ— তিন দিক থেকেই এই ঋতু-বিলাস সুসংগত ও সুন্দর। ঘনজটিল বনের মধ্যে চলতে-চলতে হঠাৎ যেন একটি স্বচ্ছনীল হ্রদের ধারে এলুম, সেখানে নৌকো আমাদের তুলে নিয়ে জলের গান শোনাতে লাগলো; ওপারে জটিলতর পথ, কুটিলতম কাঁটা— কিন্তু এই অবসরটুকু এমন মনোহরণ তো সেইজন্যই। বনবাসের দুঃখ, সীতা-হারানোর দুঃখ, বালীবধের উত্তেজনা ও অবসাদ— সমস্ত শেষ হয়েছে, সামনে প'ড়ে আছে মহাযুদ্ধের বীভৎসতা: দুই ব্যস্ততার মাঝখানে একটু শান্তি, সৌন্দর্য-সম্ভোগের বিশুদ্ধ একটু আনন্দ। এই বিরতির প্রয়োজন ছিলো সকলেরই —কাব্যের, কবির এবং পাঠকের, আর সবচেয়ে বেশি রামের। বর্ণনার শ্লোকগুলি রামের মুখে বসিয়ে বাল্মীকি সুতীক্ষ্ণ নাট্যবোধের পরিচয় দিয়েছেন। বালস্বভাব লক্ষ্মণের সীতা-উদ্ধারের চিন্তা ছাড়া আর-কিছুতে মন নেই; শান্ত, শুদ্ধশীল রাম তাকে ডেকে এনে দেখাচ্ছেন বর্ষার বৈচিত্র্য, শরতের শ্রীলতা। বিরহী রামের সঙ্গে বিরহী যক্ষের তুলনা করলেই আমরা আদিকাব্যের সঙ্গে উত্তরকাব্যের চারিত্রিক প্রভেদ বুঝতে পারি: আদিকাব্যে সম্পূর্ণ সত্যের নিরঞ্জন প্রশান্তি, উত্তরকাব্যে খণ্ডিত সত্যের উজ্জ্বল বর্ণবিলাস। সীতার বিরহে রাম ক্লিষ্ট, কিন্তু অভিভূত নন; যদিও মুখে তিনি দু-চার বার আক্ষেপ করছেন, আসলে সীতার অভাব তাঁর প্রকৃতিসম্ভোগের অন্তরায় হ'লো না; আবার মেঘ দেখেই কালো চুল কিংবা চাঁদ দেখেই চাঁদমুখ স্মরণ ক'রে আকুল হলেন না তিনি। অথচ যক্ষের বিরহের চাইতে রামের বিরহ অনেক নিষ্ঠুর, রামের দুঃখ লক্ষ্মণের শতগুণ। সীতা কাছে নেই ব'লে প্রকৃতির সৌন্দর্যের উপর অভিমান করলেন না রাম, তার গলা জড়িয়েও কাঁদলেন না: সৌন্দর্যে তাঁর নিষ্কাম, নৈর্ব্যক্তিক আনন্দ, যেমন শিল্পীর। এর আগে এবং পরে নিসর্গ-বর্ণনার আরো অনেক সুযোগ ছিলো, কিন্তু বাল্মীকি সে-সমস্তই উপেক্ষা ক'রে গেছেন, কেন না এর আগে এবং পরে রাম নিরন্তর কর্মজালে জড়িত— এইখানেই, এই যুদ্ধযাত্রার পূর্বাহ্নে রামের একটু সময় হ'লো: ভাবখানা এইরকম যেন নিরিবিলি ব'সে ঘাস, গাছ, আকাশ দেখতে তাঁর ভালোই লাগছে; যেন হৃদয়হীন যুদ্ধ আসন্ন জেনেই এই বিরল অবসরটুকুতে তিনি সীতার কথা ভাবছেন না, রাবণ বা সুগ্রীবের কথাও না— কিছু ভাবতে গেলেই যুদ্ধের কথা ভাবতে হয়, তাই কিছুই ভাবছেন না তিনি, মনকে শুধু ছড়িয়ে দিচ্ছেন সেই সবুজ বনে, যে-বনভূমি

ক্বচিৎ প্রগীতা ইব ষট্‌পদৌঘৈ
ক্বচিৎ প্রনৃত্তা ইব নীলকণ্ঠৈঃ
ক্বচিৎ প্রমত্তা ইব বারণেন্দ্রৈ :...[১]

তিন

আরো একটি কারণে কৃত্তিবাস যথেষ্ট নন, বাল্মীকির সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় আমাদের প্রয়োজন। সে-কারণ কী, এই গ্রন্থের ভূমিকাতেই তো বলা আছে, এবং বইখানা প'ড়ে আমারা শুধু সকৌতুকে নয়, সহর্ষেও জানি যে রাম-লক্ষ্মণেরা প্রচুর মাংস খেতেন, সব রকম মাংস খেতেন, গোসাপের মাংসও বাদ যেতো না— এমনকি অমাংসভোজনকে তাঁরা বলতেন উপবাস। সুরাতেও বিমুখ ছিলেন না তাঁরা— রাম নিজের হাতে সীতাকে মৈরেয় মদ্য পান করাচ্ছেন ; আর হনুমান সীতার খবর নিয়ে লঙ্কা থেকে ফেরবার পর বানরদল যে-মাৎলামিটা করলে, রাম সেটার শাসন করলেন কিন্তু নিন্দা করলেন না। এই মধুবনের বৃত্তান্তটা— বোধহয় ভোক্তারা বানর ব'লেই কৃত্তিবাস গোপন করেন নি ; কিন্তু রামান্বেষী ভরতের সৈন্যদলকে ভরদ্বাজ যে-রকম আপ্যায়ন করলেন, সেটা কৃত্তিবাসের সহ্য হ'লো না। পাশাপাশি দুটি অংশ তুলে দেখালেই আমার বক্তব্য বোঝা যাবে :

এমন সময় ব্রহ্মা ও কুবের কর্তৃক প্রেরিত বহু সহস্র স্ত্রী দিব্য আভরণে ভূষিত হয়ে উপস্থিত হ'ল। তারা যে পুরুষকে গ্রহণ করে তারা উন্মাদের তুল্য হয়। কাননের বৃক্ষসকল প্রমদার রূপ ধারণ ক'রে বলতে লাগল।
—সুরাপায়িগণ সুরা পান কর ; বুভুক্ষিতগণ পায়স ও সুসংস্কৃত মাংস যা ইচ্ছা খাও। এক এক জন পুরুষকে সাত আট জন সুন্দরী স্ত্রী নদীতীরে নিয়ে গিয়ে স্নান করিয়ে অঙ্গসংবাহন ক'রে মদ্যপান করাতে লাগল। পানভোজনে এবং অপ্সরাদের সহবাসে পরিতৃপ্ত সৈন্যগণ রক্তচন্দনে চর্চিত হ'য়ে বললে,
—আমরা অযোধ্যায় যাব না, দণ্ডকারণ্যেও যাব না, ভরতের মঙ্গল হ'ক, রাম সুখে থাকুন।
যারা একবার খেয়েছে, উৎকৃষ্ট খাদ্য দেখে আবার তাদের খেতে ইচ্ছা হ'ল। সকলে বিস্মিত হয়ে আতিথ্যের উপকরণসম্ভার দেখতে লাগল— স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্রে অন্ন, ফলরসের সহিত পক্ক সুগন্ধ সূপ, উত্তম ব্যঞ্জন এবং ছাগ ও বরাহের মাংস, স্থালীতে পক্ক মৃগ ময়ূর ও কুক্কুটের মাংস, দধিদুগ্ধপূর্ণ অসংখ্য কলস, স্নান ও দন্ত-মার্জনের উপকরণ, দর্পণ, বস্ত্র, পাদুকা, শয্যা প্রভৃতি। ভরতের সৈন্যেরা মদ্যপানে মত্ত হ'য়ে নন্দনকাননে দেবগণের রাত্রি যাপন করলে। গন্ধর্ব অপ্সরা প্রভৃতি নিজ নিজ স্থানে ফিরে গেল। (রাজশেখর বসুর অনুবাদ)

ভোজনে বসিল সৈন্য অতি পরিপাটি।
স্বর্ণপীঠ স্বর্ণথাল স্বর্ণময় বাটি ॥

স্বর্ণের ডাব্বর আর স্বর্ণময় ঝারি।
স্বর্ণময় ঘরেতে বসিল সারি সারি ॥
দেবকন্যা অন্ন দেয় সৈন্যগণ খায়।
কে পরিবেশন করে জানিতে না পায় ॥
নির্মল কোমল অঙ্গ যেন যূথিফুল।
খাইল ব্যঞ্জন কিন্তু মনে হৈল ভুল ॥
ঘৃত দধি দুগ্ধ মধু মধুর পায়স।
নানাবিধ মিষ্টান্ন খাইল নানারস ॥
চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় সুগন্ধি সুস্বাদ।
যত পায় তত খায় নাহি অবসাদ ॥
কণ্ঠাবধি পেট হৈল বুক পাছে ফাটে।
আচমন করিয়া ঠাট কষ্টে উঠে খাটে ॥
মন্দ মন্দ গন্ধবহ বহে সুললিত।
কোকিল পঞ্চম স্বরে গায় কুহুগীত ॥
মধুকর মধুকরী ঝংকারে কাননে।
অপ্সরা নৃত্য করে গীত আলাপনে ॥
অনন্ত সামন্ত সৈন্য সেই গীত শুনি।
পরম আনন্দে বঞ্চে বসন্তরজনী ॥
সবে বলে দেশে যাই হেন সাধ নাই।
অনায়াসে স্বর্গ মোরা পাইনু হেতাই ॥
এ-সুখ এ-সংসারে কেহ নাহি করে।
যে যার সে যাউক আমি না যাইব ঘরে ॥ (কৃত্তিবাস)

কত দূরে বাল্মীকি থেকে কৃত্তিবাস, দুয়ের আত্মায় ব্যবধান কী দুস্তর! অন্য সব প্রসঙ্গের মতো, ইন্দ্রিয়সুখের প্রসঙ্গেও বাল্মীকি একেবারে বৈকুণ্ঠ, তাই— যদিও ক্ষণিক, যদিও অলীক— বৈকুণ্ঠকেই আমাদের চোখের সামনে এনেছেন তিনি, কাম-কল্পনার পরমতাকে ; আর কৃত্তিবাসের মনে সংকোচ আছে ব'লে ভরদ্বাজের আশ্চর্য আতিথ্যে তিনি শুধু দেখেছেন ঔদরিকতার আকণ্ঠ উদারতা। বাল্মীকি ভরতসেনার মনে দেবত্বের বিভ্রম জন্মিয়েছেন, রাম-ভরত সম্বন্ধে তাদের উদাসীনতা যেন পদ্মভুকের আবেশ ; আর কৃত্তিবাসের সৈন্যসামন্ত যেন প্রাকৃত জন, শাক-ভাত খেয়ে মানুষ, হঠাৎ বড়োদরের নেমন্তন্ন পেয়ে এত খেয়ে ফেলেছে যে আর নড়তে পারছে না। বাল্মীকির ভোজ্যতালিকা সুষম, সম্পূর্ণ এবং রাজকীয় ; মদ্য-মাংস বাদ দিতে গিয়ে কৃত্তিবাস সুবৃহৎ ফলারের বেশি কিছু জোটাতে পারেন নি। জীবনের যেটা পার্থিব দিক, তাতে ভারতের প্রাচীন সভ্যতা যে উদাসীন বা অনিপুণ ছিলো না, বাল্মীকিতে তার প্রমাণ প্রচুর— কিন্তু সেটা কিছু জরুরি কথা নয়, আর সে-কথা প্রমাণ করারই বা গরজ কিসের। শুধু এইটুকু ব'লে এ-প্রসঙ্গ শেষ করা যাক যে কৃত্তিবাস যে-

সভ্যতার প্রতিভূ তার অশন-বসন 'রীতি-নীতি সবই অনেকটা নিচু স্তরের ; আর বাল্মীকি, যদিও তপোবনবাসী ব'লে কথিত, তবু তিনি রাজধানীরই মুখপাত্র, শ্রেষ্ঠ অর্থে নাগরিক, তুলনায় কৃত্তিবাসকে মনে হয় রাজার দ্বারা বৃত হ'য়েও প্রাদেশিক, কেন না তাঁর রাজা নিজেই তা-ই। বিশ্বাসী বাল্মীকির পাশে কৃত্তিবাস বাঙালী মাত্র, শুধু বাঙালী ; অর্থাৎ বাঙাল।

চার

রামায়ণের সবচেয়ে বড়ো সমস্যা রাম-চরিত। যে-রামের নাম করলে ভূত ভাগে, সেই রাম নিষ্ঠুর অন্যায় করেছেন একাধিকবার। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে রামকে 'অন্য সমালোচনার আদর্শে' বিচার করাই চলবে না, ভেবে দেখতে হবে, যুগ-যুগ ধ'রে ভারতীয় মনে তাঁর কোন মূর্তিটি গ'ড়ে উঠেছে। রামচন্দ্রের এই প্রতিপত্তির মূল কোথায় তাও রবীন্দ্রনাথ বিশ্লেষণ ক'রে দেখিয়েছেন : রাম বালীবধ ক'রে সুগ্রীবকে রাজা করলেন, রাবণ-বধ ক'রে বিভীষণকে ; কোনো রাজত্বই নিজে নিলেন না ; মিতালি করলেন চণ্ডালের সঙ্গে, বানরের সঙ্গে, এই উপায়ে, অভ্রান্ত কূটনীতির দ্বারা, আর্য-অনার্যে সম্পূর্ণ মিলন ঘটিয়ে বিশাল ভারতের ঐক্যসাধন করলেন, ভারতীয় ইতিহাস সম্ভবত প্রথমত সেই ঐক্যসাধন। কালক্রমে তাঁর আদি কাহিনীর 'মুখে-মুখে রূপান্তর ও ভাবান্তর' হ'তে লাগলো ; গণমানসে তিনি প্রতিভাত হলেন লোকোত্তর পুরুষরূপে, এমনকি অবতার-রূপে। রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা অনুসরণ ক'রে বলা যায় যে আদি রামের মহিমা অনেকটা জুলিয়স সীজারের অনুরূপ ; যে রাম-রাজ্য আর সাম্রাজ্য আসলে অভিন্ন ; যে সাম্রাজ্যবাদের উচ্চতম আদর্শের মহত্তম ব্যঞ্জনা যেমন সীজার-জীবনে, তেমনি রাম-চরিতে। তিনি যে একজন শ্রেষ্ঠ কূটনীতিজ্ঞ, বাল্মীকি প'ড়ে তা ভালোই জানা যায় ; শ্রেষ্ঠ এই কারণে যে কূটনীতির সঙ্গে ধর্মনীতিকে তিনি মোটের উপর মেলাতে পেরেছেন, যদিও মুমূর্ষু বালীর কানে তার নিধনের সমর্থনে যে-কথাগুলি তিনি জপলেন তাতে প্রকারান্তরে এই কথাই বলা হ'লো যে রাজনীতির ক্ষেত্রে নামলে অন্যায় থেকে অবতারেরও ত্রাণ নেই। ...কিন্তু এইজন্যই কি রাম এত বড়ো ? মস্ত বীর, মস্ত রাজা ব'লে ? সাম্রাজ্যের অতুলনীয় স্থপতি ব'লে ?

অনেকটা রবীন্দ্রনাথের কথাই মেনে নিয়ে বসু-মহাশয়ও ভূমিকায় বলেছেন যে আধুনিক যুগের সংস্কার নিয়ে রামায়ণ বিচার সম্ভব নয়। যেমন, তিনি যুক্তি দিয়েছেন, রাজ্যের খাতিরে ভার্যাত্যাগ আমাদের কাছে দুঃসহ, তেমনি রামচন্দ্রের আজীবন একপত্নীত্ব যে সেই হারেমবিলাসী যুগে কত বড়ো আদর্শের প্রতিরূপ, সেটাও আমাদের উপলব্ধির বহির্ভূত। ...কিন্তু রামচন্দ্রকে কি আমরা বিচার করবো শুধু তৎকালীন সমাজ-ব্যবস্থা অনুসারে ? তাঁর মধ্যে মনুষ্যত্বের চিরকালের আদর্শ যদি দেখতে না-পেলাম, তবে তিনি রাম কিসের। একটি বই স্ত্রী তাঁর ছিলো না, সেইজন্য কি তিনি বড়ো ? না কি আদর্শ পুত্র, আদর্শ ভ্রাতা, আদর্শ বন্ধু, আদর্শ

শত্রু ব'লে? শুধু এটুকুর জন্যই, কিংবা এই সমস্ত-কিছুর জন্যই, কি রামচন্দ্রের মহিমা?

আধুনিক পাঠকের চোখে রাম রীতিমতো অ-রাম হ'য়ে ওঠেন তাঁর সীতা-বর্জনের সময়। অগ্নিপরীক্ষা তো সীতার নয়, রামের, আর সে-পরীক্ষার বিচারক আমরা। যুদ্ধ শেষ হ'লো; রাবণের মৃত্যু হ'লো; রাম বিভীষণকে বললেন, সীতাকে নিয়ে এসো আমার কাছে, সে স্নান ক'রে শুদ্ধ হ'য়ে আসুক। সীতা বললেন, স্নান? তাতে দেরি হবে— আমাকে এখনই নিয়ে চলো। কিন্তু স্নান তাঁকে করতে হ'লো, সাজতেও হ'লো, পাল্কি থেকে নামলেন রামের সভায়, বানর রাক্ষস ভল্লুকের ভিড়ে। কতকাল পরে দেখা! কত দুঃখের পরে! 'লজ্জায় যেন নিজের দেহে লীন হ'য়ে' স্বামীর মুখের উপর চোখ রাখলেন সীতা, আর তখন, তখনই, সেই রাক্ষস বানর ভল্লুকের ভিড়ে এত দুঃখে ফিরে-পাওয়া সীতাকে প্রথম দেখে কী-কথা বললেন রাম? বললেন:

> আমি যুদ্ধে শত্রু জয় ক'রে তোমাকে উদ্ধার করেছি, পৌরুষ দ্বারা যা করা যায় তা আমি করেছি। আমার ক্রোধ ও শত্রুকৃত অপমান দূর হয়েছে, প্রতিজ্ঞা পালিত হয়েছে। আমার অনুপস্থিতিতে তুমি চপলমতি কর্তৃক অপহৃত হয়েছিলে তা দৈবকৃত দোষ, আমি মানুষ হ'য়ে তা ক্ষালন করেছি। ...তোমার মঙ্গল হোক। তুমি জেনো এই রণপরিশ্রম সুহৃদ্‌গণের বাহুবলে যা থেকে মুক্ত হয়েছি এ তোমার জন্য করা হয় নি। নিজের চরিত্র রক্ষা, সর্বত্র অপবাদ খণ্ডন এবং আমার বিখ্যাত বংশের গ্লানি দূর করবার জন্যই এই কার্য করেছি। তোমার চরিত্রে আমার সন্দেহ হয়েছে, নেত্ররোগীর সম্মুখে যেমন দীপশিখা, আমার পক্ষে তুমি সেইরূপ কষ্টকর। তুমি রাবণের অঙ্কে নিপীড়িত হয়েছ, সে তোমাকে দুষ্ট চক্ষে দেখেছে, এখন যদি তোমাকে পুনর্গ্রহণ করি তবে কি ক'রে নিজের মহৎ বংশের পরিচয় দেব? যে উদ্দেশ্যে তোমাকে উদ্ধার করেছি তা সিদ্ধ হয়েছে, এখন আর তোমার প্রতি আমার আসক্তি নেই, তুমি যেখানে ইচ্ছা যাও। আমি মতি স্থির ক'রে বলছি... লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন সুগ্রীব বা রাক্ষস বিভীষণ, যাঁকে ইচ্ছা কর তাঁর কাছে যাও, অথবা তোমার যা অভিরুচি তা কর। সীতা, তুমি দিব্যরূপা-মনোরমা, তোমাকে স্বগৃহে পেয়ে রাবণ অধিককাল ধৈর্যাবলম্বন করে নি। (রাজশেখর বসুর অনুবাদ)

ছী-ছি— আমাদের সমস্ত অন্তরাত্মা কলরোল ক'রে ব'লে ওঠে— ছী-ছি! বিশেষ ক'রে ওই শেষের কথাটা— লক্ষ্মণ ভরত সুগ্রীব বিভীষণ যার কাছে ইচ্ছা যাও— কী ক'রে রামচন্দ্র মুখে আনতে পারলেন, ভাবতেই বা পেরেছিলেন কী ক'রে! এ তো শুধু হৃদয়হীন নয়, রুচিহীন; 'নীচ ব্যক্তি নীচ স্ত্রীলোককে যেমন বলে', এ তো তেমনি, সীতার এই উত্তর আমাদের সকলেরই মনের কথা। আর এখানেই শেষ নয়; অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনের পর আবার সীতা-বিসর্জন; যদিও রামচন্দ্রের আন্তরাত্মা জানে যে সীতা শুদ্ধশীলা, তবু বাজে লোকেদের বাজে কথায়

কানে তুলে সীতাকে তিনি নির্বাসনে পাঠালেন— পাঠালেন ফাঁকি দিয়ে, যেন সীতার আশ্রমদর্শনের ইচ্ছা পূর্ণ করছেন, এই রকম ভান ক'রে। আবার বিরহ! কিন্তু রামের বিরহদুঃখের কোনো কথাই এবার আমরা শুনলুম না ; রাজকার্যে নিবিষ্ট দেখলুম তাঁকে, যতদিন না অশ্বমেধ-যজ্ঞসভায় লবকুশকে দেখে তাঁর হৃদয় উদ্বেল হ'লো। তাঁর আহ্বানে স্বয়ং বাল্মীকি এলেন সীতাকে নিয়ে সেই সভায়। সে-বার লঙ্কায় দর্শক ছিলো শুধু রাক্ষস বানর ভল্লুকের দল : এ-বার রাজসভায়, যজ্ঞভূমিতে, সকল গুরুজনেরা উপস্থিত, শ্রেষ্ঠ মুনিগণ উপবিষ্ট, রাক্ষস বানর এবং 'বহু সহস্র ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র কৌতূহলী হ'য়ে এল', শেষপর্যন্ত স্বর্গের দেবতারাও না-এসে পারলেন না। ত্রিলোকের অধিবাসীর সামনে আবার সীতার পরীক্ষা— কিন্তু এ-পরীক্ষাও রামচন্দ্রের, আর বিচারক আমরা। সীতা মুখ নিচু ক'রে নিঃশব্দ, তাঁর হ'য়ে কথা বললেন বাল্মীকি : উত্তরে রাম বললেন :

> ...ধর্মজ্ঞ, আপনি যা বললেন সমস্তই বিশ্বাস করি। ...লোকাপবাদ বড় প্রবল, তার ভয়েই এঁকে অপাপা জেনেও পুনর্বার ত্যাগ করেছিলাম আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। ...জগতের সমক্ষে শুদ্ধস্বভাবা মৈথিলীর প্রতি আমার প্রীতি উৎপন্ন হ'ক।

রাম সীতাকে গ্রহণ করবেন, সে-জন্য অনুমতি চাচ্ছেন জগতের! এত দুঃখ সইতে পেরেছেন যে-সীতা, এ-দুঃখ তাঁর সইলো না,

> ...রাম ভিন্ন আর কাকেও জানি না— এই কথা যদি সত্য ব'লে থাকি তবে মাধবী দেবী বিদীর্ণ হ'য়ে আমাকে আশ্রয় দিন—

এই ব'লে তিনি পৃথিবীর বিবরে প্রবেশ করলেন।

সীতার দুঃখে পুরুষানুক্রমে আমরা কেঁদে আসছি। শ্রীযুক্ত বসুও তাঁর ভূমিকায় প্রশ্ন করেছেন : 'দু-দুবার সীতাকে নিগৃহীত করবার কী দরকার ছিল?' উত্তরকাণ্ড বাল্মীকির রচনা নয়, এই পণ্ডিতপোষিত অনুমানে সান্ত্বনা, খুঁজেছেন তিনি* কিন্তু উত্তরকাণ্ড না-থাকলে রামায়ণ এত বড়ো কাব্যই তো হ'তো না। লঙ্কায় অগ্নি-পরীক্ষার পর সীতা লক্ষ্মী মেয়ের মতো রামের কোলে ব'সে পুষ্পকে চ'ড়ে অযোধ্যায় এলেন, আর তারপর ঘরকন্না ক'রে বাকি জীবন সুখে কাটালেন— এই যদি রামায়ণের শেষ হ'তো, তাহ'লে কি সমগ্র ভারতীয় জীবনে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে রামায়ণের প্রভাব এমন ব্যাপক, এমন গভীর হ'তে পারতো? বাল্মীকি যদি উত্তরকাণ্ড না-লিখে থাকেন, তবে সেইটুকু বাল্মীকিত্বে তিনি ন্যূন। উত্তরকাণ্ড যে-কবির রচনা তিনি বাল্মীকি না হোন, বাল্মীকিপ্রতিম নিশ্চয়ই : বস্তুত, রামায়ণকে অমর কাব্যে পরিণত করলেন তিনিই। যে-সীতার জন্য এত দুঃখ, এত যুদ্ধ, এমন সুদীর্ঘ ও সুতীব্র উদ্যম, সেই সীতাকে পেয়েও হারাতে হ'লো, ছাড়তে হ'লো স্বেচ্ছায়, এই কথাটাই তো রামায়ণের অন্তঃসার। যে-রাজ্য নিয়ে অত বড়ো কুরুক্ষেত্র ঘ'টে গেলো, সে-রাজ্য কি পাণ্ডবেরা ভোগ করেছিলেন? সব পেয়েও সব ছেড়ে গেলেন তাঁরা, বেরিয়ে পড়লেন মহাপ্রস্থানের মহানির্জনে। যুদ্ধে যখনই জয় হ'লো, রামও

তখনই সীতাকে ত্যাগ করতে প্রস্তুত।...'কর্মে তোমার অধিকার, কিন্তু ফলে নয়।' ...রামের যুদ্ধ, পাণ্ডবের যুদ্ধকে ধর্মযুদ্ধ বলেছে তো এইজন্যই। তা না-হ'লে লোভীর সঙ্গে লোভীর যে-সব দ্বন্দ্ব মানুষের ইতিহাসে চিরকাল ধ'রে ঘ'টে আসছে, তার সঙ্গে এ-সবের প্রভেদ থাকতো না। লোভীর বিরুদ্ধে যে অস্ত্র ধরে, সে নিজেও লোভী ব'লে আধুনিক যুদ্ধে বীভৎসতা, শুধু হত্যার বীভৎসতা ; কিন্তু পাণ্ডবের যুদ্ধে, রামের যুদ্ধে ফলে অধিকার নেই, অধিকার শুধু কর্মে— আর তাই তার শেষ ফল চিত্তশুদ্ধি।

পাঁচ

রাম তাঁর কর্মকে মেনে নিয়েছেন। পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে কোন ভূমিকায় তিনি অবতীর্ণ তা তিনি জানেন, আর জীবনের প্রত্যেক অবস্থায়, সুখে এবং দুঃখে, সম্পদে এবং সংকটে সেই ভূমিকাটি সুসম্পন্ন করতে তিনি যথাসাধ্য সচেষ্ট। তাই তিনি অধৈর্যহীন, অক্লিষ্টকর্মা, শান্ত, শ্যামল, নিষ্কাম। বিপদে তিনি বিচলিত, কিন্তু বিহ্বল নন, সৌভাগ্যে তিনি প্রমত্ত নন, যদিও প্রীত। স্বর্ণমৃগ যখন মৃত্যুকালে স্বরূপ ধারণ করলে, তখন, রাক্ষসের মায়া বুঝতে পেরেও, রাম খুব বেশি ব্যস্ত হলেন না, 'অন্য মৃগ বধ ক'রে মাংস নিয়ে' তবে বাড়ি ফিরলেন। সীতা উদ্ধারের উদ্যোগ প্রারম্ভ হবার আগেই বর্ষা নামলো মাল্যবান পর্বতে, এই নিদারুণ সংকটে চার মাস চুপ ক'রে ব'সে থাকতে হবে ব'লে মুহূর্তের জন্য চঞ্চল হলেন না, বরং এই অনভিপ্রেত নিষ্ক্রিয়তাকে বর্ষা-শরতের লীলাক্ষেত্র ক'রে তুললেন, আর শরতের শেষে যুদ্ধারম্ভের জন্য লক্ষ্মণকেই দেখা গেলো বেশি উদগ্রীব। রাম অধৈর্যহীন, বৈক্লব্যহীন, রাম ধীর স্নিগ্ধ গম্ভীর ; যা করতে হবে সব করেন, কিন্তু এটা কখনো ভোলেন না যে এ-সমস্তই রঙ্গমঞ্চে তাঁর নির্দিষ্ট ভূমিকার অংশ মাত্র। বালীর মৃত্যু-শয্যায় রাম নিজের সমর্থনের যে-চেষ্টা করলেন তা একেবারেই অনর্থক হ'তো, যদি-না তার মধ্যে এ-কথাটি থাকতো ; 'তোমাকে আমি ক্রোধবশে বধ করি নি, বধ ক'রে আমার মনস্তাপও হয় নি।' এই অপার্থিবতা, এই ঐশ্বরিক উদাসীনতার মুখোমুখি আবার আমরা দাঁড়ালুম যুদ্ধকাণ্ডের শেষে, রাম যখন সীতাকে বললেন : 'তোমার মঙ্গল হোক। তুমি জেনো এই রণপরিশ্রম... এ তোমার জন্য করা হয় নি।' তোমার জন্য করি নি, তার মানে, আমার নিজের জন্য করি নি, শুধু করতে হবে ব'লেই করেছি। শুধু একবার, শেষবারের মতো সীতা যখন অন্তর্হিত হলেন, সেই একবার তিনি 'মৈথিলীর জন্য উন্মত্ত' হলেন, 'জগৎ শূন্যময় দেখতে লাগলেন, কিছুতেই মনে শান্তি পেলেন না।' তবু তো তার পরেও— যদিও, যেহেতু তিনি নররূপী বিষ্ণু, স্বর্গে সীতার সঙ্গে তাঁর পুনর্মিলন তিনি ইচ্ছা করলে তখনই হ'তে পারতো— তার পরেও রাজত্ব করলেন 'দশ সহস্র বৎসর', সকল রকম ধর্মানুষ্ঠান করলেন, ভরত লক্ষ্মণের পুত্রদের রাজত্ব দিলেন, আর সর্বশেষে (এ-ঘটনাটা সর্বসাধারণে তেমনি সুবিদিত নয়) প্রাণাধিক লক্ষ্মণকে ত্যাগ করলেন প্রতিজ্ঞারক্ষার জন্য। 'সৌমিত্র,

'তোমাকে বিসর্জন দিলাম', রামকে এ-কথাও নিজের মুখে বলতে হ'লো। প্রতিজ্ঞা-পালন তো উপলক্ষ মাত্র; আসল কথাটা এই যে, যেমন সীতাকে, তেমনি লক্ষ্মণকেও, স্বেচ্ছায় ত্যাগ করতে হবে— নয়তো মর্তের বন্ধন থেকে রাম মুক্ত হবেন কেমন ক'রে। স্বর্গারোহণের পথে যুধিষ্ঠিরকেও একে-একে ছাড়তে হ'লো নকুল সহদেব অর্জুন ভীম আর প্রিয়তমা পাঞ্চালীকে। স্বর্গের পথ নির্জন।

বাল্মীকিতে এ-কথাটা একটু জোর দিয়েই বার-বার বলা হয়েছে যে রাম অবতার হ'লেও মানুষ, নিতান্তই মানুষ। মনুষ্যত্বের মহত্তম আদর্শের প্রতিভূ তিনি, বিশেষ-কোনো একটি দেশের বা যুগের নয়, সর্বদেশের, সর্বকালের। দেহধারী মানুষ হ'য়ে, স্থানে ও কালে সীমিত হ'য়ে, যতটা মুক্ত, শুদ্ধ, সম্পূর্ণ হওয়া সম্ভব, রামচন্দ্র তা-ই। যদি তিনি সাক্ষাৎ নারায়ণই হবেন, তবে মারীচের রাক্ষসী মায়ায় মজবেন কেন? কেন সীতাকে তাঁর মনে হবে 'নেত্ররোগীর সম্মুখে দীপশিখা'র মতো? তাঁর এই উপমাতেই প্রমাণ করে যে তিনিও ছিলেন মনোবিকারের অধীন; সীতাকে দীপশিখার মতো বিশুদ্ধ জেনেও রাম যে তাঁকে সে-মুহূর্তে সহ্য করতে পারেন নি, তাতে রামেরই রুগ্ন অবস্থা ধরা পড়ে। মানুষ তিনি, নিতান্তই মানুষ, এবং সম্পূর্ণ মানুষ, তাই মানুষের দুঃখ তাঁকে সম্পূর্ণ জানতে হবে, এমনকি মানুষী অবমাননা থেকেও তাঁর নিস্তার নেই। তাই তো তাঁকে স্বীকার ক'রে নিতে হ'লো বালীহত্যার হীনতা, সীতাবর্জনের কলঙ্ক, শম্বুকবধের অপরাধ।[৩] যদি এ-সব না-ঘটতো, যদি তিনি জীবনে একটিও অন্যায় না-করতেন, তবে তাঁর নরজন্ম সার্থক হ'তো না, মনুষ্যত্ব অসম্পূর্ণ থাকতো, তবে তিনি হতেন নিয়তির অতীত, প্রকৃতির অতীত, অর্থাৎ আমরা তাঁকে আমাদের একাত্ম ব'লে অনুভব করতে পারতাম না— আর তাহ'লে রামায়ণের কাব্যগৌরব কতটুকু থাকতো? রাম করুণাময়, পতিতপাবন, তিনি পা ছোঁওয়ালে অহল্যা বাঁচে, রাবণ সুদ্ধ তাঁর হাতে মরতে পেয়ে ধন্য; তবু'তো কারোরই— কোনো অন্ধ ভক্তেরও— তাঁকে বুদ্ধ বা যীশুর মতো মনে হয় না। আদিকবির নির্ভুল বাস্তবতা স্পষ্টই বুঝিয়ে দিয়েছে যে তিনি মহামানব নন, কিন্তু তিনি যে মানব, এই সত্যটাই মহান।

রামায়ণের ঘটনাচক্র এই মনুষ্যত্বের বহুলবিচিত্র ব্যঞ্জনার উপলক্ষ মাত্র। 'মাইকেল' প্রবন্ধে আমি প্রশ্ন উত্থাপন করেছি; রাবণ সীতাহরণ করেছিলেন কেন? শ্রীযুক্ত বসুর বইখানাতে এ-প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণ করলাম; যে-উত্তর আমার মন চেয়েছিলো, তা সে পেলো না। আমার মনে হয় যে রামের দিক থেকে সমস্তটাই ছল; সমস্তটাই লীলা। রাম প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত পাঠ মুখস্থ ক'রেই রঙ্গমঞ্চে নেমেছেন, কিসের পর কী তা তিনি সবই জানেন, তবু যেন জানেন না; মহৎ অভিনেতার মতো আমাদের মনে এই মোহ জন্মাচ্ছেন যে ঘটনাবলি তাঁর পক্ষে অপ্রত্যাশিত, নিয়তি তাঁর কাছেও স্বৈরিণী, যেন এটা অভিনয় নয়, জীবন। জটায়ুকে পরাস্ত ক'রে রাবণ যখন সীতাকে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে, তখন 'দণ্ডকারণ্যবাসী মহর্ষিগণ রাবণবধের সূচনায় তুষ্ট হলেন'; সীতাহরণটা আর-কিছু নয়, শুধু রাবণবধের ছল। আর রাবণ-বধও আর-কিছু নয়, শুধু রামের কর্ম-উদ্‌যাপনের উপলক্ষ। সীতা-উদ্ধারের জন্য এত

পরিশ্রমই বা কেন, ইচ্ছে করলে রাম কী না পারেন। কিন্তু ঐ ইচ্ছে করাটা তাঁর ভূমিকায় নেই, কোনো অসম্ভবকে সম্ভব করেন না তিনি, তাঁকে মেনে নিতে হয় বর্ষার বাধা, সমুদ্রের ব্যবধান, ঘটনার দুর্লংঘ্য প্রতিকূলতা ; বালীকে মেরে সুগ্রীবকে রাজত্ব দিয়ে সংগ্রহ করতে হয় বানর-সেনা, যে-বানর মানুষেরও অধম ; দীন, দুর্বল, বর্বর সৈন্যদল নিয়ে এগোতে হয় চতুর, সুসংবদ্ধ, যন্ত্রনিপুণ দানবের বিরুদ্ধে। কেন ? না, এটাই মনুষ্যত্বের সম্পূর্ণতার উপায়। হনুমান অনায়াসেই সীতাকে পিঠে ক'রে নিয়ে আসতে পারতেন, তা তিনি চেয়েওছিলেন, যুদ্ধের তাহ'লে প্রয়োজনই হ'তো না ; —কিন্তু সে তো হ'তে পারে না, তাতে রামের পূর্ণতার হানি হয়। সীতা-উদ্ধার হ'লেই তো হলো না, সেটা ত্যাগের ও দুঃখের দীর্ঘতম পথে হওয়া চাই ; কেন না সীতা-উদ্ধার তো উপলক্ষ, লক্ষ্য হ'লো রামের সর্বাঙ্গীণ মরত্ব-ভোগ। তাই হনুমানের প্রস্তাবে আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন না সীতা, তা প্রত্যাখ্যান ক'রে বললেন :

> …সমস্ত রাক্ষসদের বধ ক'রে যদি তুমি জয়ী হও, তাতে রামের যশোহানি হবে। রামের সঙ্গে তুমি এখানে এস, তাতেই মহৎ ফল হবে। যদি রাম এখানে এসে দশানন ও অন্য রাক্ষসদের বধ ক'রে আমাকে এখান থেকে নিয়ে যান তবেই তাঁর যোগ্য কাজ হবে। তুমি একাই কার্য সাধন করতে পার তা জানি, কিন্তু রাম যদি সসৈন্যে এসে রাবণকে যুদ্ধে পরাজিত ক'রে আমাকে উদ্ধার করেন তবেই তাঁর উচিত কার্য করা হবে।

রামায়ণের চরিত্র সাধারণত পুনরুক্তি করে না, কিন্তু সীতা হনুমানকে এই কথাটি দু-বার বলছেন। তাঁর এ-আগ্রহ কি উদ্ধারের জন্য ? তা যদি হ'তো তবে তো তিনি তৎক্ষণাৎ হনুমানের পৃষ্ঠে আরূঢ় হতেন। না, আগ্রহ এইজন্য যাতে রামচন্দ্রের পূর্ণতা অবরুদ্ধ না হয় ; আর সে-আগ্রহ শুধু সীতার নয়, কাব্যের স্রষ্টার, কাব্যের ভোক্তার।

ছয়

রামায়ণে অসংগতি অসংখ্য। অনেক ক্ষেত্রেই কবি আমাদের সম্ভাব্য কৌতূহলকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে গেছেন। উপেক্ষিতা ঊর্মিলাকে বিখ্যাত করেছেন রবীন্দ্রনাথ ; শ্রীযুক্ত বসুও ভূমিকায় কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। আদি-কবির অবহেলার তালিকা ক্ষুদ্র নয়, তুচ্ছও নয়। উদাহরণত, বালীপত্নী তারাকে তিনি এমন ক'রে এঁকেছেন যেটা রীতিমতো মর্মঘাতী। পতির মৃত্যুতে চীৎকার ক'রে কাঁদতে শুনলুম তাঁকে, আর তার পরেই দেখা গেলো ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণের সামনে তিনি বেরিয়ে এলেন সেই অন্তঃপুর থেকে, যেখানে 'সুগ্রীব প্রমদাগণে বেষ্টিত হ'য়ে রুমাকে আলিঙ্গন ক'রে স্বর্ণাসনে ব'সে আছেন', 'মদবিহ্বলা' তিনি, স্খলিতগমনা, এসে লক্ষ্মণের কাছে তৈলাক্ত ওকালতি করলেন সেই সুগ্রীবকে নিয়ে, যে-সুগ্রীব যথার্থ বালীহন্তা। আমাদের অবাক লাগে বইকি। …কিন্তু আদিকবি উদাসীন, আধুনিক কালের সচেতন শিল্পী তিনি নন ; শিশুর শিল্পহীনতার পরম শিল্পে তিনি অধিকার করেন আমাদের, কত বাদ দিয়ে যান, কত ভুলে যান, কত এলোমেলো ;

অতিরঞ্জন, অবান্তরতা ; কোনো কৌশল জানেন না তিনি, সাজাতে শেখেন নি ; আমাদের ধ'রে রাখে শুধু তাঁর সত্যদৃষ্টি, তাঁর মৌল, সহজ, সামগ্রিক সত্যদৃষ্টি। তাঁর বাস্তবতা এতই বিরাট ও সর্বংসহ যে একদিকে যেমন ঘটনাবর্ণনে কি চরিত্রচিত্রণে নিছক বাস্তবসদৃশতার জন্য তিনি ব্যস্ত নন, তেমনি ডিকেন্স বা বঙ্কিমচন্দ্রের মতো প্রত্যেকটি পাত্রপাত্রীর শেষপর্যন্ত কী হ'লো, তা জানাবার দায় থেকেও তিনি মুক্ত। যে-রকম একটি সুযোগ পেলে আমরা আধুনিক লেখকরা ব'র্তে যাই, সে-রকম কত সুযোগ তিনি হেলায় হারিয়েছেন— সেগুলি কোনোরকম সুযোগ ব'লেই মনে হয় নি তাঁর। শুধু যে ঊর্মিলাকে একেবারে ভুলে গিয়েছেন তা নয়, লক্ষ্মণকেও ভুলেছেন, কেন না একবার একটি দীর্ঘশ্বাস পড়লো না লক্ষ্মণের, বনবাসযাত্রার সময় স্ত্রীর কাছে একটু বিদায় পর্যন্ত নিলেন না। আর কৈকেয়ীকেও বলতে গেলে সেই একবারই আমরা দেখলুম ; কিন্তু পরে কি তাঁর অনুশোচনা হয় নি ? আমাদের এ-সব জিজ্ঞাসার উত্তর রামায়ণে নেই, আছে আমাদের হৃদয়ে। আর সেই হৃদয়লিপির রচয়িতাও রামায়ণের কবি। আমরা যে ঊর্মিলার কথা ভাবি, লক্ষ্মণের হ'য়ে আমাদের যে মন-কেমন করে, কৈকেয়ীর হ'য়ে আমরা যে অনুশোচনা করি— এ-সমস্তই কি বাল্মীকিরই ব'লে দেয়া নয় ? আদি কবির শিল্পহীনতার চরম রহস্য এইখানে যে আমরা তাঁর পাঠক শুধু নাই, তাঁর সহকর্মী, তিনি নিজে যা বলতে ভোলেন, সে-কথা রচনা করিয়ে নেন আমাদের দিয়ে। কেউ হয়তো বলবেন যে রাম ছাড়া অন্য সকলেই তাঁর কাছে উপেক্ষিত ; অন্য সব চরিত্রই খণ্ডিত, মাত্র একটি লক্ষণসম্পন্ন ; লক্ষ্মণ শুধুই ভাই, হনুমান শুধুই সেবক, রাবণ শুধুই শক্তিশালী— রাম ও সীতা কেউ সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ নয়। কিন্তু রামের সম্বন্ধেই কবির উপেক্ষা কি কম ! রাম প্রেমিক, রাম-সীতার জীবন দাম্পত্যের মহৎ আদর্শ, কিন্তু তাঁদের যুগল-জীবনের পরিধি কতটুকু ! বলতে গেলে সারা জীবনই তো রামকে সীতাবিরহে কাটাতে হ'লো। এ-বিরহে সীতার প্রতি কবির করুণা প্রচুর, কিন্তু রাম সম্বন্ধে তাঁর মুখে বেশি কথা নেই। যখন সীতাহরণ, যখন পুনর্জিতার প্রত্যাখ্যান, যখন গণরঞ্জনী দ্বিতীয় সীতাবর্জন —এই তিনবারের একবারও রামকে তেমন শোকার্ত আমরা দেখলাম না ; মনে-মনে বললাম, রাজধর্মের তাগিদে না-হয় বাধ্যই হয়েছিলেন, তাই ব'লে দুঃখও কি পেতে নেই ! ···কিন্তু রামের উদাসীনতায়, কিংবা রামের প্রতি কবির উদাসীনতায়, আমাদের মনে যে-দুঃখ, সেই দুঃখই তো রামের ; যে-রাম সীতার জন্য কাঁদছেন, সে-রাম তো আমরাই। নাটক রঙ্গমঞ্চে আরম্ভ হ'য়ে শেষ হ'লো প্রেক্ষাগৃহে, কিংবা রঙ্গমঞ্চে শেষ হবার পর প্রেক্ষাগৃহে চলতে লাগলো ; রঙ্গমঞ্চে একজন রাম যা করলেন, তার জন্য প্রেক্ষাগৃহের লক্ষ-লক্ষ রামের কান্না আর ফুরোয় না। হয়তো উদাসীনতাই অভিনিবেশের চরম ; হয়তো উপেক্ষাই শ্রেষ্ঠ নিরীক্ষা ; হয়তো শিল্পহীনতার অচেতনেই শিল্পশক্তির এমন একটি অব্যর্থ সন্ধান ছিলো, যা ফিরে পেতে হ'লে মানব-জাতিকে আবার নতুন ক'রে প্রথম থেকে আরম্ভ করতে হবে।

১৯৪৭ 'সাহিত্যচর্চা' (ঈষৎ পরিমার্জিত)

বাংলা শিশুসাহিত্য

আমরা ছোটো ছিলুম বাংলা শিশুসাহিত্যের সোনালি যুগে। দুই অর্থেই সোনালি সেই যুগ। প্রথমত, সে-ই আরম্ভ, সূত্রপাত—বলতে গেলে শিশুসাহিত্যই শিশু তখনো; আমরা এখন যারা সসম্মানে কিংবা যে-কোনো প্রকারে মধ্যবয়সে অবস্থান করছি, বাংলা ভাষার লক্ষণযুক্ত শিশুসাহিত্য আমাদেরই ঠিক সমকালীন। দ্বিতীয়ত, গুণের বিচারেও সোনালি; শুদ্ধ, সরল, সুন্দর, স্বচ্ছন্দ— এই অর্থেও সোনালি। এই সমাবেশ সুলভ নয়। সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রথমে যেটা করা হয়, সেটাই সব সময় ভালো হয় না। প্রায়ই দেখা যায় যে পথিকৃৎগণের ক্রিয়াকলাপ উত্তরকালের কাজে লাগে —আনন্দের আয়োজনে নয়, ইতিহাসের সূত্রসন্ধানে। বাংলা ভাষার শিশুসাহিত্য এ-বিষয়ে উল্লেখ্য ব্যতিক্রম। সেই প্রথম অধ্যায়ে প্রাচুর্য ছিলো না, মন-ভোলানো, অন্তত পক্ষে চোখ-ভোলানো রকমারি ছিলো না এত, কিন্তু যেটুকু ছিলো সেটুকু একেবারেই খাঁটি। বই ছিলো কম; কিন্তু যে-ক'টি ছিলো তাদের অধিকাংশেরই আজ পর্যন্ত জুড়ি মেলে নি, অধিকাংশই আজকের দিনে ক্লাসিক ব'লে গণ্য হয়েছে। তখনকার শিশু-চিত্তের যাঁরা প্রতিপালক, তাঁরাই যে বাল্যবঙ্গের নিরন্তরভোগ্য মধুচক্র বানিয়েছেন, এই কথাটা আনন্দের সঙ্গে স্মরণ করি। সংখ্যায় তাঁরা মাত্রই কয়েকজন। প্রাতঃকালীন, প্রাতঃস্মরণীয়, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, নানা-রঙিন রূপকথার দক্ষিণারঞ্জন, আর সেই বিস্ময়কর রায়চৌধুরী পরিবার, বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে-একটিমাত্র পরিবারের আসন, মাত্রাভেদ যত বড়োই হোক না, জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির পরেই। কোনো-একটা সময়ে এ-রকমও আমাদের মনে হয়েছিলো যে বাংলা শিশুসাহিত্য এই রায়চৌধুরীদেরই পারিবারিক এবং মৌরশি কারবার ভিন্ন কিছুই নয়। উপেন্দ্রকিশোর এই উজ্জ্বল যুগের আদি পুরুষ। তিনিই আমাদের প্রথম শোনালেন রামায়ণ, মহাভারত; যাকে বলা যায় বাংলা দেশের অমর ছড়ার গদ্যরূপ, সেই 'টুনটুনির গল্প' শোনালেন। কুলদারঞ্জনের পুরাণের গল্পে প্রাচীন ভারতের হৃদয়ের পথ খুঁজে পেলুম আমরা; তাঁর রবিনহুডের কাহিনীতে, যাতে ভোরবেলার শিশির-ছোঁয়া গন্ধটুকুও যেন লেগে ছিলো, মধ্যযুগীয় 'সবুজ সুভগ' ইংলণ্ডের কত স্বপ্নেই মধুর হ'লো ছেলেবেলা। আর সুখলতা রাওয়ের 'গল্পের বই', 'আরো গল্প' সেই দুটি-- হায়রে দুটিমাত্র! —বইয়ের কথা কি বলবার! না কি তারা কখনোই ভোলবার! শৈশবের হৃদয়মন্থন এই বই ক'টি, সংখ্যায় বেশি নয় ব'লেই সম্ভোগে নিবিড়, অফুরন্ত বার প'ড়েও কখনো পুরোনো হ'তো না— আজকের দিনেও তারা পুরোনো হয় নি।

এটুকু হ'লেই যথেষ্ট মনে হ'তো,·সাহিত্যের সেই প্রথম অবস্থায় খুব বেশি কেউ চাইতে শেখে নি, কিন্তু প্রাণের অব্যক্ত ইচ্ছা মূর্ত হ'য়ে উঠলো একটি পত্রিকায়। ছোটোদের আশার হরিণকে দিগন্তের দিকে ছুটিয়ে দিয়ে মাসে-মাসে আসতো 'সন্দেশ', আসতো তার আশ্চর্য মলাট আর ভিতরকার মনোহরণ রঙিন ছবি নিয়ে, আনতো দুটি মলাটের মধ্যে সাহিত্যের বিচিত্র ভোজে উজ্জ্বল পাইকা অক্ষরের পরিবেষণ। কবিতা, গল্প, উপকথা, পুরাণ, প্রবন্ধ, ছবি, ধাঁধা— 'সন্দেশ'-এর ভোজ্য-তালিকায় এমন কিছু ছিলো না, যা সুস্বাদু নয়, সুপাচ্য নয়, যাতে উপভোগ্যতা আর পুষ্টিকরতার সহজ সমন্বয় ঘটে নি। শুধু তা-ই নয়, সমস্ত বিভিন্ন রচনার মধ্যে এমন একটি সংগতি ছিলো সুরে, এমন একটি অখণ্ডতা ছিলো এই পত্রিকাটির চরিত্রে, যে অনেক সময় পুরো সংখ্যাটা একজনেরই রচনা ব'লে মনে হ'তো। এই ধারণার সমর্থন করতো অস্বাক্ষরিত রচনার প্রাচুর্য। স্পষ্টত একই হাতের কর্ম সে-সব। অনেক লেখাই অনামী বেরোতো 'সন্দেশ'-এ ; সেইসব খেয়ালি কবিতা, ছন্দে-মিলে মন্ত্র-পড়ানো এবং অর্থহীনতায় অর্থময় সব কবিতা, পাতা খুলে প্রথমেই যার প্রিয় কণ্ঠে অভ্যর্থনা শুনতাম, আর কখনো-কখনো একই সংখ্যায় যার দুটি-তিনটি ক'রে পাওনা যেতো ; আর সেইসব স্কুল-ছেলেদের হাস্যস্ফুরিত সমানুভাবী গল্প, বালকের প্রচ্ছন্ন জগতে নিত্যনতুন আবিষ্কারের কাহিনী, যেখানে অধ্যবসায়ী নন্দলাল নিয়তিনির্বন্ধে কিছুতেই প্রাইজ পায় না, পাগলা দাশুর রহস্যময় বাক্স শুধু কৌতূহলের অসারতা প্রমাণ করে, এবং মাতুলবিলাসী কল্পনাপ্রবণ যজ্ঞিদাস কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের বিরোধ সইতে না-পেরে মর্মাহত হয়, —এইসব অস্বাক্ষরিত গল্প-কবিতা যে কার লেখা, সে-বিষয়ে 'সন্দেশ'-এর তৎকালীন পাঠকরা ঠিক অবহিত না-থাকেও সারা বাংলায় তার প্রচার হ'তে বিলম্ব হ'লো না— যখন 'হযবরল' আর 'আবোল তাবোল' এই দুটি বই প্রকাশিত হ'লো। শুধু তো বই দুটি নয়, প্রকাশিত হ'লো প্রতিভা, অকালমৃত্যুর বেদনাজড়িত সেই বিস্ময় বাংলার চিত্তলোকে তরঙ্গ তুললো সেদিন। সোনার খাতায় নতুন একটি নাম উঠলো, নতুন একটি তারা ফুটলো আকাশে : সুকুমার রায়।

দুই

আজ আমার সেই ছেলেবেলার পড়া, বাঙালী ছেলের চিরকালের পড়া রচনা-বলির কিছু অংশ নতুন আকারে দেখতে পেয়ে আনন্দিত হচ্ছি। ইতিমধ্যে অনেক বছর কেটেছে ; আমরা যারা এ-সব লেখার প্রথম ছোটো-ছোটো ভোক্তা ছিলুম, আজ আমাদেরই উপর ভার পড়েছে নবীন তরুণদের মনের খাদ্য জোগান দেবার। এই চেষ্টায় সম্প্রতি আমরা নানাভাবে হতকাম হয়েছি। যে-সব বই বিশেষভাবে অপত্য-পাঠ্য মনে করি, তা সংগ্রহ করা অনেক সময়ই সহজ হয় নি। বাংলাদেশে এত বড়ো দুর্ঘটনাও ঘটেছিলো যে 'আবোল তাবোল' অনেক বছর ছাপা ছিলো না। মাঝে কুলদারঞ্জন অবলুপ্তির প্রান্তে এসে ঠেকেছিলেন, সুখলতা রাওয়ের বই

জোগাড় করতে প্রায় গোয়েন্দা লাগাবার প্রয়োজন হ'তো। এ-সব বইয়ের পুনঃপ্রকাশ তাই সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য ঘটনা ব'লে মনে করি। পাশাপাশি দেখছি সুকুমার রায় আর কুলদারঞ্জনকে, আর সুখলতা রাওয়ের বই দুটি যুক্ত হ'য়ে 'গল্প আর গল্প' নামে বেরিয়েছে। এই রচনাগুচ্ছে— রায়চৌধুরীদের সমগ্র রচনাগুচ্ছে— একটি পারিবারিক সাদৃশ্য দেখতে পাই। ব্যক্তিভেদে শক্তির তারতম্য আছেই, কিন্তু মৌল সাদৃশ্য যেখানে ধরা পড়ে, সেটি তাঁদের সহজ ভঙ্গিতে, গল্প বলার অবসাদহীন প্রবাহে, কণ্ঠস্বরের সেই লাবণ্যে, যে-কোনো লাইন চোখে পড়লেই মনের মধ্যে যার প্রভাব ছড়ায়। এই লাবণ্য গুণটি বুঝিয়ে বলা শক্ত— কিংবা খুবই সহজ, অর্থাৎ এটি সাহিত্য-রান্নায় সেই লবণ, যার অভাবে অন্য কিছুরই স্বাদ ওঠে না। এ-ক্ষেত্রে বলা যায় যে এঁরা ঠিক ছোটোদের মতো ক'রেই বলতে পারেন —মানে, ছোটোরা নিজেরা যে-রকম ক'রে বলবে সে-রকম অবশ্য নয়, কিন্তু যেমন বললে তাদের মনে হবে যে তাদের মতোই বলা হচ্ছে, ঠিক তেমনি ক'রেই বলতে পারেন এঁরা। তাই এঁদের লেখায় কৃত্রিমতা নেই; এক ফোঁটা পিঠ-চাপড়ানো নেই ছোটোদের উদ্দেশে, কোনোরকম ইস্কুল-মাস্টারি করুণা কিংবা কর্তব্যবোধ নেই; ছোটোদের সম্মান সম্পূর্ণ বজায় রাখেন এঁরা, কিন্তু তাই ব'লে স্বকীয় সত্তা ভোলেন না, নিজেরাই ছেলেমানুষির ভুল করেন না কখনো, বন্ধুতাস্থাপনের চেষ্টায় অশোভন মুখভঙ্গি ক'রে শ্রদ্ধা হারান না। সুকুমার রায়ের প্রত্যেক গল্পেই উপদেশ আছে, কিন্তু সেটা বাইরে থেকে নিক্ষিপ্ত নয়, ভিতর থেকেই প্রকাশ-পাওয়া; সে-উপদেশ সেই জাতের, যা বালকেরা নিজেরাই মাঝে-মাঝে কৃতজ্ঞ চিত্তে নিয়ে থাকে জীবন থেকে। এইজন্যই তাদের উপভোগ কখনো ব্যাহত হয় না; তাদের বয়সোচিত নানারকম ছলচাতুরী, বোকামি এবং দুষ্টুমির শেষে জব্দ হওয়ার দৃশ্যটিতে নিজেরাই তারা প্রাণ খুলে হাসে; ঐ জব্দ হওয়ার— যদিও তারাই এক-একজন এক-এক গল্পের নায়ক— সম্পূর্ণ সমর্থন করে তারা; সেটুকু না-থাকলেই ভালো লাগতো না, সত্যি বলতে। এতে প্রমাণ হয়, বয়স্ক লেখকের সঙ্গে তাঁর ছোটো-ছোটো পাঠকদের একাত্মবোধ কত নিবিড়।

তবু যুগ-বদলের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যেও স্বাদ-বদল ঘ'টে থাকে, আর সুকুমার রায়ের সমস্ত লেখার মধ্যে শুধু 'পাগলা দাশু'র গল্পগুলোই আজকের দিনে মনে হয় কালপ্রভাবে ঈষৎ মলিন, যেন সাল-তারিখ পেরিয়ে-আসা। যে-বিশেষ পরিবেশের সংলগ্নতায় এই গল্পগুলি জন্মেছিলো, সেই পরিবেশ আজ স্মৃতিকথায় পর্যবসিত; এইরকম ঐতিহাসিক ব্যবধান অনেক সময়ই রসগ্রহণে ব্যাঘাত ঘটায়। কিন্তু রূপকথা চিরন্তন, চিরকালের পুরোনো ব'লেই তারা নতুন থাকে; —আর এইখানেই সুখলতা রাওয়ের – কৃতিত্ব বেশি বলবো না, কিন্তু ভাগ্য ভালো। তাছাড়া যাকে লাবণ্য বলেছি, সহজ ভঙ্গি, সেই গুণটি সবচেয়ে বেশি প্রশংসা জাগায় তাঁরই লেখায়, কেন না 'পাগলা দাশু' বা কুলদারঞ্জনের কাহিনীর তুলনায় তাঁর গল্প আরো অনেকটা তরুণতরদের গ্রহণযোগ্য। 'গল্পের বই', 'আরো গল্প' —ঠিক 'টুনটুনির

বই'-এর মতো— একেবারেই বালভাষিত গদ্যে লেখা— অবশ্য রবীন্দ্রনাথের অর্থে নয়— সবেমাত্র যারা পড়তে শিখেছে একান্তভাবে তাদেরই উপযোগী ; ছোটো-ছোটো কথা, মৃদু-মৃদু বাক্য, শাদাশিধে ঘরোয়া ধরনে নিচু গলায় বলা— যেন লেখা গল্পই নয় আসলে, বলা গল্প – অথচ দক্ষিণারঞ্জনের জাঁকজমকের বেড়া ডিঙোতেও হয় না, আবার একটুও পানসে নয় তাই ব'লে, ছোট্ট মাপের মধ্যে ভরপুর এক-একটি গল্প। বর্ণপরিচয় পেরোনো মাত্র ধরিয়ে দেয়া যায় এমন সুখপাঠ্য গল্পের বই এ-তিনটি ছাড়া বাংলা ভাষায় এখনো বেশি হয়েছে ব'লে মনে করতে পারি না।

সুখলতার গল্প অবশ্য মৌলিক নয়, বিদেশী রূপকথার, প্রধানত গ্রিম্‌ভ্রাতাদের অনুসরণে লেখা। কিন্তু তাতে তাঁর গৌরবের কোনো হানি হয় না। সাহিত্যের কোনো-কোনো অবস্থায় অনুবাদ বা অনুসারী রচনা মৌলিকতারই মর্যাদা পেয়ে থাকে ; তাছাড়া বৈশ্বিকতা রূপকথার চরিত্রগত, একই কাহিনীর বিভিন্ন প্রকরণ বিভিন্ন এবং বহুবিচ্ছিন্ন দেশে উদগত হ'য়ে মানবজাতির আদিম ঐক্যের সন্ধান দেয়। গ্রিমের গ্রন্থও সূক্ষ্ম অর্থে মৌলিক নয়, জর্মান দেশের আদ্যিকালের রূপকথার সংগ্রহ, আর সে-সব গল্প সুখলতার হাতে এমন অবাধভাবে দেশীয় হাওয়ায় প্রস্ফুটিত হয়েছে যে তারই জন্য বাঙালী শিশু বংশানুক্রমে কৃতজ্ঞ থাকবে তাঁর কাছে।

এই মৌলিকতার প্রসঙ্গটি আরো-একটু অনুধাবনযোগ্য। সুখলতা, দৃষ্টিপাত মাত্র ধরা পড়ে, এ-বিষয়ে ব্যতিক্রম নন। তখনকার শিশু-লেখকরা প্রায় সকলেই মধুকরব্রতী ; তাঁদের সাহিত্যের প্রধান অংশই অনুবাদ বা অনুরচনা— যাকে বলে অ্যাডাপ্টেশন— কিংবা প্রচলিত লোকসাহিত্যের সংগ্রহ বা সংকলন। এর উদাহরণ উপেন্দ্রকিশোর, কুলদারঞ্জন, 'চারু ও হারু' সত্ত্বেও দক্ষিণারঞ্জন, এবং অজস্র স্বাধীন রচনা সত্ত্বেও স্বয়ং যোগীন্দ্রনাথ। নিজে গল্প তৈরি ক'রে কী হবে, তার প্রয়োজনই বা কী— এঁদের মনের ভাবখানা ছিলো এইরকম ; দেশে ও বিদেশে যে-রত্নরাজি ছড়িয়ে প'ড়ে আছে, সেইগুলির যথাযোগ্য পরিবেষণেই এঁদের প্রযত্ন ছিলো। বাংলাদেশের সেটা ছিলো ফুটে ওঠার, হ'য়ে ওঠার সময় ; এ-রকম সময়ে কোথাও-কোথাও অনুবাদের বড়ো-বড়ো যুগ এসেছে ; যে-দৃশ্য আমরা দেখতে পাই চসারের কিংবা মার্লোর ইংলণ্ডেও ; বাংলা শিশুসাহিত্যের আলোচ্য অংশ তারই একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ। এই ঐতিহাসিক অবস্থায় স্বাধীন এবং পরনির্ভর রচনায় ভেদচিহ্ন স্পষ্ট থাকে না ; আর ভেবে দেখতে গেলে কোনো লেখাই তো সম্পূর্ণ 'স্বাধীন' নয় —বিশেষত, দেশে যখন কিছুই নেই, তখন অতীত থেকে, বিদেশ থেকে সংকলন-কর্মই স্রষ্টা-মনের যোগ্য হয়ে ওঠে।[১] পূর্বসূরিরা জঙ্গল কেটে সাফ করলেন, তৈরি করলেন পথ, নানা দেশের নানান বীজ ছড়িয়ে দিলেন মাটিতে— আর এমনি ক'রে ঘটিয়ে দিলেন, ফলিয়ে তুললেন সুকুমার রায়ের সুপরিণত ব্যক্তিস্বরূপ।

তিন

সুকুমার রায়কে আমি বরাবর শ্রদ্ধা করেছি শুধু হাস্যরসিক ব'লে নয়, শুধু শিশুসাহিত্যের প্রধান ব'লে নয়, বিশেষভাবে সাবালকপাঠ্য লেখক ব'লেও। তাঁর কথা ভাবলে অনিবার্যত মনে পড়ে ল্যুইস ক্যারল-এর যুক্তিচালিত বিস্ময়লোক, মনে পড়ে এডওঅর্ড লিয়র-এর লিমারিকগুচ্ছে ব্যক্তিবাদের পরাকাষ্ঠা। এই শেষের কথাটা একটু বুঝিয়ে বলা দরকার। য়োরোপে যন্ত্রযুগ এসে যখন বললো, 'সব মানুষকে এক ছাঁচে ঢালাই ক'রে দাও', সমাজের সেই স্পর্ধার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জেগে উঠলো সাহিত্যের নানা বিভাগে। লিয়রের আপাতলঘু পঞ্চপদাবলি সেই প্রতিবাদেরই অন্যতম দলিল। তাঁর প্রহসনের পাত্র-পাত্রী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের চরম নমুনা ; একদম বেপরোয়া তারা, মরীয়ারকম স্বাবলম্বী বা স্বেচ্ছাচারী— কেউ তারা গাছে উঠে ব'সে থাকে, কেউ দাড়িতে টুপিতে যত রাজ্যের পাখি জোটায়, কেউ বা ঝাঁপিয়ে পড়ে এট্‌নার গনগনে উনুনটার মধ্যে— আর তাদের এ-সব কাণ্ড দেখে 'they' বা অন্যেরা যখন হাসে বা মারতে ওঠে, তখন তারা ম'রে গেলেও গোঁ ছাড়ে না। এই 'অন্যেরা' হ'লো সমাজ, যে-সমাজ মানুষকে কল বানাতে চায়। অ্যালিসের স্বপ্নলোকেও সবই অদ্ভুত, অবৈধ, অসামাজিক— নিয়মহারা নয়, কিন্তু উল্টো নিয়মের অধীন— যে-নিয়মে ওঅর্ডস্বার্থের সাত্ত্বিক বুড়ো ফাদার উইলিয়ম হঠাৎ খেপে গিয়ে অনবরত মাথার উপর দাঁড়িয়ে থাকে ; যা-কিছু পোষ-মানা, আপোশে-চলা, অতিশয় আরামদায়ক এবং গতানুগতিক, তাকে 'মানি না' বলার সম্ভাবনাটাই ক্যারলের অসম্ভাবনার তাৎপর্য। ভিক্টরীয় যুগের অনেক নিন্দে শোনা গেছে, কিন্তু এই আশ্চর্য 'ননসেন্স' সাহিত্য— যার মরাল-গীতি চেস্টার্টন গেয়েছিলেন— তারও উত্থান এইসময়েই ঘটেছিলো, মৃদু-মসৃণ 'লন টেনিসন'-এর আমলে। এই 'ননসেন্স' আর-কিছুই নয় : আধুনিক সমীকরণের বিরুদ্ধে তির্যক বিদ্রোহঘোষণা।

সুকুমার রায়ের জগৎটাতেও এই বিদ্রোহের আভাস দেখা যায় ! সেখানেও রাজার পিসি কুমড়ো নিয়ে ক্রিকেট খেলে, আর রাজা বিল্ববিমুখ মুণ্ডিতমস্তকের সমস্যা নিয়ে আকুল হ'য়ে থাকেন ; সেখানেও কেউ ছায়া ধরার ব্যাবসা করে, কেউ বা আপিস-টাপিশ সব ভুলে শুধু গান গেয়ে দিন কাটায়। এই সাদৃশ্য শুধু প্রভাবজনিত নয়। উপরোক্ত দুই ইংরেজ লেখকের কাছে, বলা বাহুল্য, সুকুমার রায়ের ঋণ অনেক ; সেই ঋণ সার্থক হয়েছিলো এইজন্যে যে এঁদের সঙ্গে তাঁর নানা রকম সাদৃশ্য ছিলো। সাদৃশ্য ছিলো গুণের দিক থেকে, প্রাণের দিক থেকেও। ক্যারলের মতো, তিনিও ছিলেন একাধারে শিল্পী ও বিজ্ঞানী ; লিয়রের মতো, একাধারে চিত্রী ও লেখক ; ক্যারলের মতোই শব্দতত্ত্বে সন্ধানী ছিলেন, আর উভয়ের মতোই জন্মেছিলেন লজিকনিষ্ঠ মনের সঙ্গে খামখেয়ালি মেজাজ নিয়ে। এ-দুয়ের মিলন ঘটলে তবেই সত্যিকার খেয়াল-খাতা লেখা যায়, নয়তো ও-বস্তু আক্ষরিক অর্থেই 'ননসেন্স' হ'য়ে পড়ে। এ-ক্ষেত্রে সুকুমার রায় তাঁর উত্তমর্ণদের— সমকক্ষ বললে ভুল হবে— কেন না তাঁর ব্যঙ্গের দিকেও ঝোঁক ছিলো— কিন্তু সমীপবর্তী। ব্যঙ্গ-

রচনা খেয়ালি লেখার সধর্মী নয়, যেহেতু লক্ষ্যগোপনেই খেয়ালি লেখার লক্ষ্যভেদ, আর স্পষ্ট কোনো লক্ষ্য ছাড়া ব্যঙ্গ হয় না। যেখানে সুকুমার রায় ব্যঙ্গনিপুণ— যেমন 'সৎপাত্র' বা 'ট্যাসগরু'তে— সেখানে তাঁর উদ্দেশ্য আমরা পরিষ্কার দেখতে পাই ব'লে অদ্ভুত রসটা বিশুদ্ধভাবে পাই না। 'হাত গণনা' 'নারদ, নারদ', 'গন্ধবিচার'—যে-সব কবিতায় চরিত্রসৃষ্টি আছে, মনস্তত্ত্ব আছে— সেখানেও স্পর্শসহ 'অর্থ' এসে রচনার জাত বদলে দেয়। এ-কথা ব'লে সুকুমার রায়ের মূল্য আমি কমাতে চাচ্ছি না— অমন অপচেষ্টা কোনো বাতুল যেন না করে— আমার উদ্দেশ্য শুধু এটুকু বলা যে তিনি ছিলেন অনেকটা চেস্টার্টনের মতো—একাধারে ঠাট্টায় আর আজগুবিত্বে স্বভাবসিদ্ধ ; ক্যারলের মতো, লিয়রের মতো বিশুদ্ধভাবে অদ্ভুত রসের পূজারি ছিলেন না।

কিন্তু, এই ইংরেজ যুগলের তুলনায় একটি বিষয়ে তিনি মহত্তর ; সেটি তাঁর কবিত্বগুণে। এই বিচার পরম নয়, আপেক্ষিক। অর্থাৎ এখানে 'এ বুক অব ননসেন্স'-এর সঙ্গে বা 'অ্যালিসে'র পদ্যাংশের সঙ্গে 'আবোল তাবোল'-এর তুলনা করছি না ; ভেবে দেখছি আপন ভাষার কাব্যের ক্ষেত্রে কার কী-রকম মূল্য। ইংরেজিতে লিয়র কিংবা ল্যুইস ক্যারল আসন পেয়েছেন হালকা কবিতার বিভাগে ; তাঁদের পদ্য কৌতুকের উৎস, কৌতূহলের বিষয়, গবেষণাযোগ্য বিরল মণিমুক্তোর মতো ; কিন্তু সুকুমার রায়কে 'হাসির কবিতা'র গণ্ডির মধ্যে ধ'রে রাখা যায় না, কোনো বিশেষজ্ঞতার পরিধির মধ্যেও না— তিনি বেরিয়ে আসেন বাংলা কবিতার বড়ো মহলেই। 'আবোল তাবোল', আমার প্রথম থেকেই মনে হয়েছে, বাংলা ভাষার রীতিমতো একটি কাব্যগ্রন্থ, যাতে হাসির ছুতো ক'রে, ছবি এবং কৌতুকের সাহায্যে ভুলিয়ে এনে, শিশুদের এবং বয়স্কদেরও কয়েক ফোঁটা বিশুদ্ধ কাব্যরস অন্তঃস্থ ক'রে দেয়া হ'লো। 'মেঘ-মুলুকে ঝাপসা রাতে। রামধনুকের আবছায়াতে' ব'সে 'আলোয় ঢাকা অন্ধকারে'র গন্ধে ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পাবেন কি কবি ছাড়া অন্য কেউ ? না কি অন্য কেউ 'পান্তভূতের জ্যান্ত ছানা'কে 'জোছনা হাওয়ার স্বপ্ন-ঘোড়া'য় চড়িয়ে দেবেন ? নাকি সংসারের হাজার হট্টগোলের মধ্যে অনবরত শুনতে পাবেন যে গানের মাঝে 'তবলা বাজে ধিনতা' ? যাঁর মালপোয়ালোভী মার্জার বেরিয়ে আসে, যখন—

বিদঘুটে রাত্তিরে ঘুটঘুটে ফাঁকা,
গাছপালা মিশমিশে মখমলে ঢাকা,
জটবাঁধা ঝুলকালো বটগাছ তলে,
ধকধক জোনাকির চকমকি জ্বলে।...
পুবদিকে মাঝরাতে ছোপ দিয়ে রাঙা,
রাতকানা চাঁদ ওঠে আধখানা ভাঙা—

যাঁর হাস্যভীরু রামগরুড়-শাবক

যায় না বনের কাছে কিংবা গাছে-গাছে,
দখিন হাওয়ার সুড়সুড়িতে
হাসিয়ে ফেলে পাছে।

সোয়াস্তি নেই মনে মেঘের কোণে-কোণে
হাসির বাষ্প উঠছে ফেঁপে
কান পেতে তাই শোনে।
ঝোপের ধারে-ধারে রাতের অন্ধকারে
জোনাক জ্বলে আলোর তালে
হাসির ঠারে-ঠারে—

তাঁকে কবি ব'লে না-মানতে হ'লে 'কবি, কথাটায় অন্যায়ভাবে সীমানা টানতে হয়। সত্য, সুকুমার রায়ের পদ্যজাতীয় রচনা অধিকাংশই সর্বতোভাবে পদ্য, পদ্য যত ভালো হ'তে পারে তা-ই— তার বেশি আর-কিছু নয়, কিন্তু সেই সঙ্গে এ-কথাও সত্য যে মাঝে-মাঝে পদ্যের সীমা পেরিয়ে তিনি কবিতার স্তর স্পর্শ ক'রে যান— তখন আমরা যে-আনন্দ পাই, সেটা পরিহাসলব্ধ হ'তে পারে না। উদ্ধৃত অংশের উজ্জ্বল চিত্ররূপ, ছন্দের বিন্যাস, প্রথম দৃষ্টান্তে অন্তমিল-বহুল হসন্ত শব্দে নৌকোর দাঁড় পড়ার মতো ছপছপ-আওয়াজ— সবটা মিলিয়ে কৌতুকাবহ প্রসঙ্গ এরা উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে, কিংবা কৌতুকের সঙ্গে কল্পনা মিশে হ'য়ে উঠেছে অন্য কিছু। এখানে আমরা অন্য যে-আস্বাদটুকু পাই, তাকে কবিতারই অভিজ্ঞতা ব'লে তখনই আমরা চিনতে পারি। অর্থাৎ, 'আবোল তাবোল'-এর আবেদন একাধিক স্তরে ; ছোটোরা কুমড়োপটাশ আর বোম্বাগড়ের রাজাকে নিয়ে হাসে, দুলে-দুলে ছন্দ পড়ে, আবৃত্তি করে চেঁচিয়ে ; আর বড়োরা— হয়তো কোনো-কোনো বালক-বালিকাও— উপভোগ করে 'দখিন হাওয়ার সুড়সুড়ি', মুগ্ধ হয় মিলের চমকে, দেখতে পায় ব্যঙ্গের দীপ্তি, লক্ষ করে বাতিকগ্রস্তদের অবিশ্বাস্য ব্যবহারে সমাজবিধানের সমালোচনা।

এ ছাড়া অন্য দিক থেকেও তাঁর দাবি আছে। নিছক পদ্যরচনার কারিগরিতে, ছন্দ-মিলের অপ্রতিহত পরিচালনায় সুকুমার রায়ের দক্ষতা এমন অসামান্য যে শুধু তারই জন্য তাঁকে কবি ব'লে স্বীকার করার বাধা হয় না। বাংলাদেশ, এখানে স্মরণ করা ভালো, একই কারণে কবির সম্মান দিয়েছে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে, সত্যেন্দ্রনাথও পদ্যকার, পদ্য ছাড়া বেশি কিছু লেখেন নি, কিন্তু সেই পদ্যই ওস্তাদের মতো, আর প্রচুর পরিমাণে লিখেছেন ব'লে কবি-সভায় শেষপর্যন্ত তাঁকে অমান্য করা যায় না। উপরন্তু সত্যেন্দ্রনাথের তুলনায় সুকুমার রায় অনেক বেশি পরিণত মনের মানুষ, তাঁর কলাকৌশলও অনেক বেশি সাবালক ; তাই তাঁর পদ্য ছোটোদের জন্য লেখা হ'লেও বয়স্কদের ভোগ্যবস্তু হয়েছে, আর সত্যেন্দ্রনাথের লক্ষ্য যদিও বয়স্ক পাঠক, কার্যত তাঁর অধিকাংশ কবিতাই কিশোরপাঠ্য। গত দুই দশকে বাংলা কবিতা যতটা বদলে গেছে, তাতে আজকের দিনের তরুণ কবির পক্ষে সত্যেন্দ্রনাথ আর অপরিহার্য নেই, কিন্তু লেখা শেখার যে-কোনো ইস্কুলে 'আবোল তাবোল' এখনো আবশ্যিক।

'আবোল তাবোল'-এর সঙ্গী বই এবার প্রকাশিত হ'লো 'খাই-খাই' নামে। বইটি চোখে দেখে, এমনকি শুধু নাম শুনে, আমার মনে প'ড়ে গেলো 'খাই-খাই' কবিতা

যখন প্রথম বেরিয়েছিলো অদূরবর্তী, সুদূরবর্তী, অতীতে। সেই গ্রন্থবিরল যুগে বিধাতার আশীর্বাদের মতো এসেছিলো নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত 'পার্বণী', তারই পাতায় এই অপ্রতিরোধ্য কবিতা প্রথম এবং অবিস্মরণীয়রূপে পড়েছিলাম! মনে পড়ে একটি বালককে অসংখ্য বার এটি আবৃত্তি করতে হয়েছিলো, আর তা-ই শুনে বয়স্কজনেরা কতই না হেসেছিলেন। হ্যাঁ— হাসির কবিতা সন্দেহ নেই. কিন্তু শুধু তা-ই নয়, শুধু আজব ভোজের রঙিন তালিকাই তৈরি হয় নি এখানে, মাতৃভাষার স্বরূপটিকেও প্রকাশ করা হয়েছে। বাংলা ভাষার এক-একটি ক্রিয়াপদ কত রকম বিচিত্র অর্থে ফরমাশ খাটে, যা আমরা সকলেই জানি, কিন্তু হঠাৎ কেউ জিগেস করলে বলতে পারি না— সে-বিষয়ে আমাদের মনোরম উপায়ে সচেতন ক'রে দিলেন সুকুমার রায়। তাঁর এ-ধরনের রচনায় মধ্যে সবচেয়ে চমকপ্রদ 'শব্দকল্পদ্রুম', আর 'খাই-খাই' সবচেয়ে বিস্তারিত ও সম্পূর্ণ। 'খাই-খাই' পদ্যে লেখা হ'লেও আসলে একটি প্রবন্ধ বা অভিধানের ছিন্নপত্র, অথচ রঙে রসে উজ্জ্বল ; পণ্ডিতের সঙ্গে রসিক এখানে মিলেছে, আর রসিকতায় শান দিয়ে যাচ্ছে ছন্দ-মিলের দাঁড়ি-কমা। ঐ মিল— স্বচ্ছন্দ, অভিনব, অনিবার্য এক-একটি মিল— ওর প্রয়োজন ছিলো ওখানে— নয়তো অতক্ষণ ধ'রে সহ্য করা যেতো না ; কিন্তু পদ্যের ঘনিষ্ঠতা যে-সব রচনায় নেই, সেখানে লেখক পুরোমাত্রায় পুষিয়ে দিয়েছেন গল্প এনে, প্লট সাজিয়ে ; 'অবাক জলপান' এবং অংশত 'চলচিত্তচঞ্চরী'কে বলা যায় 'খাই-খাই'-এরই গদ্য প্রকরণ, অর্থাৎ প্রচ্ছন্ন প্রবন্ধ। সুকুমার রায়ের মাপজোক ঠিক নিতে হ'লে, তাঁর নানান গুণপনা বুঝতে হ'লে আমাদের আসতে হবে এখানেই— তাঁর রচনাবলির এই অংশে— যেখানে ভাষাতত্ত্ব শিল্পীর হাতে সজীব হ'য়ে উঠেছে, যেখানে তাঁর বৈজ্ঞানিক সার্কাসে কথার খেলা দেখানো হয়। এই কথা নিয়ে খেলা করার কাজটি লেখকদের পক্ষে লোভনীয়, কিন্তু রজ্জুপথে চলার মতোই বিপজ্জনক, একচুল ভুল হ'লেই সেখানে অপঘাত ঘটে। এর জন্য বিশেষ একরকম মনীষিতার প্রয়োজন হয়, সেটা সকলের থাকে না। এই ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার আধুনিক লেখকদের মধ্যে সুকুমার রায় অনন্যভাবে চোখে পড়েন ; তাঁর কথা-লেখার ফলশ্রুতি বিনোদনেই ফুরোয় না, তাতে ভাষার লুকোনো কোণে আলো পড়ে, ভাষাপ্রয়োগের সম্ভাবনা যেন বেড়ে যায়। 'হাঁসজারু' বা 'বকচ্ছপ' শুনে ছোটোরা যত ইচ্ছে হাসুক, কিন্তু আমাদের মনে প'ড়ে যায় জেমস জয়সকে আর পূর্বসূরি ল্যুইস ক্যারলকে যিনি 'slithy' আর 'mimsy' উদ্ভাবন ক'রে জয়সকে পথ দেখি'য় দেন।[৫] অবশ্য 'হাঁসজারু', 'বকচ্ছপে' ক্যারলীয় গূঢ়তা নেই, কিন্তু ইঙ্গিত ঠিকরে পড়ে সুকুমার রায়ের শ্লেষ-প্রয়োগে, যমকের ব্যবহারে। ঐ শ্লেষ বা 'পান্' করার বিদ্যেটি বড়ো পিচ্ছিল— অনেকের হাতেই তা ছিবলেমি মাত্র হ'য়ে পড়ে। কিন্তু সুকুমার রায়, 'হাস্য-কৌতুক'-এ রবীন্দ্রনাথের মতো, ওর সাহায্যে ভাষার গাঁট খুলে দেখান। 'অবাক জলপান'-এ আমরা শুধু কৌতুকে আবিষ্ট হই না, সেই সঙ্গে 'জল' কথাটির সঙ্গে নতুন ক'রে আমাদের চেনা হয়।

চার

সুকুমার রায়ের মৃত্যুর পরে 'সন্দেশ' যতদিনে বন্ধ হ'লো, তার আগেই শিশু-সাহিত্যের নতুন যুগ এনেছে, 'মৌচাক' পত্রিকা। পরে অবশ্য 'সন্দেশ' বেরিয়ে আবার কিছুদিন চলেছিলো, কিন্তু 'প্রত্যাগত' শার্লক হোমস-এর মতোই সে আর তার পূর্বসত্তা ফিরে পায় নি। এর পর থেকে শিশুসাহিত্যে আসর জমালেন 'মৌচাক'-এর লেখকরাই ; শিশুসাহিত্যের দ্বিতীয় যুগের এই পত্রিকাটিকেই প্রতিভূ বলা যায়।

এ-কথার অর্থ এই যে আধুনিক কালে, অর্থাৎ গত তিরিশ বছরের মধ্যে যাঁরা ছোটোদের জন্য উল্লেখ্যরূপে লিখেছেন, তাঁরা সকলেই এই পত্রিকার লেখক এবং কেউ-কেউ হয়তো ওরই প্ররোচনায় প্রথম ওদিকে মন দেন। প্রথম যুগের সঙ্গে দ্বিতীয় যুগের কিছু লক্ষণগত পার্থক্য দৃষ্টিপাতমাত্র ধরা পড়ে। আগে রচনার ক্ষেত্রে নাবালক-সাবালকের সীমান্তরেখা খুব স্পষ্ট ছিলো ; যাঁরা ছোটোদের জন্য লিখতেন তাঁরা অন্য কিছু লিখতেন না, আর যাঁদের বলতে পারি অবিশেষ সাহিত্যিক, সর্বসাধারণের লেখক, তাঁরাও শিশুসাহিত্য এড়িয়ে যেতেন। (পাঠ্যপুস্তক বাদ দিয়ে বলছি, আর রবীন্দ্রনাথের 'শিশু' কাব্যটি যে 'শিশুসাহিত্য' নয়, সে-কথা অবশ্য না-বললেও চলে।) আধুনিক কালে এ-ব্যবস্থার বদল হয়েছে। 'মৌচাক'-এর প্রথম সংখ্যার প্রথম কবিতার লেখক ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, তার অনতিপরেই 'বুড়ো আংলা'র আবির্ভাব হ'লো সেখানে: 'ভারতী'-গোষ্ঠীর, তারপর 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর প্রায় সকলে দেখা দিলেন একে-একে ; মোটের উপর এ-কথা বললে ভুল হয় না যে সম্প্রতি যাঁরা ছোটোদের জন্য লিখেছেন এবং লিখছেন, দু-একজনকে বাদ দিয়ে তাঁরা সকলেই সাবালক সাহিত্যে প্রতিষ্ঠাবান। হয়তো এরই জন্য, কিংবা হয়তো অনিবার্য যুগপ্রভাবে, আমাদের শিশুসাহিত্যও অপেক্ষাকৃত বয়স্ক হয়েছে এখন হয়তো শৈশবেরও চরিত্র বদলেছে এতদিনে ; আমরা আমাদের ছেলেবেলায় যে-রকমের ছোটো ছিলুম, এই রেডিওমুখর সিনেমাচ্ছন্ন যুগে সে-রকম আর সম্ভব ব'লেই মনে হয় না। এই পরিবর্তন প্রতিফলিত হয়েছে শিশুসাহিত্যে ; রচনার বিষয় বেড়েছে, বিষয় বদলেছে ; ভিন্ন সুরে বলা হয় আজকাল, ছোটোদের আর ততটা ছোটো ব'লে গণ্য করা হয় না, এবং বর্তমান কালের 'ছোটোদের' বই অনেক ক্ষেত্রে বয়স্করাও উপভোগ ক'রে থাকেন।

এই শেষের কথাটাকে একটু বিস্তার করা দরকার। শিশুসাহিত্যে বড়ো দুটো শ্রেণী পাওয়া যায়। তার একটা হ'লো একান্তভাবে, বিশুদ্ধরূপে নাবালক-সেব্য, যেমন যোগীন্দ্রনাথের, উপেন্দ্রকিশোরের রচনাবলি ; আর অন্যটা হ'লো সেই জাতের বই, যাতে বুদ্ধির পরিণতিক্রমে ইঙ্গিতের গভীরতা বাড়ে, যেমন ক্যারলের অ্যালিস-কাহিনী, আণ্ডেরসেনের রূপকথা, বাংলা ভাষায় 'বুড়ো আংলা', 'আবোল তাবোল'। যাদের মনের এখনো দাঁত ওঠে নি, একেবারে তাদেরই জন্য প্রথম শ্রেণীর রচনা, তাদের ঠিক উপযোগী হ'লেই তা সার্থক হ'লো : কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর

রচনা, বিশেষ অর্থে শিশুপাঠ্য থেকেও, হ'য়ে ওঠে বড়ো অর্থে সাহিত্য, শিল্পকর্ম; অর্থাৎ লেখক ছোটোদের বই লিখতে গিয়ে নিজেরই অজান্তে সকলের বই লিখে ফেলেন। বাংলা ভাষার সাম্প্রতিক শিশুসাহিত্য, যা বয়স্করাও উপভোগ করেন, তা এ-দুয়ের কোনো শ্রেণীতেই পড়ে না; খুব ছোটোদের খাদ্য এটা নয়— বরং বলা যায় কিশোর-সাহিত্য— আর বয়স্কদের যখন ভালো লাগে, তখন এই কারণেই লাগে যে লেখক তা-ই ইচ্ছে ক'রেছিলেন, অনেক সময় বোঝা যায় যে লেখক যদিও মুখ্যত বা নামত ছোটোদের জন্য লিখেছেন, তবু সাবালক পাঠকও তাঁর লক্ষ্যের বহির্ভূত ছিলো না।

এর ফল— চারদিক মিলিয়ে দেখলে— ভালোই হয়েছে। প্রাচুর্য বেড়েছে, বেড়েছে উপাদানের বৈচিত্র্য, সেই সঙ্গে রূপায়ণেও সমৃদ্ধি এসেছে। বিস্তর বই বেরোচ্ছে আজকাল, বিস্তর বাজে বই বেরোচ্ছে— কিন্তু সেই সব খড়-বিচালির স্তূপের মধ্যে শস্যকণারও পরিমাণ বড়ো কম নেই। রচনার নতুন ধারা নানা দিকেই বেরিয়েছে; তার একটা হ'লো বহির্জীবনের ঘটনাবহুল কাহিনী, যাকে বলে অ্যাডভেঞ্চার, আর কৌতুক-রচনা— 'পরশুরাম'-এর অনন্য উদাহরণ বাদ দিলে —সম্প্রতি যেন বিশেষভাবে শিশুসাহিত্যেই আশ্রয় নিয়েছে। এই উভয় বিভাগেই দেখা যায়, লেখকরা নাবালক-বুদ্ধির গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকতে নারাজ; তাঁদের লেখাটা হয় ছোটদের মাপের, কিন্তু বিষয়টা সবসময় আন্দাজমতো হয় না, কখনো-কখনো পরিণত মনের প্রবীণতা তাতে ধরা পড়ে। আমি কী বলতে চাচ্ছি সেটা স্পষ্ট হবে হেমেন্দ্রকুমারের সঙ্গে প্রেমেন্দ্র মিত্রের রোমাঞ্চিকার তুলনা করলে। 'যখের ধন' খাঁটি কিশোর-সাহিত্য— আর লেখার জাত হিশেবেও বাংলা ভাষায় নতুন— কিন্তু প্রেমেন্দ্র মিত্রের নতুন 'বৈজ্ঞানিক' অ্যাডভেঞ্চারে যেন আরো-কিছুর সম্ভাবনা আমরা দেখতে পাই। শুধু সম্ভাবনা, সেটুকুই যা দুঃখ। তাঁর চান্দ্র ভ্রমণের রহস্যঘন কাহিনী বা দানাবিক দ্বীপের লোমহর্ষক উপাখ্যান, এ-সব রচনাকে শিশুসাহিত্য বললে একটু কম বলা হয়, কিন্তু অন্য কোনো নামও এদের দেয়া যায় না। এতে এমন উপকরণ আছে, যাতে পরিণত মনেও কৌতূহলের উত্তেজনা আসে, কিন্তু সেই উত্তেজনার তৃপ্তির পক্ষে যথোচিত উপাদান বা ব্যবস্থাপনা নেই। আমরা বয়স্করা রুদ্ধশ্বাসে প'ড়ে উঠি, কিন্তু প'ড়ে উঠে মনে হয় যে আরো অনেক বিস্তার করলে, আরো অনেক বৈজ্ঞানিক ও মানবিক তথ্য যোগ করলে, তবে বিষয়টির প্রতি সুবিচার হ'তো, 'শিশুসাহিত্য' হবার জন্য গল্পটা যেন বাড়তে পেলো না। এর মানে এ-কথা নয় যে কিশোর পাঠকের ভাগে কোথাও কম পড়লো; আমার বক্তব্য শুধু এটুকু যে এদের যেন বয়স্কোচিত গল্প হবারই কথা ছিলো, অবস্থাগতিকে ছিটকে পড়েছে শিশুসাহিত্যে।* অনেকটা এইরকমের ধারণা দেয় হাস্য-রচনাও; সেখানেও, যেমন শিবরামের কোনো-কোনো গল্পে, অভিজ্ঞতাটা পাই বয়স্ক জীবনের, শুধু পরিবেষণটা কৈশোরোচিত।

শিবরাম চক্রবর্তীর উপাদান ছিলো প্রমাণসই হাস্যরসিকের, কিন্তু তিনি তাঁর

পুরো আকারে পৌঁছতে পারলেন না ; ঘটনাচক্রে— কিংবা হয়তো তাঁর স্বভাবেই একটা অসংশোধনীয় ছেলেমানুষি আছে ব'লে— শিশুসাহিত্যেই আবদ্ধ থাকলেন। অবশ্য 'বড়োদের জন্য'ও তিনি লিখেছেন, 'কিন্তু সে লেখা তাঁর 'ছোটোদের' লেখারই আদিরসাত্মক প্রকরণমাত্র, এ ছাড়া আর তফাৎ কিছু নেই। এ-কথাটা প্রশংসার হ'লো না, কিন্তু আরো-কিছু অপ্রশংসাকে শিবরাম যেন নেমন্তন্ন ক'রে ডেকে পাঠান ; তিনি যে মাঝে-মাঝে, একটু ভিন্ন অর্থে লোক হাসান, তাঁর রচনাবলির অনেকটা অংশ যে চর্বিতচর্বণ, শ্লেষ, যমক ইত্যাদি অলংকারগুলোকে তিনি যে প্রায় বিভীষিকার স্তরে নিয়ে গেছেন, এ-সব কথা বলার জন্য সমালোচকের প্রয়োজন হয় না, তাঁর নাবালক পাঠকেরাও তা বলতে পারে। কিন্তু এই সমস্ত দোষ যোগ ক'রে দেখলেও তাঁর গুণের অংশকে মলিন করতে পারে না ; সব সত্ত্বেও এ-কথাটা সত্য থেকে যায় যে কৌতুকের কলাক্ষেত্রে তাঁর স্বাক্ষর জাজ্বল্যমান ; যেখানে তাঁর রচনা উৎকৃষ্ট— আর সে-রকম গল্পও সংখ্যায় তিনি অনেক লিখেছেন— সেখানে তাঁর হাস্যরস এমন দুর্বার যে তার আঘাতে পাকা বুদ্ধির দেয়ালসুদ্ধু ভেঙে পড়ে। শিবরামের 'কালান্তক লাল ফিতা'— যেখানে আদালতের ব্যূহ থেকে সম্পত্তি উদ্ধারের চেষ্টা পরলোকে পৌঁছিয়ে দিয়েও থামলো না, বা 'পঞ্চাননের অশ্বমেধ'— যে-গল্পের শেষে 'ঘোড়াটা হাসতে-হাসতে ম'রে গেলো', বা যে-গল্পে তিনি কুশলপ্রশ্নের নিক্তিমাপা জবাব দেবার জন্য গাণিতিক ভাষা উদ্ভাবন করেছেন— এ-সব গল্প শিশুসাহিত্যের গণ্ডি পেরিয়ে বাংলা ভাষার কৌতুকসাহিত্যে স্থান পায়। তুলনীয় গল্প তাঁর আরো আছে, সমসাময়িক অন্য লেখকদেরও আছে ; উদাহরণত উল্লেখ করবো রবীন্দ্রলাল রায়ের 'দিনের খোকা রাতে', বা সেই জীবনের পক্ষে অতি সত্য গল্পটি, যেখানে নায়ক ছাতা ভুললেই ধারাবর্ষণ নামে আর বর্ষাতি নিলেই রোদ্দুর ওঠে দেখে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলো যে বিশ্বজগতে 'আমার জন্যই সব হচ্ছে' ; —সব মিলিয়ে বোঝা যায় যে আধুনিক লেখক উপাদানের জন্য বালকজীবনে আবদ্ধ থাকেন না, যদিও হাসির ভোজে ছেলেবুড়োর অংশ থাকে সমান— কেন না এ-সব লেখায় ঠাট্টা থাকলেও উগ্রতা নেই। যা বিশেষ অর্থে ব্যঙ্গ নয়, শুধুই কৌতুক— এই বস্তুটি আমাদের শিশুসাহিত্যেই প্রচুর হ'য়ে দেখা দিয়েছে, এ-কথাটি আনন্দের সঙ্গে লিপিবদ্ধ করি।

উপরন্তু প্রমাণ মেলে যে ব্যঙ্গরচনাও ঝিমিয়ে পড়ে নি। যোগ্য কারিগর আছেন অন্নদাশঙ্কর, যাঁর হাতে বাংলাদেশের সনাতন ছড়া নতুন ক'রে জেগে উঠেছে। আধুনিক কবির হাতে ছড়া বেরোতে পারে শুধু এই শর্তে যে তাতে তিনি বক্তব্য কিছু দেবেন, অথচ সেটুকুর বেশি দেবেন না যেটুকু এই হালকা ছোটো চটুল শরীরে ধ'রে যায়। একেবারে সারাংশ কিছু না-থাকলে তা নেহাৎই শব্দের টুংটাং হ'য়ে পড়ে, আবার মাত্রা একটু বেশি হ'লেও ছড়া আর থাকে না। অন্নদাশঙ্কর দু-দিকই ঠিক সামলে চলেন, তাঁর ছড়ার একরত্তি রূপের মধ্যে একটি ফোঁটা বস্তুও তিনি বসিয়ে দেন, সঙ্গে দেন কৌতুকের সেই আমেজটুকু, যার স্বাদ জিভে লেগে থাকে। তাঁর 'উড়কিধানের মুড়কি' প'ড়ে সাবালক পাঠকের সবিস্ময় প্রশংসা জেগেছে ; সেই

একই ঝাল-মিষ্টি-মেশানো মুড়মুড়ে ঠাট্টা আবার তিনি ছড়িয়েছেন 'রাঙা ধানের খৈ'তে, এ-খই 'ছোটোদের' ব'লে আলাদা ক'রে চেনা যায় না।[৪] ছোটোদের ভিড় জ'মে উঠবে সন্দেহ নেই, কিন্তু ঠাট্টার সবটুকু রস শুধু বয়স্ক পাঠকই পাবেন. কেন না লেখকের বক্তব্যবিষয়ে 'কেশনগরের মশা'র কাঁদুনিটাই শেষ কথা নয়. বই জুড়ে ঝলক দিচ্ছে যুদ্ধকালীন পলিটিক্যাল ব্যঙ্গ' ভারতভঙ্গের বেদনা. আর উঁচু হ'য়ে ফুটে আছে একটি আশ্চর্য সুলিখিত নাটিকা. সেখানে লেখক, হাস্যমুখর ছন্দ চালিয়ে, পিষ্টকগ্রাসী বিচারক বানরের পুরোনো নীতিকথায় ভারত-পাকিস্তান-ব্রিটিশ সম্বন্ধের বিবরণ দিয়েছেন। শিশুমহলে রাজনীতির প্রবেশ 'সন্দেশ'-এর সময়ে অভাব্য ছিলো, এখানেও এই দুই যুগের প্রভেদ বোঝা যায়।

কিন্তু এই প্রভেদের প্রকৃষ্ট উদাহরণ লীলা মজুমদার। তার কারণ. তিনি নতুন যুগের স্বাদ এনেছেন, বিষয়গত বৈচিত্র্য দিয়ে নয়, রূপায়ণের অভিনবত্বে। নতুন বিষয়ের নিজস্ব একটি আকর্ষণ আছে. তার প্রভাবে লেখাটা গৌণ হ'য়ে যায় অনেক সময়, কিংবা ভুল কারণে মূল্য পায়। এই আকর্ষণ লীলা মজুমদারে নেই. আর নেই বলেই তাঁর লেখায় দুই যুগের পার্থক্য স্পষ্ট হয়েছে— বস্তুর দিক থেকে নয়, চরিত্রের দিক থেকে। প্রেমেন্দ্রের মতো বা অন্নদাশঙ্করের মতো তিনি অপূর্ব কোনো উপাদান আমদানি করেন নি; তিনি লিখেছেন সেই পুরোনো ছোটো ছেলেরই গল্প, যে-ছেলে চেয়ে দ্যাখে, অবাক হয়, স্কুলে যায়— যেতে চায় না; এখানে কৃতিত্বটুকু সমস্ত তাঁর লেখায়, নতুনত্ব সমস্ত তাঁর দৃষ্টিতে। বিষয়বস্তুর মিল থাকলে পূর্বাপর তুলনা করা সহজ নয়, এ-ক্ষেত্রে তার আরো-একটা বড়োরকমের সুবিধে আছে। লীলা মজুমদার সুকুমার রায়ের পিতৃব্যপুত্রী, রায়চৌধুরীদের বংশগত দীপ্তি পেয়েছেন. কিন্তু এই 'পারিবারিক সাদৃশ্য' ছাড়াও তিনি বিশেষ অর্থেই সুকুমার রায়ের উত্তরসাধক। তাঁর 'দিন দুপুরে'র সঙ্গে 'পাগলা দাশু' মিলিয়ে পড়লে তৎক্ষণাৎ কিছু সামান্য লক্ষণ ধরা পড়ে: সেই একই রকম চাপা হাসি. মুখ টিপে হাসি, নকল-গম্ভীর বাচন-ভঙ্গি, এমনকি সেই বালিকার বদলে বালক-মনেরই নেপথ্য-লোকে আলো ফেলা। 'দিন দুপুরে'র কুশীলব যে ছেলেরাই, কখনোই কোনো মেয়ে নয়, এতে একটু বিস্ময় জাগে. কোথায় একটু অভাব ব'লেই অনুভূত হয়— কিন্তু এই অভাব পূরণ ক'রে দেয় লেখিকার বালকজীবনের সহজ বোধ, আর স্কুল-ছেলেদের অসাধু এবং বলশালী স্ল্যাং বুলিতে তাঁর এমন দখল. যাতে ফিরে-ফিরে তাঁর অগ্রজকেই মনে পড়ে।

এই সাদৃশ্যের পটভূমিতে লীলা মজুমদারের বৈশিষ্ট্য আরো উজ্জ্বল হয়েছে। মোটের উপর, পূর্বসূরির তুলনায়, তাঁকে মনে হয় বেশি অভিজ্ঞ. বেশি সচেতন, কিংবা যাকে ইংরিজিতে বলে সফিস্টিকেটেড— আশা করি কথাটায় কেউ অপরাধ নেবেন না। এর সমস্তটাকেই কালধর্মের প্রভাব ভাবলেও ভুল হবে, তাতে লেখকের স্বকীয়তাকে খর্ব করা হয়। যেমন তাঁর গল্পের স্বাদ 'পাগলা দাশু'র সীমাতিক্রান্ত, তেমনি সমসাময়িক কারো সঙ্গেও তাঁর সাদৃশ্য নেই। তিনিও কৌতুকের কারুকর্মী,

কিন্তু শিবরামের মতো অতিরঞ্জনপন্থী নন, অন্নদাশঙ্করের ব্যঙ্গও তাঁর ধাতে নেই ; তাঁর গল্পে কখনোই আমরা চেঁচিয়ে হাসি না, কিন্তু আগাগোড়াই মনে-মনে হাসি— আর কখনো-কখনো শেষ ক'রে উঠে ভাবতে আরো বেশি ভালো লাগে। এই কৌতুকের সঙ্গে কল্পনা এমন সুমিত হ'য়ে মিশেছে, এমনভাবে আজগুবির সঙ্গে বাস্তবের মাত্রা ঠিক রেখে, আর এমন নিচু গলার লয়দার গদ্যের বাহনে, যে লীলা মজুমদারকে— তাঁর পরিমাণের মন-খারাপ-করা ক্ষীণতা সত্ত্বেও বাংলা শিশু-সাহিত্যে স্বতন্ত্র একটি আসন দিতে হয়।

পাঁচ

বাংলা শিশুসাহিত্যে দুই যুগ দেখিয়েছি ; প্রথমে সরল, সংকলনপ্রধান, বিশুদ্ধ-রূপে শিশুসেব্য ; তারপর উদ্ভাবনে নিপুণ, উপকরণে বিচিত্র, অংশত প্রবীণপাঠ্য। দুই যুগের চরিত্রভেদও দেখিয়েছি, বলতে চেয়েছি আধুনিক লেখক একান্তভাবে ছোটোদের জন্য লেখেন না, আর ছোটোরাও তেমন ছোটো আর নেই। এর সঙ্গে কিছু-কিছু 'তবে' 'কিন্তু' যোগ করা সম্ভব হ'লেও মোটের উপর এই বিভাগের যাথার্থ্য নিয়ে তর্ক ওঠে না। কিন্তু এই সীমাচিহ্ন, ইতিহাসের খুঁটি, এই সুবিধাজনক কাজ-চালানো ব্যবস্থা— সমস্ত ভেঙে পড়ে, অর্থ হারায় যখন আমরা অবনীন্দ্রনাথের সম্মুখীন হই। দুই যুগে ব্যাপ্ত হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি, এপার গঙ্গা ওপার সেতুবন্ধী সওদাগর। তাঁকে দুই শতকের অন্তর্বর্তী করেছে তাঁর আয়ুষ্কাল ; লেখকজীবনের পরিধির মাপে তিন পুরুষের সমসাময়িক তিনি। তাঁকে উপেন্দ্রকিশোরের সতীর্থ ব'লে ভাবতে পারি, আবার আধুনিক রঙ্গমঞ্চেও তিনি প্রতীয়মান। উভয় যুগেরই চিহ্ন আছে তাঁর রচনায় ; আরম্ভকালের লক্ষণ দেখি অনুরচনার উন্মুখতায়, আবার বর্তমানের ঝোঁক পড়েছে শিশুগ্রন্থের সর্বজনীন আবেদনে।

না— ভুল হ'লো, ঠিক কথাটি বলা হ'লো না। অবনীন্দ্রনাথ, বাল্যবঙ্গের রত্নবণিক তিনি, এ-কথা যেমন সত্য, তেমনি এ-বিষয়েও সন্দেহ নেই যে শিশু-সাহিত্যের ফ্রেমের মধ্যে তাঁকে ধরানো যায় না। 'নালক', 'রাজকাহিনী', 'বুড়ো আংলা', 'আলোর ফুলকি', এ-সব বই আলাদা ক'রে ছোটোদের নয়, আলাদা ক'রে বড়োদেরও নয় ; এখানেই তিনি খুঁজে পেলেন নিজেকে বাস্তুভিটার দখল পেলেন। এটাই তাঁর ভাষা, তাঁর মনের ভাষা, প্রাণের ভাষা ; এটাই তাঁর স্বর, তাঁর গলার স্বর, সত্তার স্বর ; এটাই— তিনি। যে-সব লক্ষণের কথা বলেছি, যেখানে-যেখানে দুই যুগেরই সঙ্গে তাঁর মিল দেখিয়েছি, আসলে সেগুলোই তাঁর মনের অভিজ্ঞান, তাঁর চরিত্রের প্রমাণপত্র। যে-কালে তিনি জন্মেছিলেন, যে-কুলে তিনি জন্মেছিলেন, সেখানে তাঁকে খুঁজতে গেলে দিশে মিলবে না, বড়ো জোর টুকরো ক'রে পাওয়া হবে। 'নালক' থেকে 'আপন কথা' পর্যন্ত বইগুলো যখন চিন্তা করি, তখন মনে হয় যে তাঁর মতো অখণ্ড চরিত্র নিয়ে আর-কোনো বাঙালী লেখক জন্মান নি, আর-কেউ নেই তাঁর মতো একই সঙ্গে এমন উদাসীন আর চকিতমনা, এমন দূরে থেকেও

সংবেদনশীল। তাঁর জীবৎকালে কত হাওয়া উঠলো সাহিত্যে, কত হাওয়া ঘুরে গেলো, কিন্তু সে-সবের একটিও খড়কুটো দেখতে পাই না এখানে, কারোরই কোনো 'প্রভাব' ধরতে পারি না, পাশের বাড়ির রবিকাকার পর্যন্ত না— যদিও সেই রবিকাকারই উৎসাহে তিনি তুলিতে অভ্যস্ত হাতে প্রথম কলম ধরেছিলেন। সমসাময়িক পরিবেশের মধ্যে তিনি যেন থেকেও নেই ; তিনি লিখেছেন একলা ব'সে আপন মনে ঘরের কোণে, লিখেছেন যে-রকম ক'রে না-লিখেই তিনি পারেন নি ; ভাবেন নি সে-লেখা কার জন্য, কে পড়বে ; —কিংবা যদি-বা ছোটোদের কথা ভেবে থাকেন, সেই ছোটোরাও বিশ্বমানবেরই প্রতীক।

আরো বুঝিয়ে বলি কথাটা। যাঁরা সাবালকপাঠ্য লেখক, মাঝে-মাঝে ছোটোদের জন্য লেখেন, আর সেখানেও বয়স্ক জীবনের বক্তব্য বাদ দেন না, অবনীন্দ্রনাথ তাঁদের দলে পড়েন না। ইতিপূর্বে তাঁর নাম করেছি ওঁদের সঙ্গে, যাঁদের হাতে শিশুপাঠ্য রচনাও বড়ো অর্থে সাহিত্য হ'য়ে ওঠে, হ'য়ে ওঠে সাহিত্যশিল্পের চিরায়ত উদাহরণ। কিন্তু এখানেও একটু আলাদা ক'রে দেখতে চাই। একদিকে রাখতে চাই সুকুমার রায়, লুইস ক্যারলকে, শিশুসাহিত্যের অতি বিদগ্ধ লেখক যাঁরা, যাঁদের কৌতুকের অভিপ্রায় ভাষাব্যবহারে অসামান্য নৈপুণ্য-দ্বারাই সার্থক। আর অন্য দিকে আছেন হান্স আণ্ডেরসেন, অবনীন্দ্রনাথ, যাঁদের শিশু-সাহিত্যে জীবনের মূল্যায়ন পাই, বাণী শুনতে পাই মানবাত্মার উদ্দেশে। অর্থাৎ, এঁরা সেই বিরল জাতের বড়ো লেখক, যাঁদের আত্মপ্রকাশের বাহনই হ'লো শিশু-সাহিত্য। কিংবা হয়তো এঁদের রচনা দৈবক্রমে শিশু-সাহিত্যের অন্তর্ভূত হয়েছে ; আসলে— এবং কার্যত— তা সর্বজনীন, যদিও একান্তভাবে বয়স্কপাঠ্য রচনায় এঁরা তেমন সপ্রতিভ নন। আণ্ডেরসেনের জগৎজোড়া খ্যাতির নির্ভর তাঁর রূপকথাই, অন্য কোনো রচনা নয়, আর অবনীন্দ্রনাথও 'পথে-বিপথে' লিখেছিলেন— 'বড়োদের' বই সেটি— কিন্তু সেখানে তাঁকে চিনতে পারি না— যেন তিনি অন্য মানুষ, রীতিমতো 'শিক্ষিত', 'ভদ্রলোক' ; —সেখানে মাঝে মাঝে রবীন্দ্রনাথের বোল দেয়— এমনকি, বঙ্কিমেরও — ভ্রমণচিত্রের কোনো-কোনো অংশে ছাড়া, সেটি 'ভারতী'-গোষ্ঠীর যে-কোনো ভালো লেখকের রচনা হ'তে পারতো। আর তাঁর মুখে-বলা বই— 'ঘরোয়া', 'জোড়াসাঁকোর ধারে', এদেরও মূল্য প্রধানত তথ্যগত, শিল্পগত নয়। কিন্তু যেখানে তিনি শিল্পী, স্রষ্টা, যেখানে তিনি নিগূঢ় অর্থে মৌলিক, সেখানে তাঁকে দেখতে হ'লে আসতে হবে এই অনুরচিত বইগুলির কাছে— এই 'নালক', 'রাজকাহিনী', 'বুড়ো আংলা', 'আলোর ফুলকি'[৫] — যে-সব বই তিনি লিখেছিলেন তাদেরই জন্য, যারা 'ছেঁড়া মাদুরে নয়তো মাটিতে ব'সে গল্প শোনে, ইতিহাসের সত্যিকার "রাজা-রানী-বাদশা-বেগম" ' যারা। তাঁর বিষয়ে এ-কথাও ঠিক বলতে চাই না যে তিনি ছোটোদের বই লিখতে গিয়ে সকলের বই লিখে ফেলেছেন, বলতে চাই তিনি প্রথম থেকেই সকলের বই লিখেছেন, শিশুর বইয়ের ছল ক'রে মানুষের বই লিখেছেন তিনি। তাঁর মনের মধ্যে সেই মানুষ ব'সে ছিলো – 'সেই সত্যিকার রাজা-রানী-বাদশা-বেগম'—

যে-মানুষ না-ছেলে. না-বুড়ো, কিংবা একই সঙ্গে দুই— যার বয়সের হিশেব নেবার কথাই ওঠে না, উপায়ও নেই— আজকের ভোরবেলাটির মতো নতুন আবার সভ্যতার সমান বুড়ো সেই রূপকথার চিরকালের যে শ্রোতা এবং নায়ক। আর এ-সব বই যে-ভাষায় তিনি লিখেছেন— সেটা তাঁর মনের ভাষা, প্রাণের ভাষা ; —সে তো ভাষা নয়, ছবি, সে তো ছবি নয়, গান ; —সুর তাতে রূপ হ'য়ে ওঠে, আর রূপ যেন সুরের মধ্যে গ'লে যায় ; —তাতে ছবির পর ছবি দেখি চোখ দিয়ে, আর কানে শুনি একটানা গান গুনগুন ; —তার সম্মোহন কেউ নেই যে ঠেকাতে পারে। আব এই জাদুকর গদ্যে যা-কিছু লিখেছেন, তাতে বুদ্ধিঘটিত বস্তু কিছু নেই, তার আবেদন ভাবনার কাছে নয়, কল্পনার কাছে, আমাদের কৌতূহলে নয়, ইন্দ্রিয়ে —চেতনায়। এই খেলার রসগ্রহণের জন্য 'শিক্ষিত' হ'তে হয় না, 'অভিজ্ঞ' হ'তে হয় না ; মনের চোখ, মনের কান আর চলনসই গোছের হৃদয়টুকু থাকলেই যথেষ্ট। অর্থাৎ, নানা বয়সের নানা স্তরের মানুষের মধ্যে যে-অংশ, সামান্য, সেই অংশই অবনীন্দ্রনাথের ছেঁড়া কাঁথার রাজপুত্তুর। তাই তাঁর শিশুগ্রন্থ সর্বজনীন।[৬]

এই যিনি কথাশিল্পে রূপকার, সুরকার, বাংলা গদ্যের চিত্ররথ গন্ধর্ব যিনি, এবার তাঁকে বিশেষভাবে শিশুসাহিত্যের সংলগ্ন ক'রে দেখা যাক। প্রথমেই বলতে হয়— যা অন্যভাবে আগেই বলা হয়েছে— যে অবনীন্দ্রনাথ বই লিখেছেন, ছোটোদের জন্য নয়, ছোটোদের বিষয়ে। হান্স আণ্ডেরসেনের মতো, তিনিও প্রতিভাবান শিশু-প্রেমিক ও পশুপ্রেমিক ; তাঁর বই আলো হ'য়ে আছে এক আশ্চর্য ভালোবাসায়, যা এই দুই প্রাকৃত জীবের ভিতর দিয়ে বিশ্বজীবনে ছড়িয়ে পড়ে। 'খাতাঞ্চির খাতা'য় পুতু সেখানে 'হিপুলিপাতার জামা বাতাসে মেলে দিয়ে,' 'জোনাকপোকার মতো একটুখানি আলো' নিয়ে ঘরের মধ্যে উড়ে এসে 'ঝুমঝুম ক'রে ঘুঙুর বাজিয়ে' খেলতে লাগলো ; সেখানে, 'রাজকাহিনী'র নিষ্ঠুরতম হত্যার আগে, পাহাড়ের উপর ভাঙা কেল্লায় দুই নিরীহ দুর্ভাগা আফিংচি বুড়ো তাঁদের কুড়োনো কন্যাটিকে নিয়ে একটি পিদিমের একটুখানি আলোয় মস্ত একখানা অন্ধকারের মধ্যে' ব'সে আছেন, আর বুড়ো চাচার ছেলেবেলার গল্প শুনতে-শুনতে মেয়েটির 'চোখ ঘুমিয়ে পড়ছে'— সেখানে, আর এই রকমের আরো অনেক দৃশ্য, আমরা যা অনুভব করি, যাতে দ্রব হই, নন্দিত হই, সেটা লেখকের এই মজ্জাগত গুণ— ঠিক গুণও নয়, তাঁর হৃদয়ের ক্ষরণ— তাঁর অপরিমাণ স্নেহ, উদ্বেল বাৎসল্য। এই স্নেহ পরতে-পরতে মিশে আছে তাঁর রচনায়, যেন ছাপার লাইনগুলির ফাঁকে-ফাঁকে ব'য়ে চলেছে, কিন্তু কোথাও-কোথাও ঢেউ উঠেছে বড়ো-বড়ো— সবচেয়ে বড়ো ঢেউ 'ক্ষীরের পুতুল'-এ, ষষ্ঠীতলার সেই মহীয়ান স্বপ্নে, যেখানে লেখক বিশ্বশিশুর বর্ণনা দিতে-দিতে ছড়ার মন্ত্রে বাংলাদেশের প্রতিমায় প্রাণ দিয়েছেন। গল্পের উপসংহারের জন্য তুচ্ছ কোনো দৈব উপায় এটা নয়, গল্পের প্রাণের কথা এখানেই বলা আছে— এই স্বপ্নটিতেই অবনীন্দ্রনাথের আসল পরিচয়। এ তো স্বপ্ন নয়, দৃষ্টি, পরাদৃষ্টি— যাকে বলে vision —সেই একই, যে-দৃষ্টিতে ধরা পড়ে— 'জগৎপারাবারের তীরে ছেলেরা করে খেলা।'[৮]

এই একটা জায়গায় বড়ো রকম মিল পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রের। রবীন্দ্রনাথেও বাৎসল্যবৃত্তি অসামান্য ; ব্যাপ্ত হয়ে, বিচিত্র হ'য়ে তা প্রকাশ পেয়েছে, যেন প্রাণের পেয়ালা উপচে পড়েছে বার-বার, নানা রসে, নানা ভাবে, নানা ভঙ্গিতে। তাঁর উপন্যাসে শিশুচরিত্র যেমন প্রচুর, তেমনি জীবন্ত ; সেখানেই তারা দেখা দেয়, সেই অংশেই পুলক লাগে। 'গল্পগুচ্ছে'— শুধু 'কাবুলিওয়ালা' নয়, 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন', 'ছুটি', 'রাসমণির ছেলে', এইরকম অনেক গল্পই স্নেহসূত্রে বিকশিত, 'পোস্টমাস্টার'ও— শেষপর্যন্ত— তা-ই, আর মৃন্ময়ী, গিরিবালা প্রভৃতি বালিকা-নায়িকাদের বিষয়ে নায়কের প্রণয় ছাপিয়ে প্রবল হ'য়ে উঠেছে লেখকের বাৎসল্যবোধ।[৭] 'ছুটি'র ফটিককেই, আবার আমরা দেখতে পাই 'দেবতার গ্রাস'-এর রাখালে, 'খাতা'র উমাকেই চিনতে পারি 'পলাতকা'র 'চিরদিনের দাগা'য় আবার 'পুনশ্চ'র 'শেষ চিঠি'তে। নাটকে কাঁচা হাতে আরম্ভ হ'লো 'প্রকৃতির প্রতিশোধ', তারপর 'বিসর্জন' ; তারপর শিশুর মুখে ঋষির কথা শোনালেন 'শারদোৎসবে', 'ডাকঘরে'। আর 'শিশু' সেই হাসিকান্নায় বিনুনি-করা কবিতা, অমন হালকা, চপল, গভীর, সুদূরস্পর্শী, একাধারে অমন পার্থিব আর স্বর্গীয়, যার অনুরূপ অন্য কোনো লেখার অস্তিত্বের কথা আমি জানি না, যার তুলনায় উইলিয়ম ব্লেকের শৈশব-গীতিকা অনেক বেশি গভীর ও বলীয়ান হ'লেও একটু বিশেষ অর্থে ধর্মীয় ও গম্ভীর— সেখানে স্নেহ, তার বাস্তবের রস ভরপুর বজায় রেখে, হ'য়ে উঠেছে পূজা, আর শিশু, রক্তে-মাংসে প্রামাণ্য থেকেও, হ'য়ে উঠেছে ভগবানের সঙ্গে মানুষের মিলনের উপায়। রবীন্দ্রনাথ, যেমন তিনি গাছের পাতায় সোনার বরণ আলোটিতেই চিরপ্রেমের অঙ্গীকার দেখেছিলেন, তেমনি রাঙা হাতে রঙিন খেলনা দিয়ে তবেই বুঝেছিলেন বিশ্বসৃষ্টির আনন্দময় রহস্য।

কিন্তু এই তুলনার এখানেই শেষ। এই সহজাত স্নেহশীলতা, আর জীবনের মধ্যে চিরশিশুর উপলব্ধি— শুধু এইভাবের দিকটিতেই সাদৃশ্য পাই অবনীন্দ্র আর রবীন্দ্রনাথের : রূপায়ণের ক্ষেত্রে কিছুই মিল নেই। দু'জনের তফাৎ— মস্ত তফাৎ— এইখানে যে অবনীন্দ্রনাথের বই সর্বজনীন হ'য়েও আলাদা অর্থে ছোটোদেরও উপযোগী, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ— পাঠ্যপুস্তক বাদ দিয়ে— সত্যিকার ছোটোদের বই একখানাও লেখেন নি। সেটা সম্ভব ছিলো না তাঁর পক্ষে, তিনি যে বড্ড বেশি বড়ো লেখক। আমি অবশ্য ভুলি নি যে 'শিশু', 'শিশু ভোলানাথ'-এর কোনো-কোনো কবিতা ছোটোদের পক্ষে অফুরন্তভাবে উপভোগ্য, 'মুকুট'-এর কথাও মনে আছে আমার— কিন্তু সে-কথা উঠলে সেখানেই বা থামবো কেন আমরা, কেন উল্লেখ করবো না 'ব্যঙ্গ-কৌতুক', 'হাস্য-কৌতুক', তারপর 'অচলায়তন', 'শারদোৎসব', 'কথা ও কাহিনী', এমনকি 'ডাকঘর', 'লিপিকা' আর শেষপর্যন্ত 'গল্পগুচ্ছের'ই বা নাম করতে দোষ কী। প্রায় সব বয়সেই পড়া যায় কিন্তু এক-এক বয়সে এক-এক স্তরে পড়া হয়, এমন রচনার অভাব নেই রবীন্দ্রনাথের, কিন্তু শিশুসাহিত্যের প্রসঙ্গে তাঁকে আনতে হ'লে বেছে নিতে হবে সে-সব বই, যেগুলো ভেবে-চিন্তে পাৎলা

ক'রে লেখা, যাতে কৈশোরোচিত চেহারা অন্তত আছে। আর এই ক্ষেত্রেই স্পষ্ট দেখতে পাই যে রবীন্দ্রনাথ, যতই চেপে-চেপে লিখে থাকুন, নিজেকে কখনো ছাড়াতে পারেন নি— কোনো মানুষই তা পারে না। 'সে', 'খাপছাড়া', 'গল্পসল্প', এদের আমি রাখবো— শিশুসাহিত্যের বিভাগে নয়, স্বতন্ত্র একটি শ্রেণীতে, এদের বলবো প্রতিভাবানের খেয়াল, অবসরকালের আত্মবিনোদন, চিরচেনা রবীন্দ্রনাথেরই নতুনতর ভঙ্গি একটি। 'ভূতপত্রী'র সঙ্গে 'সে' আর 'আবোল তাবোল'-এর সঙ্গে 'খাপছাড়া'র তুলনা করলে তৎক্ষণাৎ জাতের তফাৎ ধরা পড়ে ; আগের বই দুটির স্বাচ্ছন্দ্য এখানে নেই, এরা বড়ো বেশি সাহিত্যিক, বড়ো বেশি সচেতন— এমনকি আত্মসচেতন ; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামক মহাকবিটি মাঝে-মাঝেই উঁকি দিয়ে যান, আর তাঁরই হাতের নতুন কৌশল আমরা অভিজ্ঞ পাঠকরা চিনতে পেরে খুশি হই। সুকুমার রায়ের ও অবনীন্দ্রনাথের— 'সে'-র মুখের কথা দিয়েই বলছি— 'কেরামতিটা কম ব'লেই সুবিধা' ছিলো।

অবনীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের প্রতিতুলনায় আরো-একটু যোগ করবো। রবীন্দ্রনাথের নানা দিকের মধ্যে শুধু একটি ছিলো শৈশব-সাধনা, আর অবনীন্দ্রনাথে এটি প্রায় সর্বস্ব, অন্তত— তাঁর সাহিত্যে— সর্বপ্রধান। তাঁর ভিতরকার বালকটিকে রবীন্দ্রনাথ কখনো ভুললেন না, আর অবনীন্দ্র তাকে হারিয়ে ফেলতে অস্বীকার করলেন। রবীন্দ্রনাথের শিশুকাব্য হাওয়ার মতো হালকা, তিনি তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন রেখেছেন পূর্ণপরিণত জীবনের ওজন ; আর অবনীন্দ্রনাথ, শৈশবের পরশমণি ছুঁইয়ে, জীবন নামক ব্যাপারটাকেই নির্ভার ক'রে তুলেছেন। বয়স্ক জীবনের বড়ো-বড়ো অভিজ্ঞতাকে স্থান দিয়েছেন তিনি— ঘৃণা, হিংসা, প্রেম— কিন্তু সেগুলোকে এমন ক'রে বদলে নিয়েছেন, এমন কোমল স্বপ্নের রঙে গালিয়ে নিয়েছেন, যে তাদের আর চেনাই যায় না, অথচ ঠিক চেনাও যায়। 'আলোর ফুলকি'তে কত কথাই বলা আছে! সুরের বিরুদ্ধে অসুরের চক্রান্ত, আলোর বিরুদ্ধে পিশাচশক্তির, শিল্পীর নিষ্ঠা, পুরুষের বীর্য, নারীর ছলনা, নারীর ত্যাগ। স্ত্রী-পুরুষের মিলনের কথা— শুধু 'আলোর ফুলকি'তে নয়— বারে-বারেই দেখা দেয় তাঁর লেখায়, দেখা দেয় অনিবার্য ভাবেই, সৃষ্টির এই মূলসূত্রটিকে দূরে রাখলে কিছুতেই তাঁর কাজ চলতো না। শিশুসাহিত্যে নিষিদ্ধ এই বিষয়টিকে তিনি 'গৃহীত' ব'লে ধ'রে নিয়ে নিঃশব্দ থাকেন নি, কিংবা শুধু ভাবের দিক থেকেই দেখান নি তাকে, রীতিমতো তার ছবিও দিয়েছেন— সে-ছবি যেমন বাস্তব, তেমনি বস্তুভারহীন। মনে করা যাক 'বুড়ো আংলা'র সেই অর্থময় দৃশ্যটি, যেখানে খোঁড়া হাঁসের সঙ্গে সুন্দরী বালিহাঁসটির দেখা হবার পর, ওরা দু'জনে 'জলে গিয়ে সাঁতার আরম্ভ করলে',[৮] আর একলা রিদয় পাড়ে ব'সে বেনার শিষ চিবোতে লাগলো ; কিংবা— যেখানে 'কোটি কোটি আগুনের সমান' সূর্যদেবের আলো ক্রমশ ক্ষীণ হ'তে হ'তে শুধু একটুখানি রাঙা আভা হ'য়ে 'সধবার সিঁদুরের মতো' সুভাগার বিধবা সিঁথি 'আলো ক'রে রইলো' —আর তারপরেই মানবীর কোলে জন্ম নিলো দেবতার সন্তান। এই প্রতীকচিত্র অবনীন্দ্রনাথ এঁকেছেন— আইন-মাফিক শিশু-

সাহিত্যের সীমার মধ্যে থাকার জন্য নয়— তাঁর মনের ভাষাই ঐ-রকম ছিলো ব'লে। ও-রকম ক'রেই ভাবতেন তিনি, ও রকম ক'রেই দেখতেন, তাঁর স্বভাবই ছিলো রূপকথা ক'রে সব কথা বলা। যাকে তিনি গল্প শুনিয়েছেন, তিনি নিজেই সেই ছোটো ছেলে, তারই নিদ্রাতুর স্বপ্ন-জড়ানো অথচ স্বচ্ছ চোখ দিয়ে জগৎটাকে দেখেছেন তিনি ; তাঁর জগৎটাই শিশুর জগৎ কিংবা শিশুজগৎ— বিরাট বিশ্বকে গুটিয়ে এনে এইটুকু কোটোর মধ্যে তিনি ধরিয়ে দিয়েছেন। সেখানে সবই খুব ছোটো মাপের, বয়স্ক কিছু নেই, মায়েরা ছোটো মেয়ের মতো, দাড়িওলা রাজপুত রাজারা ঠিক যেন ছোটো ছেলেটি ; যেন বিচিত্র মানুষের মধ্য থেকে সামান্য লঘিষ্ঠ সংখ্যাটিকে বের ক'রে নিতে হ'লো, বড়ো এবং বুড়ো লোকেদের মানিয়ে নেবার জন্য। নয়তো, এই একান্তরূপে প্রাকৃত জগতে, বয়স্কদের স্থান হ'তো না।

রবীন্দ্রনাথ দূর থেকে শিশুকে দেখেছেন, তার সঙ্গে বিচ্ছেদবোধে ব্যথিত হয়েছেন, বার-বার তৃষিত হয়েছেন তাকে ফিরে পাবার জন্য। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথে এই বিচ্ছেদটাই কখনো ঘটে নি। আর তাই, যেহেতু তিনি ছোটো ছেলের সঙ্গে এক হ'য়ে ছিলেন, তাঁর স্নেহের চেয়েও বড়ো হ'য়ে উঠেছে আর-একটি বৃত্তি : একটি আশ্চর্য শ্রদ্ধা, জীবনের প্রতি বিস্ময়ে ভরা শান্ত ধীর গভীর একটি সম্ভ্রম। এই হচ্ছে সেই চোখ, যে-চোখ সত্যিকার শিশুর, রূপকথার শিশু-মানুষের, যে পায়ের তলার পিঁপড়েটিরও কথা শুনতে থেমে দাঁড়ায়, বিশ্বজগৎকে বন্ধু ব'লে ধ'রেই নেয়— ধ'রে নিয়ে ভুল করে না। এ-চোখ দেখতে ভয় পায় না, দেখতে পেয়েও আকুল হয় না, এতে কাছে ডাকা নেই, দূরে রাখাও না— একই সঙ্গে নির্লিপ্ত ও ঘনিষ্ঠ, একে বলতে পারি প্রাণপদার্থের পবিত্রতাবোধ। আকাশের উঁচু পাড় থেকে যে-বাজ অমোঘ হ'য়ে নেমে আসে তাকেও এ নমস্কার জানায়, আবার পায়রার রক্তমাখা ছেঁড়া পালকটিকেও করুণা দিয়ে ধুয়ে দেয়। অবনীন্দ্রনাথের পশুচিত্রণ, তাঁর প্রকৃতির বর্ণনা, সবই এই উৎস থেকেই নিঃসৃত হয়েছে ; তাঁর পশুপাখিরা ব্যঙ্গকৌতুক উপদেশের উপায় নয়, তারা আছে ব'লেই মূল্যবান, আর ফুল, পাতা, জল, আকাশ —এরাও শুধু অলংকার নয় তাঁর কাছে, শুধু মানুষের মনের আয়নারও কাজ করে না, এরা নিজেরাই প্রাণবন্ত, ব্যক্ত, ব্যক্তিত্বধারী ; তাঁর লেখায় 'বীর বাতাস' ব'য়ে যায়, আলো কথা 'বলেন',[৯] 'বৃক্ষটি ভঙ্গি ধ'রে দাঁড়ান', আর কুঁকড়ো হ'য়ে ওঠে— হ'য়ে ওঠেন— শুধু কি কুক্কুটকুলচূড়ামণি, শুধু কি একজন মহাশয় ব্যক্তি ? শিল্পী, প্রেমিক, বীর, —এত বড়ো চরিত্ররূপ যে তুচ্ছ একটা মোরগের মধ্যে ফুটে উঠতে পারলো, এতে মূল লেখকের যতটা অংশই থাক না, অবনীন্দ্রনাথের হৃদয়ের দানও দীপ্ত হ'য়ে আছে। সে-দান আর-কিছু নয়, এই শ্রদ্ধা, যাতে নিখিলজীবন একসূত্রে বাঁধা পড়ে। অবনীন্দ্রনাথের নির্যাস এটি, তাঁর সমস্ত লেখার মজ্জাস্বরূপ ; এরই জন্য— হান্স আণ্ডেরসেনের মতোই— তিনি শিশু-পশুর গল্পের মধ্য দিয়ে শোনাতে পেরেছেন অমৃতবাণী ; সর্বজীবে দয়া, সর্বভূতে প্রেম, বিশ্বের সঙ্গে একাত্মবোধ।[১০]

ছয়

এমন মত পোষণ করা সম্ভব যে শিশুসাহিত্য স্বতন্ত্র কোনো পদার্থ নয়, কেন না তা সত্যিকার সাহিত্য হ'লে বড়োরাও তাতে আনন্দ পান, আর সাবালক— এমনকি আবহমান সাহিত্যের একটি অনতিক্ষুদ্র বিচিত্র অংশের ছোটোরাও উত্তরাধিকারী। যে-সব গ্রন্থ চিরকালের আনন্দভাণ্ডার, ছোটোদের প্রথম দাবি সেখানেই— সেই মহাভারত, রামায়ণ, বাইবেল, আরব্যোপন্যাস, বিশ্বের পুরাণ, বিশ্বের রূপকথা, আর সেই সঙ্গে আধুনিক কালের ভাস্বর চিত্রাবলি— ডন কিহোটে, রবিনসন ক্রুসো, গালিভার। শিশুসাহিত্যের বড়ো একটি অংশ জুড়ে এরাই আছে; এই অমর সাহিত্যের প্রবেশিকাপাঠ শিশুদের আদ্যকৃত্য। পক্ষান্তরে, মৌলিক শিশুগ্রন্থ তখনই উৎকৃষ্ট হয়, যখন তাতে সর্বজনীনতার স্বাদ থাকে। অতএব, অন্তত তর্কস্থলে, সাহিত্যে এই 'ছোটো-বড়ো' ভেদজ্ঞানকে অস্বীকার করা সম্ভব।

কিন্তু এই মত একটা জায়গায় টেঁকে না। যারা আক্ষরিক অর্থে শিশু, নেহাত বাচ্চা, এইমাত্র পড়তে শিখলো কিংবা এবারে পড়তে শিখবে, তাদের জন্যও বই চাই; আর সে-সব বইয়ে সাহিত্যকলার সাধারণ লক্ষণ আমরা খুঁজবো না, আলাদা ক'রেই তাদের দেখতে হবে। কত ভালো ক'রে কাজ চলবে, কত সহজে ক-খ শিখবে ছেলেরা, তাদের বিষয়ে জিজ্ঞাস্য শুধু এইটুকু; তার বেশি চাহিদাই নেই। কিন্তু এখানেও, আশ্চর্যের বিষয়, বাঙালীর মন সৃষ্টিশীলতার পরিচয় দিয়েছে; বাংলার মাটিতে এমন মানুষ একজন অন্তত জন্মেছেন, যিনি একান্তভাবে ছোটোদেরই লেখক —সেইসব ছোটোদের, যারা কেঁদে-কেঁদে পড়তে শিখে পরে হেসে-হেসে বই পড়ে। অবশ্য অশ্রুহীন বর্ণপরিচয় সম্ভব নয়; ঠিক অক্ষর চিনতে হ'লে— আজ পর্যন্ত— বিদ্যাসাগরই আমাদের অবলম্বন; কিন্তু তার পরে— এবং তার আগেও— মাতৃভাষার আনন্দরূপের পরিচয় নিয়ে প্রস্তুত আছেন যোগীন্দ্রনাথ সরকার। মুখে বোল ফোটার সঙ্গে-সঙ্গে বাঙালি ছেলে তাঁরই ছড়া আওড়ায়— সেই ধাবমান অজগর আর লোভনীয় আম্রফলের চিরনূতন নান্দীপাঠ— মায়ের পরেই তাঁর মুখে-মুখে কথা শেখে শিশুরা। যোগীন্দ্রনাথ, তাঁর হাসিখুশির দানসত্র নিয়ে, তাঁর উৎসর্গিত শুভ্র জীবনের রাশি-রাশি উপচার নিয়ে, আজকের দিনে একজন লেখকমাত্র নেই আর, হ'য়ে উঠেছেন বাংলাদেশের একটি প্রতিষ্ঠান, শিশুদের বিদ্যালয়। ঠিক তাঁর পাশে নাম করতে পারি এমন কোনো বিদেশী লেখকের সন্ধান আমি আজও পাইনি; 'হাসিখুশি'র সঙ্গে তুলনীয় কোনো ইংরেজি পুস্তক এখনো আমাকে আবিষ্কার করতে হবে। অনুরূপ গ্রন্থে ইংরেজি ভাষা কত সমৃদ্ধ সে-কথা আমি ভুলে যাচ্ছি না; সেই সাহিত্যের বৈচিত্র্য, উদ্ভাবনকৌশল আর দক্ষতাকে শ্রদ্ধাও করি; —কিন্তু শেষ পর্যন্ত দক্ষতাটাই অত্যধিক ব'লে মনে হয়, মনে হয় সে-সব বই মাপজোক নিয়ে নিখুঁতভাবে কলে-তৈরি জিনিশ, কিংবা লেখক-চিত্রক-মুদ্রকের সমবায়শ্রমের যোগফল। এইখানে যোগীন্দ্রনাথের জিৎ। তিনি প্ল্যান ক'রে বই লেখেন নি, প্রাণ থেকে লিখেছেন; তাঁর লেখা ঘনিষ্ঠভাবে তাঁরই, তাঁর হৃদয়ের স্পন্দনটি সেখানে

শ্নতে পাই— শিশ্র জন্য অনবরত খিল খুলে-রাখা দরাজ তাঁর হৃদয়। পুস্তক প'ড়ে শিশ্-মনস্তত্ত্ব জানতে হয় নি তাঁকে, শিক্ষাশাস্ত্রে অভিজ্ঞ হ'তে হয় নি : বিভিন্ন বয়সের শিশ্র মনের তারতম্য ঠিক কতটা, কিংবা সে-মনের উপর কোন বর্ণের কত মাত্রার প্রভাব কী-রকম, এ-সব বিষয়ে বৈজ্ঞানিক তথ্যে কিছুই তাঁর প্রয়োজন ছিলো না। শিশ্র মন সহজেই তিনি বুঝেছেন— তাঁর নাড়ির টান ছিলো ওদিকে, আর সেই সঙ্গে রুচি ছিলো নির্ভুল, রচনাশক্তি যথাযথ— যেটুকু হ'লে সংগত হয় সেইটুকুই, তার কমও না, বেশিও নয়। তাই তাঁর প্রতিটি বই ঠিক তা-ই অতিতরুণ পাঠমালার যা হওয়া উচিত— আগাগোড়া শৈশবের রসে সবুজ, একেবারে কিশলয়ের মতো কাঁচা— লেখায় যেটুকু কাঁচা ভাব আছে, অপটুতাও আছে, তাও তার স্বাদের একটি উপকরণ, ওর চেয়ে 'পাকা হাত' হ'লে সে-হাতে অমন তার উঠতো না। অপটুতা মানে অক্ষমতা নয়— এমন নয় যে কিছু-একটা ইচ্ছে ক'রে তিনি পেয়ে ওঠেন নি — তাকে বলতে পারি ঘরোয়া ভাব, সভাযোগ্য সৌষ্ঠবের বদলে গৃহকোণের অন্তরঙ্গতা যেন, আটপৌরে হবার সুখ, দুপুরবেলা মাদুর পেতে শ্য়ে মা যখন ছেলেকে ডাকেন, সেই অবসরের সতর্কতাহীন আরাম। যোগীন্দ্রনাথের রচনা একান্তভাবে অন্তঃপুরের ; —স্কুলের নয়, পাঁচজনকে ডেকে শোনাবার মতোও না, যেন মা-ছেলের বিশ্রম্ভালাপের ভাষা — ঠিক তেমনি স্নিগ্ধকোমল সহাস্য তাঁর গলার আওয়াজ। ঐ আওয়াজটিকে ফরমাশ দিয়ে পাওয়া যায় না ব'লেই যোগীন্দ্রনাথের জুড়ি হ'লো না ; তাই এই বিভাগে, পথিকৃৎ হ'য়েও এখনো তিনি সর্বোত্তম। 'হাসিখুশি'র প্রতিদ্বন্দ্বিতার উচ্চাশা নিয়ে অনেক বই উঠলো পড়লো ; তার সর্বাধুনিক প্রকরণটি বর্ণবিলাসে জাজ্বল্যমান। এই নব্য প্রকরণটি বিলেতি কিংবা মার্কিনি; প্রসাধনসিদ্ধ, নয়নরঞ্জন, কিন্তু এ-সব বই ছবিরই বই, অন্তত ছবিটাই এখানে মুখ্য, আর লেখা নামক গৌণ অংশটি নির্দোষ হ'লেও, দক্ষ হ'লেও, তাতে প্রাণের সাড়া পাওয়া যায় না, লেখকের সঙ্গে শিশুর মনের অব্যবহিত সম্বন্ধটি নেই তাতে। আর বইয়ের পাতায় ইন্দ্রধনুকে উজাড় ক'রে দিলেও এই অভাবের পূরণ হয় না।

অন্য দিক থেকেও তফাৎ আছে। পড়া-শেখা পুঁথির সবচেয়ে জরুরি গুণ এই যে তা বস্তু-ঘেঁষা হবে, যাকে বলে কংক্রীট। এইটেই সব বইয়ে পাওয়া যায় না। অনেক ক্ষেত্রে ছবিটা শুধু ছবিতেই থাকে, আর সেইজন্য পাঠযোগ্যতা ক্ষুণ্ণ হয়। যেটা পাঠ্য বই, তাতে ছবিটা থাকা চাই লেখাতেই, রংটা লাগানো চাই ক্ষুদ্র এবং খুব সম্ভব অনিচ্ছুক পাঠকের মনটিতেই। সেই সঙ্গে দ্রষ্টব্য ছবি— থাকা ভালো নিশ্চয়ই, কিন্তু সেটা অতিরঞ্জিত হ'লে তাতে উদ্দেশ্যের পরাভব ঘটে। যদি বলি 'লাল ফুল কালো মেঘ', সেটা তো নিজেই একটা ছবি হ'লো, মেঘলা দিনে মাঠের মধ্যে কোথাও একটি লাল ফুল ফুটে আছে এ-রকম একটা দৃশ্যেরও তাতে আভাস থাকে, কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে টকটকে লাল হুবহু একটি গোলাপফুল বসিয়ে দিলে তাতে চোখের সুখ কল্পনাকে বাধা দেয়। এখানে উদ্দেশ্য হ'লো— চোখ ভোলানো নয়, চোখ

ফোটানো, আর দেহের চোখ অত্যধিক আদর পেলে মনের চোখ কুঁড়ে হ'য়ে পড়ে, কল্পনা সবল হ'তে পারে না। মনে করা যাক 'জল পড়ে, পাতা নড়ে'— রবীন্দ্রনাথের সেই আদিশ্লোক, তাঁর জীবনের কবিতা পড়ার প্রথম রোমাঞ্চ যাতে পেয়েছিলেন তিনি— সেটি বটতলার ছাপাতে ছিলো ব'লে আনন্দে কোনো ব্যাঘাত ঘটে নি, বরং সেইজন্যই নিবিড় হয়েছে, অন্য কোনো উপকরণ ছিলো না ব'লেই বাণীচিত্র মূল্য পেয়েছে পুরোমাত্রায়। আমি অবশ্য নিশ্ছবিতার অনুমোদন করছি না ; আমার বক্তব্য শুধু এই যে লেখার মধ্যেই ছবির যেন ইঙ্গিত থাকে, আর আঁকা ছবি সেই ইঙ্গিতকে ছাপিয়ে উঠে নষ্ট ক'রে যেন না দেয়, কল্পনাকে উশকে দিয়েই থেমে থাকে।[১১] এখন যোগীন্দ্রনাথের লক্ষণ এই যে তাঁর লেখার মধ্যেই দৃশ্যতাগুণ ছড়িয়ে আছে : তাঁর বর্ণমালার উদাহরণে বিশেষ্য ছাড়া কিছু নেই, আর সেই বস্তুগুলিও অধিকাংশই সজীব, যথাসম্ভব পশুশালা থেকে গৃহীত— যেখানে শিশুর মন তৎক্ষণাৎ সাড়া দেয়— আর নয়তো শিশুজীবনের অন্তরঙ্গ পরিবেশ থেকে বাছাই-করা।

> কাকাতুয়ার মাথায় ঝুঁটি,
> খেঁকশিয়ালি পালায় ছুটি।
> গরু-বাছুর দাঁড়িয়ে আছে,
> ঘুঘুপাখি ডাকছে গাছে।

জীবজন্তুর মেলা ব'সে গেছে একেবারে, আবার মাঝে-মাঝে সুন্দর এক-একটি পারম্পর্য ধরা পড়ছে, যেমন ধোপার পরেই নাপিত, কণ্ঠকণ্ডূয়নী ওলের পরই ঔষধ, বা টিয়াপাখির লাল ঠোঁটের সঙ্গে ঠাকুরদাদার শীর্ণ গণ্ডের প্রতিতুলনা। বস্তুত, বর্ণমালার উদাহরণ-সংগ্রহে 'হাসিখুশি' এমনই অব্যর্থ যে ঐ একটি বিষয়ে বাংলা ভাষার উপাদান সেখানে নিঃশেষিত ব'লে মনে হয় ; পরবর্তীরা— আজকের দিন পর্যন্ত— লিখেছেন ওরই ছাঁচে, নতুনত্ব যা-কিছু শুধু চেহারায়। কিন্তু ঐ ছাঁচটা এমন যে ওর মধ্যে একাধিকের সম্ভাবনা নেই— নেই ব'লেই প্রমাণ হয়েছে ; যোগীন্দ্রনাথের একটি লাইনও 'আরো ভালো' করা যায় না ; আর দীর্ঘ ঈ-তে ঈগলের বদলে ঈশান, বা ঋ-তে ঋষির বদলে ঋষভ লিখলে রকমারি হয় বটে, কিন্তু ব্যঞ্জনা হয় না, ছবিটা মারা যায়। তাই পরবর্তী কারো লেখাতেই স্বাদ পাওয়া গেলো না ; 'হাসিখুশি' তার প্রসাদগুণে, প্রত্যক্ষতার গুণে, এমন জরাহীন জীবন্ত হ'য়ে থাকলো যে তার পরে অন্য ছাঁচের দ্বিতীয় একটি মৌলিক গ্রন্থ রচনার জন্য প্রয়োজন হ'লো আস্ত একজন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিভা।

শুভক্ষণে 'সহজ পাঠ' লেখায় হাত দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রচনাকালের দিক থেকে এটি 'সে', 'খাপছাড়া'রই সমসাময়িক, কিন্তু ও-দুটি গ্রন্থের আত্মসচেতন বৈদগ্ধ্যের কোনো চিহ্ন নেই এখানে ; পাঠ্যপুস্তক ব'লে এখানে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতিভাকে সীমার মধ্যে রেখেছিলেন, অথচ তার প্রয়োগে কোনো কার্পণ্য করেন নি। এর ফলে সর্বাঙ্গে সার্থক হয়েছে 'সহজ পাঠ'— বাংলা ভাষার রত্নস্বরূপ এই

গ্রন্থ, যেন প্রতিভার বেলাভূমিতে উৎক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র নিটোল স্বচ্ছ একটি মুক্তো। এর ছত্রে-ছত্রে প্রকাশ পেয়েছে চারিত্র, আর সেই সঙ্গে ব্যবহারযোগ্যতা, পরিশীলিত বিরল হাওয়ার মধ্যে নিকটতম তথ্যচেতনা, মহত্তম বাণীসিদ্ধির সরলতম উচ্চারণ। কী ছন্দোবদ্ধ ভাষা, কী কান্তি তার, কী-রকম চিত্ররূপের মালা গেঁথে-গেঁথে চলেছে, অথচ কঠিনভাবে প্রয়োজনের মধ্যে আবদ্ধ থেকে, শিশু-মনের গণ্ডি কখনো না-ভুলে, বর্ণশিক্ষার উদ্দেশ্যটিকে অক্ষরে-অক্ষরে মিটিয়ে দিয়ে। পদ্যছন্দের বৈচিত্র্য, মিলের অপূর্বতা, অনুপ্রাসের অনুরণন[১২]— সমস্তই এখানে এনেছেন রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু সমস্তই আঁটো মাপের শাসনের মধ্যে রেখেছেন, কোনোখানেই পাত্র ছাপিয়ে উপচে পড়ে নি। ভেবে দেখা যাক একেবারে প্রথম শ্লোকটি—

ছোটো খোকা বলে অ আ,
শেখে নি সে কথা কওয়া ॥

কেমন সহজ অথচ অবাক-করা মিল, আর এ-রকম শুধু একটিই নয়, এর পরেই মনে পড়ে 'শাল মুড়ি দিয়ে হ ক্ষ / কোণে ব'সে কাশে খক্ খ', আর— সবচেয়ে আশ্চর্য— সেই নরম, অনতিস্ফুট 'ঘন মেঘ ডাকে ঋ / দিন বড়ো বিশ্রী—' এই যেটা এখন মনে হয় 'ঋ'র সঙ্গে অনিবার্য এবং একমাত্র মিল, তার প্রতীক্ষায় কত কাল কাটাতে হ'লো বাংলা ভাষাকে। পদ্য ব্যবহারেও কারিগরি কিছু কম নেই— কোনো-কোনটি 'ছন্দ' বইয়ে নমুনাস্বরূপ উদ্ধৃত হ'তে পারতো—'আলো হয়, গেল ভয়'-এর ত্বরান্বিত বেগ 'কাল ছিল ডাল খালি'র দু-রকমের দোলা, 'আমাদের ছোটো নদী'তে দীর্ঘায়িত 'বৈশাখ' শব্দটির সুখস্পর্শ,

'গঞ্জের জমিদার সঞ্জয় সেন
দু-মুঠো অন্ন তারে দুই বেলা দেন।'

এই মাত্রিক পয়ারে পিংপং বলের মতো লাফিয়ে-ওঠা এক-একটি যুক্তবর্ণ। অথচ এর কিছুই অত্যন্ত বেশি স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে নি, সমস্তটাই মূল উদ্দেশ্যের অধীন হ'য়ে আছে, নম্র হ'য়ে শিশুশিক্ষার কর্তব্যটুকু সম্পন্ন ক'রে যাচ্ছে। এই সমন্বয়গুণ— এটি আরো বেশি বিস্ময় জাগায় গদ্যের অংশে— বিস্ময়ের চমক সেখানে নেই ব'লে, আপাতদৃষ্টিতে কারিগরিটা সেখানে অদৃশ্য ব'লে। কিছু নয়, ছোটো-ছোটো কয়েকটি কথা পাশাপাশি বসানো, পদ্যের ঢেউ নেই, একেবারে সমতল— হঠাৎ দেখলে মনে হ'তে পারে 'যে-কেউ' লিখতে পারতো, কিন্তু মনঃসংযোগ করা মাত্র ধারণা বদলে যায়। 'বনে থাকে বাঘ। গাছে থাকে পাখি। জলে থাকে মাছ। ডালে থাকে ফল।' আর তারপরে মাত্রা-বদলে-যাওয়া 'বাঘ আছে আম-বনে। গায়ে চাকা-চাকা দাগ। পাখি বনে গান গায়। মাছ জলে খেলা করে।'—এই গদ্য লেখার জন্য রবীন্দ্রনাথের সত্তর বছরের অভ্যস্ত হাতেরই প্রয়োজন ছিলো; এর আগে 'লিপিকা' যিনি লিখেছেন, এবং এর পরে 'পুনশ্চ' যিনি লিখবেন, তাঁরই হাত থেকে বেরোতে পারে— 'রাম বনে ফুল পাড়ে। গায়ে তার লাল শাল। হাতে তার সাজি। জবা ফুল তোলে। বেল ফুল তোলে। বেল ফুল সাদা। জবা ফুল লাল।' শুধু ছাপার অক্ষরে

চোখ বুলিয়ে আশ মেটে না এখানে ; এ-লেখা থেমে-থেমে, মনে-মনে পড়তে হয়, বলতে হয় গুনগুন ক'রে, এর সুন্দর সুনিয়ন্ত্রিত ছন্দটিকে মনের মধ্যে মুদ্রিত ক'রে নিতে হয়। আর এই ছন্দের ভিতরেই ছবির পর ছবি বেরিয়ে আসছে ; বাঘ, মাছ, পাখি, ফুলের বাগানে লাল শালের উজ্জ্বলতা, জবার পাশে বেলফুল। যে-বয়সে ক-খ চিনলেই যথেষ্ট সেই বয়সেই সাহিত্যরসে দীক্ষা দেয় 'সহজ পাঠ' ; এই একটি বইয়ের জন্য বাঙালি শিশুর ভাগ্যকে জগতের ঈর্ষাযোগ্য ব'লে মনে করি।

সাত

ছোটোরা কী চায়, কী পড়তে ভালোবাসে, আজ বাংলাদেশে তার সংখ্যাগণনা যদি করা হয়, তাহ'লে বিচিত্র রকমের ফল পাওয়া সম্ভব। হয়তো তাদের মোহন-তালিকা সীমিত হ'য়ে আছে ডট-ড্যাস-বিস্ময়চিহ্ন-বহুল দুই অর্থে বীভৎস হত্যা-কাহিনীতে ; কিংবা, দৈনিক পত্রের শিশু-বিভাগ এবং সাধারণভাবে শিশু-পত্রিকার সাক্ষ্য থেকে, হয়তো প্রমাণ হবে যে ছোটোরা বেজায় কাজের লোক হ'য়ে উঠেছে আজকাল, বড্ড হিশেবি, নেহাৎই শুধু গল্প-কবিতা প'ড়ে ঠ'কে যাবার পাত্রটি আর নেই ; 'দেশের উন্নতি', 'সমাজ-সংস্কার', এইরকম সব গুরুতর বিষয়ে ইস্কুলমাস্টারি এখন চায় তারা, আর সেই ভাতের বদলে পাথরকুচি গলাধঃকরণ করার জন্য তার সঙ্গে চায় মাছি-আটকানো চিটগুড়ের মতো বিশুদ্ধ ন্যাকামির পলেস্তারা। কিন্তু এ-রকম দুর্লক্ষণ— শুধু তো শিশুসাহিত্যে বা সাহিত্যে নয়— দেশের মধ্যে চারদিকেই উগ্র হ'য়ে উঠেছে : কী সংগীতে, কী সিনেমায়, কী-বা দোল-দুর্গোৎসবে অথবা পঁচিশে বৈশাখের পুতুল-পুজোয়, রুচিহীনতার বিষব্রণ আজ সর্বত্রই প্রকট। এই দৃশ্যে ভাবুক ব্যক্তির মন খারাপ হ'তে পারে, উদ্বেগের কারণ নেই তাও নয় ; পাছে, এই গণস্ফীতির কৃষ্ণপক্ষে, মন্দই প্রবল হ'য়ে উঠে ভালোকে ডুবিয়ে দেয়, এই আশঙ্কায় বিশ্বের সুধীচিত্ত আজ দোলুল্যমান। তবে আশার কথা এই যে সাহিত্য-ব্যাপারে সংখ্যা-গণনায় ঠিক ছবিটা পাওয়া যায় না ; কেননা, ঐকাহিকের আবেদন যেমন বিপুল, তেমনি মানুষের মনে অমৃতের তৃষ্ণাও দুর্বার, আর সেই তৃষ্ণার তৃপ্তি হ'য়ে, প্রতিভূ হ'য়ে, যুগে-যুগে শিল্পীরা আসেন জীবনধর্মেরই আপন নিয়মে, তার প্রেরণা কোনোকালেই রুদ্ধ হয় না। বিশেষত, বাংলা শিশুসাহিত্যের কৃতিত্ব এমন অসামান্য যে তার সাম্প্রতিক বিকৃতি সে-তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। এমনও বলা যায় যে আমাদের সমগ্র সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ অংশই শিশুসাহিত্য ; অন্ততপক্ষে এটুকু সত্য যে ছোটোদের ছোটো খিদের মাপে বাংলা ভাষায় সুপথ্য যত জমেছে, সে-তুলনায় সুপরিণত সবল মনের ভারি খোরাক এখনো তেমন জোটে নি। এর কারণ— কেউ হয়তো বাঁকা ঠোঁটে বলবেন— আমাদের জাতিগত ছেলেমানুষি এখনো ঘোচে নি ; কিন্তু আমি বলবো এই শৈশবসিদ্ধি শান্তশীল গৃহস্থ বাঙালির চিত্তবৃত্তিরই অন্যতম প্রকাশ। বাংলা শিশুসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য এই যে এই ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়েছে সারা দেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোনো-কোনো বুদ্ধি, মহত্তম কোনো-কোনো মন : যার আদি পুরুষ,

বিদ্যাসাগর, যাকে রবীন্দ্রনাথ নানা স্থলে স্পর্শ ক'রে গেছেন, যাতে আছেন অবনীন্দ্রনাথের মতো হৃদয়বান ও সুকুমার রায়ের মতো গুণী পুরুষ, তার দুটো-একটা রোগলক্ষণে ভীত হবার কারণ দেখি না, কেননা তার আপন ঐতিহ্যেই আরোগ্যশক্তি সঞ্চিত আছে।

১৯৫২ সাহিত্যচর্চা (ঈষৎ পরিমার্জিত)

সংস্কৃত কবিতা ও আধুনিক যুগ

সংস্কৃত কবিতার সঙ্গে আজকের দিনে আমাদের বিচ্ছেদ ঘটেছে। সেই বিচ্ছেদ দুস্তর না হোক, সুস্পষ্ট। আর তার কারণ শুধু এই নয় যে সংস্কৃত ব্যাকরণের চর্চা আমরা করি না। চর্চা করি না— এ-কথা সত্য কিনা তাও সন্দেহ করা যেতে পারে। ইংরেজ আমলে সংস্কৃত শিক্ষার মর্যাদাহ্রাস, আধুনিক যন্ত্রযুগে সংস্কৃত বিদ্যার আর্থিক মূল্যের অবনতি, কর্মক্ষেত্রে ও সামাজিক জীবনে সংস্কৃতের ক্ষীয়মাণ প্রয়োজন— এই সব নৈরাশ্যকর তথ্য সত্ত্বেও আমাদের মধ্যে অনেকেই সংস্কৃত ভাষার চর্চা ক'রে থাকেন ; যাঁরা নামত এবং প্রকৃতপক্ষে পণ্ডিত, তাঁদের সংখ্যাও খুব কম নয়। এমন নয় যে দেশসুদ্ধ সবাই সংস্কৃত ভুলে গেছে, স্কুলে-কলেজে তা পড়ানো হয় না, কিংবা আধুনিক বাংলার সঙ্গে সংস্কৃতের কোনো যোগ নেই। বরং, আধুনিক বাংলা ভাষায় দেশজ শব্দের বদলে তৎসম ও তৎভবের প্রচার বেড়েছে (তথাকথিত বীরবলী ভাষাও এর ব্যতিক্রম নয়), এবং রবীন্দ্রনাথ, যিনি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রতিষ্ঠাতা, তাঁর বিরাট মূলধনের বড়ো একটি অংশের নামও সংস্কৃত। অথচ, যাঁরা রবীন্দ্রনাথ পড়েন, তাঁদের মধ্যে হাজারে একজনও কোনো সংস্কৃত কাব্যের পাতা ওল্টান কিনা সন্দেহ। যে-সব শিক্ষাপ্রাপ্ত বা শিক্ষালাভেচ্ছু বাঙালি 'হ্যামলেট' প'ড়ে থাকেন, বা গ্যেটের 'ফাউস্ট', বা— এমনকি— 'ঈডিপস রেক্স' অথবা 'ইনফার্নো', তাঁদের মধ্যে ক-জন আছেন যাঁদের 'মেঘদূত' বা 'শকুন্তলা' পড়ার কৌতূহল জাগে, কিংবা যাঁরা ভাবেন যে সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে কিছু পরিচয় না-থাকলে তাঁদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হ'লো না? মানতেই হয়, তাদের সংখ্যা অকিঞ্চিৎকর।

এই অবস্থার জন্য আমাদের অত্যধিক পশ্চিমপ্রীতিকে দোষ দেয়া সহজ, কিন্তু পশ্চিমের প্রতি এই আসক্তি কেন ঘটলো তাও ভেবে দেখা দরকার। আমি এ-উত্তর দেবো না যে সৃষ্টিশীল জীবিত ভাষায় রচিত পশ্চিমী সাহিত্যের আকর্ষণ এত প্রবল যে তার প্রতিযোগে সংস্কৃত দাঁড়াতে পারে না। পশ্চিমের আকর্ষণ নিশ্চয়ই দুর্বার, কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যের কাছে আমাদের যা পাবার আছে তাও মূল্যবান, এবং কোথাও তা পাওয়া যাবে না। এ-কথা পৃথিবী ভ'রেই সত্য, কিন্তু বিশেষভাবে প্রয়োজ্য ভারতীয়ের পক্ষে ; যিনি কোনো ভারতীয় ভাষা বা সাহিত্যের চর্চা করেন তাঁর পক্ষে সংস্কৃতের অভাবের কোনো ক্ষতিপূরণ নেই। এই কথাটা তর্কস্থলে মেনে নেবার তেমন বাধা হয় না, কিন্তু কাজে খাটাতে গেলেই বিপদ বাধে। আসল কথা, আমরা সংস্কৃতের সম্মুখীন হ'লেই ঈষৎ অস্বস্তি বোধ করি, তার সাহিত্য বিষয়ে

উৎসাহ জেগে উঠলেও উপযোগী খাদ্য পাই না ; —যা পাই, তা শুধু তথ্য (তাও তর্কমুখর), নয়তো উচ্ছ্বাস, নয়তো হিন্দু-নামাঙ্কিত এক তুষারীভূত মনোভাব, যা কালের গতিকে অস্বীকার ক'রে নিজের মর্যাদায় স্থবির হ'য়ে আছে। সংস্কৃত সাহিত্যের, সাহিত্য হিশেবে, চর্চার পথ তৈরি হয় নি ; চলতে গেলেই হুঁচট খেতে হয় ইতিহাসে, ঘুরতে হয় দর্শনের গোলকধাঁধায় নয়তো ব্যাকরণের গর্তে প'ড়ে হাঁপাতে হয়। আসল কথা, আমাদের সমকালীন জীবনধারার সঙ্গে সংস্কৃত সাহিত্যের কোনো সত্যিকার সম্বন্ধ এখনো স্থাপিত হয় নি।

প্রাচীন ভারত এবং প্রাচীন গ্রীস ও রোম একই জগতের অন্তর্ভূত ছিলো, কিন্তু য়োরোপ ও ভারতের মানস-বাণিজ্যে সারা মধ্যযুগ ভ'রে যে-অবরোধ বিস্তার লাভ করে, তার অবসান ঘটলো বলতে গেলে মাত্র সেদিন, যখন বেঁনিয়ে উপনিষদ্-সমূহের একটি ফার্শি-অনুবাদ য়োরোপে নিয়ে যান। অনুবাদটির সম্পাদনা করেছিলেন শাজাহান-পুত্র দারা শুকো ; তা থেকে দ্যু পের্ঁ নামক আর-একজন ফরাশি লাটিন, গ্রীক আর ফার্শি মেশানো এক অদ্ভুত ভাষায় যে-অনুবাদ রচনা করেন, তারই সাহায্যে আধুনিক য়োরোপ প্রথম ভারতীয় চিত্তের সংস্পর্শ পায়। দ্যু পেরঁর অনুবাদের তারিখ ১৮০১ ; শোপেনহাওয়ার এই পুঁথি প'ড়েই বলেছিলেন যে উপনিষদ্ তাঁর 'জীবনব্যাপী সান্ত্বনা এবং মৃত্যুকালীন শান্তি'। কিন্তু তৎকালীন পাশ্চাত্ত্য সমাজে সংশয় জেগেছিলো, সংস্কৃত নামে কোনো ভাষা সত্যি আছে কিনা, না কি সেটা ব্রাহ্মণদের জালিয়াতি। ক্রমশ যখন প্রমাণ হ'লো যে সংস্কৃত ভাষার অস্তিত্ব আছে, এবং সে-ভাষায় একটি বিরাট সাহিত্যও বিদ্যমান, তখন সারা য়োরোপে— জর্মানি, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, ইংলণ্ড, ইটালিতে— দেখা দিতে লাগলেন প্রাচীতত্ত্বজ্ঞের দল, বহু পুস্তক প্রণীত হ'লো, বহু পুঁথি ছাপা হ'লো, এবং আমরা, য়োরোপের হাত থেকে, আমাদেরই সংস্কৃত বিদ্যা ফিরে পেলাম।

অর্থাৎ, আধুনিক ভারতের সংস্কৃত চর্চা একটি বিলেত-ফেরৎ সামগ্রী। ভারতের তুলো বা পাট নিয়ে গিয়ে শ্বেতাঙ্গরা যেমন বস্তুটিকে বিবিধ প্রস্তুত পণ্যের আকার ভারতের হাটেই প্রচার করেছে, তেমনি তাদের বুদ্ধির প্রক্রিয়ায় সংস্কৃত বিদ্যাও রূপান্তরিত হ'লো নানা রকম ব্যবহারযোগ্য বিজ্ঞানে। সংস্কৃত ভাষার আবিষ্কারের ফলে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের ভিত্তিস্থাপন করলেন পশ্চিমী পণ্ডিতেরা ; 'আর্য' বা 'ইন্দো-য়োরোপীয়' বংশাবলির সন্ধান পেয়ে ইতিহাসের মূল ধারণা বদলে দিলেন ; প্রত্নতত্ত্বের নতুন দ্বার খুলে গেলো, এবং ধর্মতত্ত্বে গবেষণার ক্ষেত্র তিব্বত, বর্মা, মহাচীন অতিক্রম ক'রে জাপানের দিগন্তসীমায় প্রসারিত হ'লো। এই আকারেই য়োরোপের হাতে সংস্কৃত বিদ্যা ফিরে পেয়েছি আমরা— ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব ধর্মতত্ত্বের আকারে ; এবং নিজেরা যেটুকু কাজ করতে সচেষ্ট হয়েছি তাও এইসব ক্ষেত্রে— ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব বা ধর্মতত্ত্বে।

এমন কেউ নেই, যিনি এ-সব বিষয়ে গবেষণা বা আলোচনার মূল্য স্বীকার না-করবেন। কিন্তু যে-কথাটা আমরা অনেক সময় ভুলে থাকি, এবং মাঝে-মাঝে

যা নিজেদের এবং অন্যদের স্মরণ করাবার প্রয়োজন হয়, তা এই যে এ-সব বিষয় সাহিত্য নয়, এবং সাহিত্যের আত্মা বিষয়ে উদাস বা নিঃসাড় হ'য়েও এ-সব ক্ষেত্রে কৃতী হওয়া যায়। বস্তুত, সংস্কৃত বিষয়ে য়োরোপীয় ভাষায় গ্রন্থের সংখ্যা যেমন বিপুল, ঠিক তেমনি বিরল তার মধ্যে কোনো সপ্রাণ সাহিত্যিক মন্তব্য, কবিতা বিষয়ে কোনো অন্তর্দৃষ্টি, বিশ্বসাহিত্যের পটভূমিকায় সংস্কৃতের কোনো মূল্যায়নের প্রয়াস : গ্যেটের শকুন্তলা-প্রশস্তি, এমার্সনের 'ব্রহ্ম', হুইটম্যানের 'প্যাসেজ টু ইণ্ডিয়া', এলিয়টের 'দি ওয়েইস্ট ল্যাণ্ড'[১]— এগুলো বিক্ষিপ্ত ও আকস্মিক উদাহরণমাত্র : সমগ্রভাবে এই কথাই সত্য যে সংস্কৃত ভাষার রচনাবলির মধ্যে শ্বেতাঙ্গরা দেখেছেন - গ্রীক বা লাটিনের মতো কোনো সাহিত্য নয়, রসসৃষ্টি নয়, সৃষ্টিকর্ম নয়— দেখেছেন ইতিহাস ইত্যাদির উপাদান, আর ভারতীয় মনের পরিচয় পেয়ে ভারতবাসীকে বশীভূত রাখার একটি সম্ভাব্য উপায়। শেষের কথাটা, বলা বাহুল্য, ইংরেজ বিষয়ে বিশেষভাবে প্রয়োজ্য। স্বনামধন্য উইলসন 'মেঘদূত'-এর ইংরেজি অনুবাদ করে-ছিলেন ; সেই অনুবাদ বিষয়ে কিছু না-বলাই ভালো, কিন্তু তাঁর সুখপাঠ্য টীকা প'ড়ে বোঝা যায়, তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো ভারতের ভূগোল, জলবায়ু, পশুপাখি ও উদ্ভিদ বিষয়ে জ্ঞানদান, এবং এ-বিষয়ে তাঁর স্বদেশবাসীকে অবহিত করা যে ভারতীয় মানুষ বর্বর নয়, এমনকি কৃতজ্ঞতার অর্থ বোঝে ('ন ক্ষুদ্রোঽপি প্রথম-সুকৃতাপেক্ষয়া সংশ্রয়ায় / প্রাপ্তে মিত্রে ভবতি বিমুখঃ কিং পুনর্যস্তথোচ্চৈঃ ॥')। অক্সফোর্ডের বডেন-অধ্যাপকের পদ যাঁর দানের ফলে সম্ভব হয়, সেই লেফটেনান্ট-কর্নেল বডেন স্পষ্ট জানিয়েছিলেন যে এই পদস্থাপনে তাঁর লক্ষ্য সংস্কৃত ভাষায় বাইবেল-অনুবাদের উন্নয়ন, 'যাতে তাঁর স্বদেশীয়রা ভারতবাসীকে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করাবার কর্মে অগ্রসর হ'তে পারে।' এই পদের প্রথম দুই অধিকারী প্রতিষ্ঠাতার উদ্দেশ্য বিষয়ে সচেতন ও সশ্রদ্ধ ছিলেন : উইলসন-এর নিয়োগের সপক্ষে প্রধান অনুমোদন ছিলো বাইবেলের কতিপয় শব্দের উৎকৃত সংস্কৃত অনুবাদ ; এবং মনিয়র-উইলিয়মস তাঁর বৃহৎ ও মহৎ অভিধানের ভূমিকায় জানাতে ভোলেন নি যে তাঁর গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ থেকে বাইবেলের জনৈক অনুবাদক প্রচুর সাহায্য পান। অবশ্য খৃষ্টধর্মের প্রচার বিষয়ে সব লেখক সরব নন, কিন্তু ভারতীয় বিষয় নিয়ে এমন কোনো ইংরেজ মাথা খাটান নি— হোক তা ভূতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, স্থাপত্য, কৃষি বা ব্যাকরণ— যিনি মনে-মনে না-জানতেন যে তাঁর কর্ম সাম্রাজ্য-রক্ষা ও বিস্তারের অঙ্গবিশেষ। 'শ্বেতাঙ্গের বোঝা' বলতে উনিশ শতকে যা বোঝাতো, সেই বিরাট দায়িত্বের মধ্যে সংস্কৃত চর্চাও গ্রথিত ছিলো। এ-কথা ব'লে পথিকৃৎ ইংরেজ লেখকদের সাধুতায় আমি সন্দেহপাত করছি না— সাম্রাজ্যশাসন ও সাধুতায় কোনো বিরোধ ছিলো না তাঁদের মনে— এবং তাঁদের কাছে সারা ভারতের ঋণ কত গভীর সে-বিষয়েও আমি সম্পূর্ণরূপে সচেতন। আমি শুধু তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্য বোঝাতে চাচ্ছি। রেনেসাঁসের সময় গ্রীসের অভিঘাত য়োরোপীয় চিত্তের যে বৃত্তি জেগে উঠলো তার নাম সৌন্দর্যবোধ, ঐতিহাসিক ও অন্যান্য গবেষণাকে তার শাখা-প্রশাখা বললে

ভুল হয় না। কিন্তু ভারতের আবিষ্কার বা পুনরাবিষ্কার ঘটলো একটি বৃহৎ সাম্রাজ্যের ভিত্তিস্থাপনের প্রাক্কালে, সেইজন্য প্রথম থেকেই মনোযোগ পড়লো তথ্যের দিকে, রসের দিকে নয়, বিশ্লেষধর্মী বিজ্ঞানের দিকে, সংশ্লেষধর্মী উপলব্ধির দিকে নয়। সারা য়োরোপের প্রাচ্যবিদ্যার এ-ই হ'লো সামান্য লক্ষণ। সেইজন্য, সাহিত্য যেখানে কেবল সাহিত্য, সেই ক্ষেত্রে য়োরোপীয় ভারতজ্ঞের কাছে, আমাদের কিছু শেখবার নেই। এই একটা দিকে, আমাদের মনকে তাঁরা জাগাতে পারেন নি ; আর দুঃখের বিষয় আমাদের উনিশ-শতকী জাগরণও এ-বিষয়ে নিষ্ফল হয়েছে।[২]

ইংরেজি ভাষার যে-সব গ্রন্থ নামত সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, সকলেই জানেন তাদের মধ্যে ইতিহাসের অংশই মুখ্য, সাহিত্য সেই সম্ভার সাজাবার উপলক্ষ মাত্র। পুস্তকের বড়ো অংশ ব্যয় হচ্ছে কালনির্ণয়ে ও তথ্যবিচারে, তারপরে আছে গ্রন্থাদির তালিকা ও চুম্বক। সমালোচনা বা গুণগ্রহণের চেষ্টা বা ইচ্ছা নেই তা নয়, কিন্তু প্রায়শই তা ভীরু ও অর্ধমনস্ক, লেখক নিজেই তাঁর কথায় বিশ্বাসী কিনা সে-বিষয়ে পাঠকের সন্দেহ থেকে যায়। যেখানে হয়তো নিন্দা তাঁর মনোগত ভাব, সেখানে তিনি শিষ্টতার আড়ালে আত্মগোপন করেন ; আর তাঁর প্রশংসার মধ্যেও সে-ধরনের উৎসাহ খুঁজে পাওয়া যায় না, যাতে আলোচ্য কবি বা কবিতার কোনো নতুন অর্থ ধরা পড়ে। ফলত, পুরো ব্যাপারটা এক মৃদু, মোলায়েম ও পাণ্ডুবর্ণ বিবরণের আকার নেয়, যা পাঠ ক'রে কবির আনুমানিক কাল, কাব্যের বিষয়বস্তু ও প্রকরণ ও অন্যান্য সম্পৃক্ত তথ্য আমরা জানতে পারি, কিন্তু কাব্যটি কেমন, ভালো যদি হয় তো কোন ধরনের ভালো, বিদেশী কাব্যের এবং আধুনিক পাঠকের সঙ্গে সেটি কোন রকমের সম্বন্ধ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে— এইসব জরুরি বিষয়ে কিছুই জানতে পারি না। উইলসন তাঁর 'মেঘদূত'-এর টীকায় পশ্চিমী কাব্য থেকে বহু সদৃশ অংশ তুলে দিয়েছেন ; কিন্তু পরস্পরের সান্নিধ্যে এসে অংশগুলি জ্ব'লে ওঠে নি, কোনো ভাবনার প্রভাবে পরস্পরে প্রবিষ্ট হয় নি, জড় বস্তুর মতো শুধু পাশাপাশি প'ড়ে আছে। 'পরস্পরে প্রবিষ্ট' বলতে কী বোঝায়, তার উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় এলিয়টের কবিতা ও প্রবন্ধ, বা আঁদ্রে মালরো-র শিল্পবিষয়ক রচনাবলি, যেখানে দেশকালের দূরত্ব-দ্বারা আপাতবিচ্ছিন্ন ছবি বা কবিতা উদ্দেশ্যময় প্রতিবেশিতার ফলে একই বিশ্ব-ভাবনার অঙ্গ হ'য়ে পরস্পরকে বর্ধিত ও রঞ্জিত করে। এই সংশ্লেষ ঘটাবার জন্য কিছুটা কল্পনাশক্তিরও প্রয়োজন, এবং পণ্ডিতের কাছেও সেটাই আমাদের প্রত্যাশা। কিন্তু য়োরোপীয় প্রাচীতত্ত্বজ্ঞেরা সাধারণত এই গুণে বঞ্চিত, এবং আমরা সম্প্রতি তাঁদেরই কাছে সংস্কৃত শিখেছি। ফলত, স্বদেশীয়দের রচনাও একই পথ নিয়েছে ; এ-দেশেও সংস্কৃত বিদ্যার অর্থ দাঁড়িয়েছে সাল-তারিখ নিয়ে সংগ্রাম, তথ্যের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচনা, এবং বিবরণ। আমরা যারা সাধারণ পাঠক তাদের প্রায় ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে যে সংস্কৃত 'মৃত' ভাষা হ'লেও তার সাহিত্য জীবন্ত ; প্রায় বিশ্বাস করানো হয়েছে যে গ্রীক, চীন, লাটিন, এবং সব দেশের আধুনিক সাহিত্যে যে-সহজ প্রাণস্পন্দন আমরা অনুভব করি, তা থেকে বঞ্চিত শুধু সংস্কৃত,

পৃথিবীর মধ্যে শুধু সংস্কৃতই এক বিশাল ও শ্রদ্ধেয় শবে পরিণত হয়েছে, ব্যবচ্ছেদের প্রকরণ না-শিখে যার সম্মুখীন হওয়া যাবে না। আমাদের সঙ্গে সংস্কৃত কবিতার যে-বিচ্ছেদ ঘটেছে এই তার অন্যতর কারণ।

দুই

দ্বিতীয় কারণ— সংস্কৃত ভাষার ও ব্যাকরণের দু-একটি বৈশিষ্ট্য।

সংস্কৃতে শব্দসংখ্যা বিপুল, প্রতিশব্দ অসংখ্য। তার কিছু অংশ বাংলাতেও চ'লে এসেছে : আমরা যারা সংস্কৃতে শিক্ষিত নই আমরাও খুব সহজে যে-কোনো বহুব্যবহৃত বিশেষ্যপদের একাধিক নামান্তর ভাবতে পারি : গৃহ, ভবন, সদন, নিকেতন ; তরু, বৃক্ষ, দ্রুম, পাদপ — এমনি সব ক্ষেত্রেই। কিন্তু বাংলার সঙ্গে— বা যে-কোনো জীবিত ভাষার সঙ্গে— সংস্কৃতের একটি ব্যবহারগত মৌল প্রভেদ দাঁড়িয়ে গেছে। বাংলায় আমরা 'প্রিয়ার ভবন', 'রাজভবন' বা 'মহাজাতি-সদন' বলবো, কিন্তু 'যদু ঘোষের সদন' বা 'ভবন' বলবো না, 'যদু ঘোষের গৃহ' বললেও বেসুরো ঠেকতে পারে। অর্থাৎ, 'ভবন', 'সদন' বা 'নিকেতন' শব্দকে আমরা দৈনন্দিন ব্যবহার থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছি, তার সঙ্গে প্রেমের' সম্মানের বা প্রাতিষ্ঠানিক একটি ইঙ্গিত জড়িত হয়েছে। তেমনি, 'বটবৃক্ষ,' 'তরুলতা', 'পান্থপাদপ', 'বোধিদ্রুম'— এই প্রয়োগসমূহে শব্দগুলোর অর্থ ঠিক এক থাকছে না, আকারে প্রকারে গাছেদের মধ্যে প্রভেদ বুঝিয়ে দিচ্ছে। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর গদ্যে যখন লেখেন, 'বৃক্ষটি দাঁড়িয়ে আছেন,' তখন এই শ্রদ্ধার ভঙ্গিতে গাছের বৃক্ষত্ব আমাদের মনে স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। পক্ষান্তরে, সংস্কৃতে প্রতিশব্দসমূহ বিনিময়ধর্মী, তাদের মধ্যে অনায়াসে অদলবদল চলে, তাদের সংখ্যা-বৃদ্ধির সম্ভাবনাও প্রায় অফুরন্ত। এবং এই প্রতিশব্দপ্রয়োগ সংস্কৃত কবিতার প্রকরণের একটি প্রধান নির্ভর ; এমন পুঁথিও পাওয়া গেছে যা প্রতিশব্দের তালিকা, যা থেকে লেখকরা, ছন্দের প্রয়োজন বুঝে, যথোচিত মাত্রাযুক্ত শব্দ বেছে নিতে পারেন। এ ধরনের কোনো পুঁথি কালিদাসের হাতের কাছে ছিলো কিনা জানা যায় না তবে সহজ বুদ্ধিতেই বোঝা যায় যে বহু প্রতিশব্দ ব্যবহার না-ক'রে সংস্কৃত ছন্দ রচনা অসম্ভব। অথচ প্রত্যেক আধুনিক ভাষা উত্তরোত্তর প্রতিশব্দ বর্জন ক'রে চলেছে— তাদের ধর্মই তা-ই ; এবং এ-কাজে যে-ভাষা যত বেশি অগ্রসর তাকেই আমরা তত বেশি পরিণত বলি, তত বেশি সাহিত্যের পক্ষে উপযোগী।

একটা উদাহরণ নেয়া যাক। স্ত্রীজাতি— যাকে সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যের প্রধান উপাদান বললে ভুল হয় না— তার কতিপয় প্রতিশব্দের সংজ্ঞার্থ মনিয়র-উইলিয়মস-এর অভিধান থেকে উদ্ধৃত করি :

নারী : a woman, a wife, a female or any object regarded as feminine.

স্ত্রী : 'bearer of children', a woman, female, wife, the female of any animal.

রমণী : a beautiful young woman, mistress.

ললনা : (লল=ক্রীড়াশীল) a wanton woman, any woman, wife.

অঙ্গনা : a woman with well-rounded limbs, any woman or female.

কামিনী : a loving or affectionate woman ; a timid woman, a woman in general.

বনিতা : (বনিত=প্রার্থিত, ঈপ্সিত, প্রণয়যোগ্য) a loved wife, mistress, any woman (also applied to the female of an animal or bird.)

বধূ : a bride or newly-married woman, young wife, spouse, any wife or woman, a daughter-in-law, any young female relation : the female of any animal, (esp.) a cow or mare.

মহিলা : a woman, female, a woman literally or figuratively intoxicated.

যোষিৎ (যোষণা) : a girl, maiden, young woman, wife (also applied to the females of animals and to inanimate things)

দেখা যাচ্ছে, 'নারী' ও 'স্ত্রী' সাধারণ শব্দ, সমগ্র স্ত্রীজাতির পক্ষে প্রয়োজ্য, কিন্তু অন্য প্রত্যেকটির অভিপ্রায় ছিলো স্ত্রীজাতির মধ্যে বয়স, রূপ বা স্বভাবের প্রভেদ বোঝানো। অথচ একই সঙ্গে প্রত্যেকটি একটি সাধারণ অর্থও উল্লিখিত হয়েছে-- পশু-পাখির ও জড়ের স্ত্রীজাতিও বাদ পড়ে নি— এবং সংস্কৃত সাহিত্যে যা গৃহীত হয়েছে তা এই শব্দসমূহের বিশেষ-বিশেষ অর্থ নয়, অর্থের অতিব্যাপ্তি। কিংবা -- এটাই বেশি সম্ভব ব'লে মনে হয়— কবিদের ব্যবহার থেকেই অভিধানকার সংজ্ঞার্থ নির্মাণ করেছেন ('যোষিৎ'-এ কুমারী ও সধবা দু-ই বোঝাচ্ছে)। অর্থাৎ এই শব্দগুলোর মূল অর্থ উপেক্ষা ক'রে কবিরা তাদের নির্বিশেষে ব্যবহার করেছেন, ভিন্ন-ভিন্ন ধারণাকে মিশিয়ে দিয়েছেন নিরভিজ্ঞান সাধারণের মধ্যে। কালিদাস যখন বলেন—

গচ্ছন্তীনাং রমণবসতিং যোষিতাং তত্র নক্তং

আর যখন বলেন—

সীমন্তে চ ত্বদুপগমজং যত্র নীপং বধূনাম্

আর—

স্ত্রীণামাদ্যং প্রণয়বচনং বিভ্রমো হি প্রিয়েষু

আর—

নৈশো মার্গঃ সবিতুরুদয়ে সূচ্যতে কামিনীনাম্

আর—

লক্ষ্মীং পশ্যন্ ললিতবনিতাপাদরাগাঙ্কিতেষু

তখন 'স্ত্রী', 'বধূ', 'কামিনী, 'যোষিৎ' ও 'বনিতা'য় বিন্দুমাত্র অর্থভেদ সূচিত হয় না ; বিবাহিত কি কুমারী, গৃহস্থ কি গণিকা, তরুণী কি প্রৌঢ়া— কোনো দিকেই কোনো ইঙ্গিত নেই, প্রতি ক্ষেত্রে শুধু নিছক নারীকেই বোঝাচ্ছে। কিন্তু বাংলায় 'বধূ' বলতে নববধূ বা পুত্রবধূকেই বোঝায়, 'স্ত্রী' বলতে বিবাহিত পত্নী— আর 'রমণী' বা 'কামিনী' শব্দ আমরা ব্যবহারই করবো না, যদি না রূপের রমণীয়তা বা কামের প্রবণতা বোঝাতে চাই। একজন জীবনানন্দ দাশ যখন লেখেন—

তোমার মতন এক মহিলার কাছে
যুগের সঞ্চিত পণ্যে লীন হ'তে গিয়ে
অগ্নিপরিধির মাঝে সহসা দাঁড়িয়ে
শুনেছি কিন্নরকণ্ঠ দেবদারু গাছে,
দেখেছি অমৃতসূর্য আছে।

তখন 'মহিলা' শব্দ 'নারী'র নামান্তরমাত্র থাকে না, তাতে সমকালীন বিভাব জেগে ওঠে, আমরা অনুভব করি এই শ্লোকের উদ্দিষ্টা সেই আধুনিকাদের একজন, বক্তারা যাঁদের 'ভদ্রমহিলাগণ' ব'লে সম্বোধন ক'রে থাকেন। আমাদের মনে এই মহিলার স্পষ্ট ছবি জেগে ওঠে : তিনি অত্যন্ত তরুণী নন, আমাদেরই মতো নগরে বাস করেন, এবং এই শব্দের প্রয়োগে 'কিন্নরকণ্ঠ' ও 'অমৃতসূর্যে'র সঙ্গে আধুনিক যুগের প্রতিতুলনার বেদনাও প্রতিভাত হয়। এক-একটি শব্দের এই বিশেষ অভিঘাত, আমরা যাকে কবিতার প্রাণ ব'লে ধারণা করি তা সংস্কৃতে সম্ভব হয় না। সেখানে, কোনো-একটি ধারণার জন্য, একের বদলে অন্য শব্দের ব্যবহার হয় শুধু ছন্দের তাগিদে, সন্ধি-সমাসের প্রয়োজনে, বা ধ্বনিমাধুর্য বৃদ্ধি পাবে ব'লে। কোনো শব্দই অসংগত নয়, কোনো শব্দই অনিবার্য বা অনন্য নয়।

তাছাড়া, বিশেষণকে বিশেষ্যে পরিণত করবার যে-ক্ষমতা সংস্কৃত ব্যাকরণের আছে, তার ফলে— আমি যাকে অর্থের অতিব্যাপ্তি বলছি, তার প্রায় সীমা থাকে না। উপরোক্ত শব্দসমূহ কবির পক্ষে যখন যথেষ্ট হয় না, তখন আছে বিবিধ বর্ণনামূলক শব্দরাজি : বিম্বাধরা, নিতম্বিনী, ভামিনী, মানিনী— এই তালিকা ইচ্ছে-মতো বাড়িয়ে যাওয়া যেতে পারে। অধরের বর্ণ, নিতম্বের গুরুত্ব, কোপ অথবা অভিমানের অনুষঙ্গ থেকে চ্যুত হ'য়ে এরাও পরিণত বা অবনত হ'তে পারে শুধুই 'নারী'তে— এমনকি 'মৃগাক্ষী', 'চারুহাসিনী' বা 'ক্ষীণমধ্যমা'র পক্ষেও তা অসম্ভব নয়। সংস্কৃতে 'জলে'র যত প্রতিশব্দ আছে, যে-কোনোটির সঙ্গে-'দ', -'ধর', '-বাহ' যোগ করলে তার অর্থ দাঁড়াবে 'মেঘ'। ভাষার এই রকম স্বাধীনতা থাকলে শব্দের

প্রাণশক্তি হ্রাস পেতে বাধ্য।

আমি ভুলে যাচ্ছি না যে প্রত্যেক শব্দেরই উৎপত্তিস্থল বর্ণনা ; আমি বলতে চাচ্ছি, শব্দ যখন বর্ণনার স্মৃতি হারিয়ে ফেলে তখন তার বিকল্পের অভাবেই ভাষার পরিণতি সূচিত হয়। 'স্তন' শব্দের অর্থ— যে শব্দ করে (অর্থাৎ জানিয়ে দেয় যৌবন আগত), এ-কথা আভিধানিক ছাড়া আর কেউ না-জানলেও ক্ষতি নেই, বস্তুবিশেষের নাম হিশেবেই তা আমাদের কাছে গ্রাহ্য ; এবং এই নামের মধ্যে একটা ছবিও বিধৃত হ'য়ে আছে, যা তার উচ্চারণের সঙ্গে-সঙ্গেই আমাদের মনে ভেসে ওঠে। কিন্তু এই ছবিটা স্পষ্ট হবার জন্যই এটা দরকার যে প্রত্যেকটি নাম-শব্দ একটিমাত্র উল্লেখের মধ্যে সীমিত থাকবে। 'বহ্নি' শব্দের আদি অর্থ বাহক (যে যজ্ঞের হবি দেবতাদের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়) ; সেই অর্থ আমরা ভুলেছি ব'লেই এই যজ্ঞহীন যুগেও তাতে আগুন বোঝায়, নয়তো বাতাস, মেঘ বা নদীও বোঝাতে পারতো— কেননা তারাও বাহকের কাজ করে। 'জল' শব্দের একটি সংজ্ঞার্থ মনিয়র-উইলিয়মস-এর মতে 'any liquid', কিন্তু যদি তা দুধ, মদ বা রক্তের বদলেও ব্যবহৃত হ'তো, তাহ'লে তার ব্যবহারই এতদিনে আর থাকতো না। লক্ষ করলে দেখা যাবে, সেই-সব সংস্কৃত শব্দকেই আধুনিক ব্যবহারের পক্ষে সবচেয়ে অনুপযোগী মনে হয়, যারা একাধিক অসম্পৃক্ত অর্থের লোভ ছাড়তে পারে নি। 'পয়োধর' মানে মেঘ বা নারীর স্তন হ'তে পারে ; এতে বোঝা যায় তা সম্পূর্ণ নাম-শব্দ হ'য়ে উঠতে পারে নি, বৈশেষণিক পরাধীনতায় কুণ্ঠিত হ'য়ে আছে। 'রত্নাকর'-এর চলিত অর্থ, সমুদ্র, কিন্তু লিঙ্গভেদহীন বাংলা ভাষায় পৃথিবীকেও রত্নাকর বলা সম্ভব, আর সেইজন্যই আধুনিক কবি শব্দটিকেই বর্জন ক'রে চলেন। 'বিম্বাধরা', নিতম্বিনী', 'ভামিনী' ইত্যাদিতেও সেই আপত্তি : তারা কোনো বস্তুর নাম নয়, বর্ণনা মাত্র। যেখানে একই অর্থ বহন ক'রে বহু প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে শব্দের বর্ণনার অংশ ভোলা যায় না। আর সংস্কৃতে নিত্য ঠিক তা-ই ঘ'টে থাকে ; 'নৃপ', 'ভূপ' 'ক্ষিতীশ', 'পৃথ্বীশ' প্রভৃতি শব্দের সংখ্যা এত বেশি যে তার কোনোটিকেই 'মানুষ' বা 'পৃথিবী' থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখা যায় না (যদিও সে-ভাবে দেখানোই কবিদের উদ্দেশ্য), আর তা যায় না ব'লেই সেগুলোকে সন্দেহ হয় স্তুতিবাক্য ব'লে, রাজার রাজকীয় চিত্ররূপ— অন্তত আমাদের মনে - প্রকাশ পায় একমাত্র 'রাজা' শব্দে। 'রাজপথ' বলামাত্র আমরা চৌরঙ্গির মতো কোনো বড়ো রাস্তার ছবি দেখতে পাই, তার সঙ্গে 'রাজা'র সম্বন্ধ সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হয়েছে, তার কোনো প্রতিশব্দ আমাদের পক্ষে অচিন্তনীয়। কিন্তু কালিদাস অনায়াসে 'নরপতিপথ' লিখতে পেরেছেন ; তাঁর অনুকরণে আজকের দিনের কোনো বাঙালি কবি যদি 'মহীপালপথ' বা 'ভূপতিপথ' লেখেন, আমরা চেষ্টা ক'রে তার অর্থ করবো 'যে পথে রাজা যাতায়াত করেন'। সন্দেহ নেই, সংস্কৃতে অনেক সময় শব্দসংখ্যা বেড়েছে অর্থের নতুনতর দ্যোতনার জন্য নয়, নেহাৎই বৈচিত্র্যের খাতিরে। এবং যে-শব্দ শুধুই বৈচিত্র্য দেয়, তা কবিতায় কিছু দিতে পারে না। সংস্কৃত ভাষাকে, তার বিপুল শক্তির জন্য, এই এক খেদজনক মূল্য দিতে

হয়েছে।

শুধু প্রতিশব্দের স্তূপীকরণদ্বারা সংস্কৃত মাঝে-মাঝে যে সম্মোহন সৃষ্টি করতে পারে, তার মূল্য অস্বীকার করা আমার উদ্দেশ্য নয়। মহাভারতের দ্রৌপদী যখন অর্জুনকে একই উক্তির মধ্যে কখনো 'পার্থ', কখনো 'কৌন্তেয়', কখনো 'গাণ্ডীবধন্বা' ব'লে সম্বোধন করেন, বা কোনো কামাতুর মুনি কোনো মানবী বা অপ্সরাকে আহ্বান করেন একবার 'মদিরেক্ষণা', একবার 'পদ্মগন্ধা', আর তার পরেই 'পীনস্তনী' ব'লে, সেই শব্দযোজনা আমরা মুগ্ধের মতো শুনতে বাধ্য। কিন্তু লক্ষণীয়, এগুলো সত্যিকার প্রতিশব্দ নয়, শুধু বৈচিত্র্যের জন্য বসানো হয় নি, প্রত্যেকটি নাম বা বিশেষণ বক্তার আবেগসঞ্চারে আন্দোলিত। উত্তরমেঘে এর একটি সুন্দর উদাহরণ আছে মেঘের মুখে যক্ষ তার প্রিয়াকে যে-বার্তা পাঠাচ্ছে, তার মধ্যে সম্বোধনরূপে যথাক্রমে ব্যবহৃত হয়েছে 'অবলা', 'চণ্ডী', 'গুণবতী', 'চটুলনয়না', 'কল্যাণী' ও 'অসিতনয়না'। এর মধ্যে 'চটুলনয়না' ও 'অসিতনয়না'কে আভরণমাত্র মনে হ'তে পারে, কিন্তু অন্য তিনটি যক্ষের আবেগস্পন্দনে বিশেষ অর্থ পেয়েছে। এই ধরনের ব্যবহার এখানে আমার আলোচনার লক্ষ্য নয়, আমি সংস্কৃত ভাষার সাধারণ প্রকৃতি সম্বন্ধে মন্তব্য করছি। আধুনিক ভাষা এক-একটি শব্দের প্রতিশব্দ বা প্রতিদ্বন্দ্বী সরিয়ে দিয়ে-দিয়ে প্রত্যেকটি শব্দের শক্তির সম্ভাবনা বাড়িয়েছে ; আধুনিক কবির কাছে শব্দগুলো নিরপেক্ষ ও বর্ণহীন বস্তু, বা শূন্য ও ঈষদচ্ছ ছোটো-ছোটো আধার, যাকে তিনি ভ'রে তুলবেন, তাঁর ভিন্ন-ভিন্ন উদ্দেশ্য অনুসারে, তাঁরই ভিন্ন-ভিন্ন বিশেষ অর্থে, বিশেষ ব্যঞ্জনায়। শব্দ নিজেই তার নিজের বিষয়ে কোনো খবর দেবে, তা তিনি চান না। তিনি চান শব্দ হবে উপায়, কিন্তু বার্তা তাঁর নিজের। 'মেঘে'র বদলে 'জলদ' বা 'অম্বুবাহ' লিখলে, তাঁর মতে, কবিতার বেগটাকে শ্লথ ক'রে দেয়া হয়, কেন না মেঘের যে-সজলতা তাঁর রচনারই মধ্যে মূর্ত হবার কথা, ঐ শব্দ সেটাকে আগেই ফাঁশ ক'রে দিচ্ছে। 'জলে'র নামান্তররূপে 'বারি', 'নীর', 'অম্বু' প্রভৃতি গ্রহণ ক'রে তিনি প্রত্যক্ষতার ক্ষতি করতে চান না ; তিনি চান, সব সময় শুধু 'জল'ই ব্যবহার করবেন, আর তারই মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলবেন অভিজ্ঞতার ভিন্ন-ভিন্ন সুর— প্রলয়ের কল্লোল থেকে অশ্রুবিন্দু পর্যন্ত বাদ যাবে না। এক-একটি শব্দ থেকে কত বেশি কাজ আদায় ক'রে নেয়া যায়, আধুনিক কবির লক্ষ্য সেই দিকে ; আর সংস্কৃত কবির চেষ্টা যাতে প্রতিটি শব্দই স্বতন্ত্রভাবে সবর্ণ হয়। আধুনিক কবিতায় সব শব্দের মূল্য সমান নয়, মাঝে-মাঝে কোনো-কোনোটি চাবির মতো কাজ করে, রহস্যের দরজা তাতে খুলে যায়, হঠাৎ তার আঘাতে চারদিক আলো হ'য়ে ওঠে, চঞ্চলতা ছড়িয়ে পড়ে সারা কবিতায়। 'অন্ধকার মধ্যাদিনে বৃষ্টি পড়ে মনের মাটিতে'— এই প্রথম পঙক্তিতেই পুরো কবিতার মূল অর্থ প্রচ্ছন্ন আছে : 'মনের মাটি', তার মানে, এটা শুধু আষাঢ়ে বর্ষার বর্ণনা নয়, এ বর্ষা আমাদের মনের সৃষ্টিপ্রেরণার চিত্রকল্প, কবির কবিতার অনুপ্রেরণা, 'মরুময় দীর্ঘ তিয়াষা'য় সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষার কথাই বলা হ'লো এবং শেষের দিকে 'সৃজনের অন্ধকার' আর 'রচিত বৃষ্টি'ও সেই তৃষ্ণারই তৃপ্তির

আভাস দিচ্ছে। সংস্কৃতে এ-ধরনের শব্দব্যবহার হয় না, প্রতিটি শব্দ নিজের মধ্যে সম্পূর্ণ এবং নিজগুণে সম্ভোগ্য তাদের মধ্যে পারস্পরিক অনুসরণ বা অনুরঞ্জন নেই। সেইজন্য সংস্কৃত কবিতা কোনো বিস্ফোরকের মতো পাঠকের মনের মধ্যে ফেটে পড়ে না ; কবিরা বহুবিধ ইঙ্গিতে-বলার কৌশল জানেন, কিন্তু একই সঙ্গে অভিজ্ঞতার একাধিক স্তর প্রকাশ করেন না।

ব্যাকরণের আর-একটি নিয়মের উল্লেখ করবো, যাকে আমরা বাধা ব'লে অনুভব করি, সেটি এই যে সংস্কৃত বাক্যগঠনে কর্তার কোনো নির্দিষ্ট স্থান নেই। কিংবা, সত্যি বলতে, আমাদের অর্থে বাক্য বা পঙ্‌ক্তির অস্তিত্ব নেই সেখানে। শুধু একটি কর্তা ও একটি ক্রিয়াপদ নিয়ে, সমাসবদ্ধ বিশেষণের সাহায্যে, সুদীর্ঘ বাক্যরচনা তাতে সম্ভব ; কর্তা ও কর্মের মধ্যে মস্ত বড়ো ছেদ থাকলেও এসে যায় না, পাঠক বিভক্তির দ্বারা চিনে নেবেন। 'মেঘদূত'-এর প্রথম শ্লোকের আসল কথাটা হ'লো, 'কশ্চিৎ যক্ষ বসতিং চক্রে'— 'এক যক্ষ বাস করলে'— বাকিটা যক্ষের ও তার বাস-স্থানের বিশেষণ। শ্লোকটির আক্ষরিক অনুবাদ করলে এই রকম দাঁড়ায় :

> এক স্বকর্মে-অমনোযোগী যক্ষ, প্রভুর (দত্ত) প্রিয়াবিরহ-(হেতু)-দুঃসহ একবর্ষ-ভোগ্য শাপের-দ্বারা-বিগতমহিমা (হ'য়ে), সীতার স্নানহেতু-পবিত্র, স্নিগ্ধছায়াতরু-(ময়) রামগিরি-আশ্রমে বাস করলে।

একটু লক্ষ করলেই বোঝা যাবে যে মূলের একটি পদও এই বার্তার কোনো-একটি অংশকে সম্পূর্ণ ক'রে প্রকাশ করছে না ; শ্লোকটির শেষপর্যন্ত না-পৌঁছলে ধারণা হবে না, ব্যাপারটা কী। লেখক যখন কালিদাস, তখন ধ্বনিমাধুর্য নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু ধীরে ও সাবধানে শ্লোকের অন্বয় ক'রে তবে আমরা বুঝতে পারি, কথাটা কী বলা হ'লো। অর্থাৎ, কবিতা ও পাঠকের মধ্যে একটি বুদ্ধির ব্যবধান নিত্য উপস্থিত, পড়ামাত্র কোনো অভিঘাত হবার উপায় নেই— এবং আমরা যাকে পঙ্‌ক্তি বলি, তারও কোনো সম্ভাবনা থাকে না। 'আমাকে দু-দণ্ড শান্তি দিয়েছিলো নাটোরের বনলতা সেন'— এটা সংস্কৃতে অনায়াসে লেখা হ'তে পারে— 'নাটোরের দিয়েছিলো দু-দণ্ড আমাকে শান্তি সেন বনলতা'— উপরন্তু, কথাটা একাধিক পদে বিশিষ্ট হবারও বাধা নেই, 'দিয়েছিলো' বদলি হ'তে পারে প্রথম পদে, 'আমাকে' চ'লে আসতে পারে চতুর্থে। অর্থাৎ সংস্কৃত কবিতার চলন ঠিক ক'রে দেয় পুরো স্তবক বা শ্লোক, আর আধুনিক কবিতা পদের বা পঙ্‌ক্তির চালে চলে। দুয়ের মূলমাত্রা বা unit স্বতন্ত্র। এবং এই প্রভেদ গুরুতর।

তিন

আমি মনে-মনে যে কথাটা ভাবছি এবারে তা বলা যেতে পারে : সংস্কৃত কবিতা সম্পূর্ণরূপে কৃত্রিম, আদর্শ ও তত্ত্বের দিক থেকে তা-ই, অভ্যাসের দিক থেকেও তা-ই। সন্দেহ নেই, শিল্পমাত্রই রচিত, এবং সেই অর্থে কৃত্রিম, কিন্তু আধুনিক

কবিতা অন্তত‌পক্ষে স্বাভাবিকের অভিনয় করে, আর সংস্কৃত কবিতা সদম্ভে ও নির্লজ্জভাবে কৃত্রিমতাকে অঙ্গীকার ক'রে নেয়।

কোনো কবিতা যে-ভাষায় লেখা হচ্ছে সেই ভাষার চরিত্র তাকে বহুদূর পর্যন্ত চালিয়ে নিয়ে যায়, আর সংস্কৃত ভাষার চরিত্র এমন যে তা সর্বতোভাবে কৃত্রিমতার পরিপোষণ করে। তার জটিল ও আশ্চর্য ব্যাকরণ সহজ কথাও সোজাসুজি বলতে দেয় না, শব্দের বিনিময়ধর্মিতা ও সন্ধি-সমাসের কৌশল এক উক্তিতে বহু অর্থ সম্ভব ক'রে তোলে। এই ভাষা শ্বেতাঙ্গ ককেশীয়গণ ভারতে নিয়ে আসেন; ভারতের প্রাগার্য সভ্যতা— আধুনিক পণ্ডিতেরা ব'লে থাকেন— অনেক বিষয়ে বেশি উন্নত ছিলো, তবু যে দেশ জুড়ে নবাগতদের ধর্ম ও সংস্কৃতির জয় হ'লো তার একটি প্রধান কারণ এই ভাষার তর্কাতীত শ্রেষ্ঠতা। তবু এ-বিষয়ে সন্দেহ ঘোচে না যে সংস্কৃতের প্রধান কাব্যসমূহ যে-সময়ে লেখা হয়, সে-সময়ে সংস্কৃত সত্যিকার অর্থে কথিত ছিলো কিনা; অন্তত মেয়েরা, শিশুরা ও প্রাকৃতজনেরা যে তাতে কথা বলতো না, তার প্রমাণ নাট্যসাহিত্যেই পাওয়া যাচ্ছে। এবং যে-ভাষায় শিশুর মুখে বোল ফোটে না, স্বামী-স্ত্রীতে প্রেমালাপ বা কলহ চলে না, যাতে ঘরকন্না বেচাকেনা ইত্যাদি নিত্যকার কাজ সম্পন্ন হবার উপায় নেই, সে-ভাষায় কেমন ক'রে কবিতা লেখা সম্ভব হয়েছে তা ভেবে আজকের দিনে আমরা অবাক হ'তে পারি। আমাদের বুঝতে দেরি হয় না যে তা সম্ভব হ'তে পারে শুধু একটি শর্তে: কবিতাকে 'জীবন' বা 'স্বাভাবিক' থেকে যথাসম্ভব দূরে সরিয়ে দেয়া হবে, তাতে অপণ্ডিতের অধিকার থাকবে না, প্রত্যক্ষতা ও স্বতঃস্ফূর্তি বর্জন করা হবে, হার্দ্য আবেদনের বদলে প্রাধান্য পাবে কৌশল, নৈপুণ্য, বুদ্ধিগত প্রক্রিয়া।

প্রধান উপনিষদ্-সমূহ এই অর্থে কৃত্রিম নয়, বরং তার বিপরীত প্রান্তে প্রতিষ্ঠিত; ভাষা সেখানে প্রাণের তাপে জ্বলন্ত, কবিতার উৎস মানুষের সমগ্র সত্তা, শুধু বুদ্ধি ও দক্ষতার শক্তি নয়। সংস্কৃতে যাকে কাব্য বলা হ'তো তার বহু লক্ষণ মহাভারত ও রামায়ণে পাওয়া যায়, কিন্তু তাদের কাব্যগত প্রভাব কোনো মল্লিনাথের ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করে না, তৎক্ষণাৎ পাঠকের মনে আঘাত করে। বাল্মীকি রামায়ণের ঋতুবর্ণনায় আমরা যেন সশরীরে ঘটনা স্থলে উপস্থিত হই, আর 'কুমারসম্ভব'-এর অকালবসন্ত যেন রঙ্গমঞ্চে বহু যত্নে সাজানো হয়েছে, আমরা যার দর্শকের বেশি হ'তে পারি না। মহাভারতের মৌষলপর্বের দ্বারা আমরা যে-কেউ যে-কোনো সময়ে অভিভূত হ'তে পারি; আর গীতায় বিশ্বরূপ-দর্শনের অধ্যায় প'ড়ে গায়ে কাঁটা দেবে না শুধু সেই ব্যক্তির, যে স্বভাবতই কবিতার ডাকে সাড়া দিতে অক্ষম। কবিতার সঙ্গে পাঠকের এই যে অব্যবহিত সম্বন্ধ, তারই কথা মনে রেখে এলিয়ট গীতাকে বলেছিলেন পৃথিবীর 'দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ দার্শনিক কাব্য', শ্রেষ্ঠ এই জন্যে যে তার কবিতার গুণগ্রহণের জন্য তার দার্শনিক তত্ত্বে বিশ্বাসী হবার প্রয়োজন হয় না[৩]। হয়তো এমন বললেও ভুল হয় না যে সংস্কৃত কবিতার মহত্তম মুহূর্তগুলি সে-সব গ্রন্থেই বিধৃত আছে, যাদের সাধারণত ধর্মশাস্ত্র বলা হয়।

কিন্তু পরবর্তী কাব্যসাহিত্য, আমরা দেখছি, ক্রমশই স্বাভাবিক থেকে দূরে স'রে আসছে, তার মধ্যে প্রধান হ'য়ে উঠছে সজ্জা, প্রসাধন, প্রকরণবিদ্যা। এই আদর্শের অবনতির দিনে সম্পূর্ণ অকবির পক্ষেও 'কাব্য' রচনা সম্ভব হয়েছে : কেউ যমকের সাহায্যে একই রচনার মধ্যে রামায়ণ ও মহাভারতের গল্প সংশ্লিষ্ট করেছেন, কেউ বা কোনো অক্ষর বর্জন ক'রে কসরৎ দেখিয়েছেন, কেউ বা রচনা করেছেন ব্যাকরণের নিয়মাবলির ছন্দোবদ্ধ উদাহরণ। এবং যাঁকে সংস্কৃতের শেষ ভালো কবি বলা যায়, সেই জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' তার অনুপ্রাস ও আদিরসের একঘেয়েমিতে আজকের দিনে অচিরেই আমাদের ক্লান্ত করে।

শিলার বলেছিলেন কবিরা দুই জাতের : 'নাঈভ' ও 'সেণ্টিমেণ্টল' ; হয় তাঁরা নিজেরাই প্রকৃতি, নয় তাঁদের আকাঙ্ক্ষা প্রকৃতির জন্য। গ্যোটে এই শব্দ দুটিকে 'ক্লাসিক' ও 'রোমাণ্টিক'-এর নামান্তররূপে চিহ্নিত ক'রে দেন ; একদিকে তাঁরা, যাঁরা আপন মানবিক ও নৈসর্গিক পরিবেশের মধ্যে নিবিষ্ট ও দ্বন্দ্বহীন ; অন্যদিকে বিচ্ছিন্ন বিদ্রোহীর দল, আধুনিক অর্থে ব্যক্তি, যাঁদের কবিসত্তা ও সামাজিক সত্তায় প্রতিকারহীন বিরোধ ঘটেছে। আধুনিক কালের সব কবিকেই দ্বিতীয় দলের অন্তর্ভূত করা যায় ; যাঁরা তথাকথিত 'ক্লাসিসিস্ট' (যেমন এলিয়ট বা বাংলাদেশে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত) তাঁরাও এই বিচ্ছেদের মধ্যে গৃহীত, এবং সেই অর্থে রোমাণ্টিক। যে-কবিরা বেদ, উপনিষদ্ ও পুরাণসমূহ রচনা করেছিলেন, তাঁদের আমরা নিঃসংশয়ে 'নাঈভ' বলতে পারি, কিন্তু ঐতিহাসিকেরা যাকে সংস্কৃত সাহিত্যের 'ক্লাসিকাল' যুগ ব'লে থাকেন, তার অন্তর্ভূত কবিরা প্রকৃতির মাতৃক্রোড় থেকে বিচ্যুত হ'য়ে পড়েছেন অথচ সত্যিকার ব্যক্তিগত উক্তির জন্যও প্রস্তুত হন নি। আমাদের কাছে তাঁদের ক্লাসিসিজম-এর অর্থ— প্রথার সুমিতি, নিয়মের দার্ঢ্য, বুদ্ধিগত শৃঙ্খলা, পরবর্তী কালে যার অর্থ দাঁড়াল — নেহাৎ গতানুগতি। জয়দেবের স্বভাব ছিলো রোমাণ্টিকের, কিন্তু তাঁর কাব্যে এমন বিশেষণ বা উৎপ্রেক্ষা বিরল যাকে কবি-প্রসিদ্ধির সন্দেহ থেকে আমরা মুক্তি দিতে পারি। এমনকি, ক্ষুদ্রাকার সুভাষিতাবলি —যেখানে আমরা হার্দ্য উচ্চারণ আশা করতে পারতাম— তারাও আশ্চর্যরকম কৃত্রিম, নির্মিত ও পারস্পরিক পুনরুক্তিপ্রবণ। কবি স্বাধীনভাবে তাঁর একান্ত নিজের গলায় কথা বলছেন— যা রোমাণ্টিক সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ— তার উদাহরণ (ধর্মগ্রন্থের বাইরে) সারা সংস্কৃত সাহিত্যে খুঁজে পাওয়া দুঃসাধ্য। 'যঃ কৌমারহরঃ' ব'লে যে-বিখ্যাত কবিতার আরম্ভ, সেটি বিরলতার গুণেই বিখ্যাত ও আদৃত হয়েছে। তার লেখকের মতো খাপছাড়া মহিলা-কবি আরো দু-একজন থাকতে পারেন, কিন্তু সাধারণভাবে এ-কথা সত্য যে আমরা যাকে লিরিক বলি, তার প্রকাশ, সংস্কৃত সাহিত্যের বিপুলতার তুলনায়, অত্যন্ত ক্ষীণ ও দুর্বল।

এটা কেন হ'লো যে রসতত্ত্বের সংস্কৃত নাম অলংকারশাস্ত্র ? 'অলম্' কথাটার অর্থ হ'লো যথেষ্ট ; 'অলংকার' মানে— যথেষ্টীকরণ, যার দ্বারা কোনো জিনিশ যথেষ্ট হ'য়ে ওঠে। যা অলংকৃত নয় তা পর্যাপ্ত নয় (বা প্রকাশ্য নয়), এই মৌল

ধারণা নিয়ে সংস্কৃত কাব্যবিচারের আরম্ভ। এই কাজে যাঁরা হাত দেন তাঁরা দেখাতে-চেয়েছেন কবিতা কী-কী উপায়ে 'যথেষ্ট' হ'য়ে ওঠে ; অর্থাৎ তাঁদের প্রধান লক্ষ্য ছিলো প্রকরণের বিশ্লেষণ। অলংকারের মধ্যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাগ করেছেন তাঁরা ; বহু তর্ক করেছেন, যা আমাদের কানে অনেক সময় ব্যাকরণ-বা আইনঘটিত বিতর্কের মতো শোনায়। উপমা, উৎপ্রেক্ষা ইত্যাদি যা-কিছু উপায় কবিরা ব্যবহার করেন, আমরা সেগুলোকে অলংকার ব'লে ভাবি না, কিংবা এ-কথাও ভাবি না যে তাদের অভাব মানেই কবিতার মৃত্যু। আমরা জেনেছি, এই তথাকথিত অলংকারগুলোকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন ক'রেও মহৎ কবিতা সম্ভব হ'তে পারে, এবং ভালো কবিতায় যখনই এদের ব্যবহার হয় তখনই এরা 'অলংকার' মাত্র থাকে না, অপরিহার্য অঙ্গ হ'য়ে ওঠে। কবিতাকে আমরা একটি অখণ্ড সত্তা ব'লে ধারণা করি ; তাতে, আদর্শ-অনুসারে, এমন-কিছুই থাকবে না যা তার হ'য়ে-ওঠার পক্ষেই প্রয়োজন ছিলো না, শুধু শোভাবৃদ্ধির জন্য যোগ করা হয়েছে। শোভিত বা শোভমান হওয়া কবিতার কাজ, এ কথা স্বীকার করাও আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

ভারতের গরীয়ান ভাস্কর্য-শালায় মিথুনমূর্তি অনেক আছে, কিন্তু বিশুদ্ধ নগ্নমূর্তি— জৈন তীর্থংকরের বিগ্রহ ছাড়া— একটিও দেখা যায় না। নগ্ন ব'লে যাদের মনে হয় তাদের নিম্নাঙ্গে থাকে বসনের আভাস, আর থাকে— স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে— বহু প্রথাসিদ্ধ, মর্যাদাবান অলংকার। বলা বাহুল্য, এর কারণ দেহ বিষয়ে কোনো কুণ্ঠা নয়— ভারতীয় চিত্ত বিষয়ে আর যে-কথাই বলা যাক, তাকে কেউ কখনো শুচিবায়ুগ্রস্ত বলবে না— এর পিছনেও এই ধারণা কাজ করছে যে ভূষণহীন সৌন্দর্য অসম্ভব। কিন্তু কোনারকের অপ্সরা বা অজন্তার মারকন্যার সঙ্গে তুলনীয় যে-সব মূর্তি বা ছবি য়োরোপীয় মহাদেশে রচিত হয়েছে, তারা সম্পূর্ণ নিরাভরণ ও নিরাবরণ। গ্রীক শিল্প চেয়েছে বিশুদ্ধ দেহকে সুন্দর ক'রে প্রকাশ করতে, কিন্তু পরবর্তীরা সুন্দরী নারীর প্রতিকৃতি আর আঁকেন নি, সুন্দরকেই মূর্ত ক'রে তুলেছেন। বত্তিচেল্লির ভেনাসকে কোনো সুন্দরী নারী আর বলা যাবে না, কেন না ছবিটা নিজেই সুন্দর হ'য়ে উঠলো। এই শুদ্ধ নগ্নতার মধ্যে সৌন্দর্য তার স্বারাজ্য লাভ করলে, উচ্চারিত হ'লো শিল্পকলার স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বাধীনতা।

সকলেই জানেন, এই ছবির জন্মক্ষণেই য়োরোপীয় চিত্তের নবজন্ম ঘটে যার প্রভাব, আজ পর্যন্ত, সারা পৃথিবীতে কোনো-না-কোনো ভাবে কাজ ক'রে যাচ্ছে। ভারতের নিজভূমিতে তুলনীয় কোনো রেনেসাঁস ঘটে নি, কিন্তু ঘটলে যা হ'তে পারতো আমাদের ধ্যান-ধারণা আজকাল বহুলাংশে তা-ই ; হয়তো সেটাই মূল কারণ, যেজন্যে সংস্কৃত কাব্যাদর্শের সম্মুখীন হ'লে আমরা অপ্রস্তুত ও বিব্রত বোধ করি। একটা ছোটো দৃষ্টান্ত দিলে আমার কথাটা পরিষ্কার হ'তে পারে। সংস্কৃত 'শিল্প' বা 'কলা', আর য়োরোপীয় 'আর্ট'— এই শব্দ দুটির যাত্রাস্থল একই : দুয়েরই আদি অর্থ 'ক্রাফট', কারিগরি, যে-কোনো প্রকার হাতের কাজে দক্ষতা। 'কলা'র সংখ্যা যে চৌষট্টি হ'তে পারে এ-কথা শুনেই আমরা বুঝি এর অর্থ কত ব্যাপক এবং আমাদের

পক্ষে অবান্তর। ঐ তালিকা যাঁরা রচনা করেন তাঁদের কাছে ভাস্কর্য আর মাল্যরচনায় প্রভেদ ছিলো ব্যবহারগত, কিংবা হয়তো শ্রমের পরিমাণে— জাতের কোনো তফাৎ ছিলো না। যে-মহাশিল্পীরা এলিফ্যান্টা বা এলুরার গুহামূর্তি গড়েছিলেন তাঁরা, আমাদের অর্থে, নিজেদের শিল্পী ব'লে ভাবতেই পারতেন না। তেমনি মধ্যযুগের য়োরোপেও চিত্রকরের সচেতন লক্ষ্য ছিলো— কোনো 'শিল্পকর্মের সৃষ্টি নয়, মন্দিরের প্রয়োজনমতো যীশুজীবনীর দৃশ্যরচনা, যাতে ভক্তের আত্ম-নিবেদনের পাত্র চোখের সামনে মূর্ত হ'য়ে থাকে। কিন্তু রেনেসাঁসের পরে 'আর্ট'-এর অর্থ একই সঙ্গে সংকুচিত ও বহুগুণে বর্ধিত হ'লো— এবং তা-ই থেকে অন্য সব পরিবর্তন ঘটেছে। আর্ট : তা বিচ্ছিন্ন হ'লো মানুষের ব্যবহারিক জীবন থেকে, দেবার্চনার সেবাদাসী আর থাকলো না, সিংহাসনের চামরধারিণীও নয়, সগর্বে বলতে পারলে, 'আমি কোনো কাজে লাগি না। আমি আছি।' আর্ট : তার মানে মুক্তি, শুদ্ধতা, এক ভূষণ-হীন স্বদীপ্ত নগ্নতা, যার সামনে এসে জগৎবাসীরা বলতে বাধ্য হয়—'তোমার কাছে আর-কিছু চাই না, তুমি যে আছো, হ'তে পেরেছো, তারই জন্যে তুমি মূল্যবান।'

আধুনিক য়োরোপীয় চিত্তে কৃত্রিমের দিকে উন্মুখতা দেখা যায় নি তা নয়, কিন্তু তার অর্থ একেবারেই আলাদা। বোদলেয়ার-এর একটি কবিতা আছে, যার নাম 'অলংকার', বিষয় এক বিবসনা ও সালংকারা নারী। এই কবিতা পড়ার পরে সংস্কৃত কবিতার অলংকার বিষয়ে নতুন ক'রে ভাবতে হয়েছে আমাকে, কিন্তু দুই ধারণার মধ্যে কোনো সাদৃশ্যের কল্পনা থেকে নিজেকে সাবধানে বিরত করেছি। য়োরোপের যে-কবিরা, সদ্য-আগত যন্ত্রযুগে, সমাজের সঙ্গে কবির বিচ্ছেদ বিষয়ে প্রথম সুতীব্রভাবে সচেতন হন, তাঁদের মধ্যে প্রধান পুরুষ বোদলেয়ার : তাঁর কবিতার মধ্যে প্রতিষ্ঠা পেলো আর্টের আধুনিক ধারণা, রূপায়িত হ'লো প্রকৃতির সঙ্গে চিত্তের সেই দ্বন্দ্ব, শিলার যার তত্ত্বের দিক প্রকাশ করেছিলেন। আর তাই বোদলেয়ার-এর কবিতা কৃত্রিমের বন্দনায় মুখর : ভূষণের ধাতু ও রত্নদাম, বসনের রেশম ও সাটিন, সুরা, সুগন্ধ, আর স্বপ্নে-দেখা সেই প্যারিস, যেখানে সব উদ্ভিদ লুপ্ত হয়েছে, কোথাও আর তরুপল্লব নেই, চারদিকে শুধু ধাতু, পাথর ও লেলিহান রত্নমণির কারুকার্য, জল পর্যন্ত তরলিত সোনা, আর কালোর মধ্যেও বহু বর্ণ বিচ্ছুরিত— এইসব চিত্রকল্পের সাহায্যে সবলে প্রত্যাখ্যাত হ'লো প্রকৃতি, ঘোষিত হ'লো প্রতিভার পীড়া, নিঃসঙ্গতা ও মহিমা। তাঁর শৌখিনতা— dandyism— তাতেও আছে এমন এক জগতের আলেখ্য, যা সম্পূর্ণরূপে রচিত, স্ব-তন্ত্র ও অ-স্বাভাবিক : নারী সেখানে ঘৃণ্য কেননা মূর্তিমতী প্রকৃতির নামই নারী, আর ঘৃণ্য সমাজ-সংস্কারক, যেহেতু তিনি ঘনিষ্ঠভাবে 'জীবনে'র সঙ্গে যুক্ত থাকেন। এই 'জীবনে' (বা সমাজে) কবির আর স্থান নেই— একা সে, উদ্বাস্তু, দেশ, জাতি ও স্থিতিহীন— এখন সে সার্থক হ'তে পারে শুধু নিজের মধ্যে সম্পূর্ণ হ'য়ে, প্রকৃতির বিরুদ্ধে নিষ্ঠুরভাবে প্রতিভার শক্তিকে দাঁড় করিয়ে। তাই বোদলেয়ার বেশ্যা, জুয়াড়ি, ভিখিরি প্রভৃতি অন্ত্যজদের মধ্যে কবির প্রতিমূর্তি দেখেছিলেন, আর সমকালীন ফরাশি চিত্রকলায় সার্কাসের শঙ্কা

নটনটী যে প্রিয় হ'য়ে উঠলো, তাও এইজন্যে। সামাজিক জীবনে, শিল্পী কি তাদেরই ভাগ্যের অংশিদার নয় ?

এর সঙ্গে সংস্কৃত কবিদের অবস্থার অবশ্য কিছুই মিল নেই। তাঁদের পরিবেশের মধ্যে গৃহীত ছিলেন তাঁরা — শুধু গৃহীত নন, সম্মানিত। অনেকেই রাজার অনুগ্রহ পেয়েছেন, আর প্রচুর অবসর, সাংসারিক নিশ্চিতি। দশম শতকের আলংকারিক রাজশেখর কবির দৈনন্দিন জীবনের যে-বিবরণ রেখে গেছেন, তার সঙ্গে আরো অনেক পুরোনো 'কামসূত্রে' বর্ণিত নাগর বা নাগরিকের জীবন অনেক বিষয়ে মিলে যায়।

'কবি ছ-ঘণ্টা ঘুমোন, ভোরবেলা ওঠেন, প্রাতঃকৃত্য ও আহ্নিকাদি সেরে তিন ঘণ্টা পড়েন, আরো তিন ঘণ্টা লেখেন বা পূর্বদিনের রচনা সংশোধন করেন ; অপরাহ্ণে সাহিত্যিক বন্ধুদের সহযোগে স্বীয় রচনার সমালোচনায় লিপ্ত হন, তারপর আবার বসেন পরিশোধন করতে।' সারত তাঁর দিনগুলি রচনা, অধ্যয়ন ও সাহিত্যিক আলোচনায় পূর্ণ হ'য়ে থাকে এবং তাঁর গোষ্ঠীর মধ্যে থাকেন 'রাজকন্যা, বারাঙ্গনা, এবং রাজপুরুষ ও নাগরদের বনিতাগণ।' শেষোক্ত ব্যক্তিরা— রাজশেখর জানাতে ভোলেন নি— অনেক সময় বিদুষী হতেন, কবিতাও লিখতেন। আর কবিদের সম্মেলনের আয়োজন করা রাজকৃত্যের অন্যতম ছিলো। আমরা অনুমান করতে পারি, এই সমাজস্বীকৃত মসৃণ জীবন বহু শতক ধ'রে একই 'মন্দাক্রান্তা তালে' প্রবাহিত হয়েছে, কেননা ভারতে যদিও যুদ্ধ ও রাজ্য-বদল বহুবার ঘটেছে, সেইসব আন্দোলন সুদৃঢ় ঐতিহ্যবদ্ধ সমাজের গঠনকে স্পর্শ করতে পারে নি ; অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা যুগ-যুগ ধ'রে হুবহু এক থেকে গেছে। বাৎস্যায়নের সঙ্গে রাজশেখরের কালের ব্যবধান দীর্ঘ, অথচ দু-জনে একই রকম আরাম ও নিশ্চিতির কথা লিখেছেন।

মনিয়র-উইলিয়মস 'কবি' শব্দের যে-সব অর্থ দিয়েছেন তার মধ্যে 'প্রাজ্ঞ' থেকে 'চতুর' ও 'ঋষি' থেকে 'মনীষী' পর্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সব স্তরই পাওয়া যায়। দেখা যাচ্ছে, এর ভাগ্য 'শিল্পী' শব্দের উল্টো। 'শিল্পে'র আরম্ভ কারুকর্মের নিম্নভূমিতে ; আমরা আজকের দিনে তাকে 'art'-এর পদবিতে উন্নীত করেছি, যদিও এখনো সে 'craft'-এর সংসর্গ ছাড়তে পারে নি, এমনকি আর্টের জাতশত্রু industry'-র মহলেও সে মাঝে-মাঝে মুজরো খাটে। আর 'কবি'র যাত্রাস্থল ঋষিপদ, সেই উচ্চাসন থেকে তার পতন হ'লো যখন তার অর্থ দাঁড়ালো 'কবিতার লেখক'। কিংবা এটাকে পতন না ব'লে বিবর্তনও বলা যায় ; কবির আদিপিতা যে পুরোহিত এ-কথা পৃথিবী ভ'রেই সত্য ; সংস্কৃতে যাজ্ঞিক পুরোহিতের নামান্তর ছিলো 'কব্য', এতে সম্বন্ধটি আরো স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে।

অন্তত্পক্ষে কবিতা লেখা 'হাতের কাজ' নয় ; আর এই কর্মের উপায় যখন সংস্কৃত ভাষা, তখন তাতে প্রকৃষ্ট হ'তে হ'লে শুধু সাধারণ অর্থে শিক্ষিত হ'লে চলে না, রীতিমতো পণ্ডিত হ'তে হয়। এবং সে-যুগে পণ্ডিত হবার মতো অবস্থা শুধু

তাঁদেরই ছিলো যাঁদের জাতিগত পেশা পৌরোহিত্য। যে-সব ব্রাহ্মণ চিত্র-বা মূর্তি-রচনার কাজ নিতেন তাঁদের যাজনকর্মে আর অধিকার থাকতো না, বিশেষজ্ঞরা এই রকম ব'লে থাকেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ যাঁরা কবিতা লিখেছেন— আর, অন্তত খ্যাত-নামাদের মধ্যে অব্রাহ্মণ কেউ আছেন ব'লে ভাবা যায় না— তাঁদের কাউকে কখনো ব্রাত্য হ'তে হয়েছে এমন কথা কোনো ঐতিহাসিক বলেন নি। বরং, কাব্য ও কাব্যের আলোচনা থেকে, এর উল্টোটাকেই সত্য ব'লে ধ'রে নিতে পারি। স্পষ্ট বোঝা যায়, ভারতের উন্নত, দর্পিত ও ঈর্ষাপরায়ণ ব্রাহ্মণসমাজ যুগ-যুগ ধ'রে বংশপরম্পরায় যে-সংস্কৃতিকে রক্ষা ও প্রচার করেছে, সংস্কৃত ভাষার মুখ্য কবিরা তারই অন্তরঙ্গ ছিলেন —কাব্যের প্রকরণের দিক থেকে, বৌদ্ধ অশ্বঘোষকেও এর ব্যতিক্রম বলা যায় না। শুধু যে তাঁরা সমাজ থেকে চ্যুত হন নি তা নয়, স্বপ্রতিষ্ঠ সম্মানের আসন পেয়েছেন। এই অবস্থার মধ্যে কবিতা যদি কৃত্রিমতার পথ নেয়, তাহ'লে তার বিকাশ হ'তে পারে শুধু এক ধনবান, সুখী ও ভঙ্গিপ্রধান শোভনশিল্পে— যাকে য়োরোপীয় ভাষায় বলে ডেকরেটিভ।

'ক-বোতল টানিলে মদ রঘুবংশম্ যায় গো লেখা?' অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের এই প্রশ্নের উত্তর আমরা কেউ জানি না, তবে প্রশ্নটিকে সংগত ব'লে মানতে পারি। সংস্কৃত ধর্মগ্রন্থ ও পুরাণ সরিয়ে দিলে যা বাকি থাকে, সেই অভিজাত, বিধিবদ্ধ ও পরিশীলিত কাব্যসাহিত্যে কোথায় সেই প্রেরণার স্থান, যাকে মানুষ চিরকাল প্রতিভার বিশেষ লক্ষণ ব'লে মেনেছে, একমাত্র যার প্রভাবে ভাষা হ'য়ে ওঠে দৈববাণী, সার্থক হয় বিদ্যা, প্রযত্ন, পরিশ্রম? এর উত্তর প্রাচীনেরা অমোঘভাবে দিয়ে গেছেন— শাস্ত্র লিখে নয়, প্রবচন রচনা ক'রে। হোমর যেমন অন্ধ, তেমনি বাল্মীকিও দস্যু ছিলেন; এমনকি কালিদাস— যাঁর ছত্রে-ছত্রে আত্মচেতনা ও উত্তরাধিকারবোধ পরিকীর্ণ— সেই বিদগ্ধ উত্তরসূরিকেও বরপ্রাপ্ত জড়বুদ্ধি ব'লে রটনা করা হ'লো। কবিপ্রতিভার গভীরতম অন্তর্দেশ এই প্রবাদসমূহের লক্ষ্য। কবি —তিনি কখনো অবিকল সামাজিক বা স্বভাবী হ'তে পারেন না— তাঁকে হ'তে হবে কোনো-না-কোনো দিক থেকে অভাবগ্রস্ত, যে-অভাবের ক্ষতিপূরণ করে 'দৈব' অথবা অবচেতনের ক্ষমতা। এই কথাটা আধুনিক মানুষের, আর এই কথাই চিরকালীন।

তবু ইতিহাসে মাঝে-মাঝে এমন অধ্যায় দেখা যায়, যখন কোনো আলোকপ্রাপ্ত রাজার বা কোনো নিশ্চল সমাজব্যবস্থার প্রভাবে, কবির সঙ্গে তাঁর পরিবেশের সামঞ্জস্য ঘটে, তিনি তাঁর শাশ্বত অশান্তি ভুলে যান, রাজসভার পার্শ্ববর্তী একটি বিদগ্ধ গোষ্ঠীর অন্তর্ভূত হ'য়ে রচনাদ্বারা সেই গোষ্ঠীরই প্রীতিসাধন করেন। সংস্কৃতে যাকে কাব্য বলে, সন্দেহ নেই তার প্রধান অংশ এমনি একটি অধ্যায়ের মধ্যে উদগত হয়েছিলো। তাই তার অলংকারবিলাসে কোনো প্রচ্ছন্ন বিদ্রোহ নেই, তার সুবিস্তৃত প্রধানশিল্প ব্যবহৃত হয় শুধু একটি ভঙ্গির সেবায়— যে-ভঙ্গিকে নির্দিষ্ট ও নিয়মাবদ্ধ ক'রে তোলাই সমগ্র 'অলংকার'-শাস্ত্রের অভিপ্রায়। ফলত, যাকে ব্যক্তিগত বা প্রত্যক্ষ বলা যায় সংস্কৃত কবিতায় তার সম্ভাবনা ছিলো ন্যূনতম। বলা বাহুল্য, এই ধরনের

কৃত্রিমতার সঙ্গে বোদলেয়ার-এর ব্যবধান বিরাট : দুয়ের মধ্যে যুগান্তর ছড়িয়ে আছে। বোদলেয়ার কৃত্রিমের বন্দনা করেছিলেন স্বাভাবিক ভাষায়, অর্থাৎ তাঁর যেটা স্টাইল সেটা তাঁরই ব্যক্তিগত সৃষ্টি, কোনো সামাজিক ও সাধারণ ভঙ্গি নয় ; যে-আবেগে তাঁর কবিতা সংরক্ত সেটাও সম্প্রদায়গত নয়, তাঁরই নিজস্ব। পক্ষান্তরে, সংস্কৃত কবিরা কৃত্রিম উপায়ে প্রকৃতির স্তব করেছেন ; স্বাভাবিককেই ভালো ব'লে জানতেন তাঁরা ('শকুন্তলা'র বিখ্যাত চতুর্থ অঙ্ক স্মর্তব্য), অথচ ভূষণহীন স্বাভাবিকে তাঁদের সভাসদ-রুচির তৃপ্তি ছিলো না। নববধূ সালংকারা না হ'লে 'যথেষ্ট' হয় না এ-কথাটা বিবাহসভায় মানা যেতে পারে, কিন্তু দম্পতির মিলনের কালে সেই ভূষণদাম যে আবর্জনামাত্র, তা মানুষ চিরকাল ধ'রে জেনে — যদিও ভারতসাহিত্যে বৈষ্ণব কবিদের আগে কেউ মুখ ফুটে বলেন নি। একই রকম নিবিড় ও সম্পূর্ণ মিলন কবিতার সঙ্গে আমরা আকাঙ্ক্ষা করি, কিন্তু সংস্কৃত কবিতায় অলংকারের ব্যবধান ঘোচে না।

কবিতা কোন গুণে ভালো হয় ? বা কবিতা হয় ? 'নীরসতরুবরঃ পুরতো ভাতি'— এটা, ছেলেবেলায় আমাদের শেখানো হয়েছে, 'রসাত্মক বাক্যে'র উদাহরণ। কেউ বলে নি যে এটা রাংতার মতোই চকচকে ও তুচ্ছ ; শুকনো গাছকে 'তরুবর' বলা যায় না, তার প্রসঙ্গে কোনো 'আভা'র উল্লেখ হাস্যকর। তথ্যের সঙ্গে ভাষার এখানে শোচনীয় বিসংগতি ঘটেছে। কিন্তু 'শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠত্যগ্রে'— এর শব্দযোজনায় ও অনুপ্রাসে তথ্যটির যথাযথ ছবি পাওয়া যায় 'কাষ্ঠ' শব্দ বুঝিয়ে দিচ্ছে গাছটা কতদূর মৃত, নেহাৎ গদ্যভাবাপন্ন 'তিষ্ঠতি' ক্রিয়াপদেও রুক্ষতা প্রতিফলিত। এটা কবিতা কিনা জানি না, কিন্তু এর সফলতার প্রমাণ এই যে 'শুষ্কং কাষ্ঠং' আমাদের জীবিত ভাষার অংশ হ'য়ে গেছে। রুচি দূষিত না-হ'লে এই বাক্য নিন্দনীয়ের দৃষ্টান্ত হ'তে পারতো না।

বাংলাদেশের ঘুম-পাড়ানি ছড়ার একাধিক পাঠান্তর প্রচলিত আছে। যিনি লিখেছিলেন—

> ঘুম-পাড়ানি মাসিপিসি মোদের বাড়ি যেয়ো,
> বাটা ভ'রে পান দেবো গাল পুরে খেয়ো—

তাঁর ছিলো র‍্যাশনাল বা ন্যায়সম্মত মন, নিদ্রাদেবীকে তিনি ধারণা করেছেন একজন মাননীয়া প্রতিবেশিনী-রূপে, যাঁকে পান খাইয়ে খুশি করলে শিশুর নিদ্রারূপ বরলাভ সম্ভব হবে। এই কার্য-কারণ সম্বন্ধস্থাপনেই বোঝা যায় যে এর লেখক সুগৃহিণী ও সুমাতা— কিন্তু কবি নন, বড়ো জোর পদ্যকার। কিন্তু—

> ঘুম পাড়ানি মাসিপিসি মোদের বাড়ি এসো,
> খাট নেই, পালঙ্ক নেই, চোখ পেতে বোসো—

এই পদ্যে সাংসারিক জ্ঞানের পরিচয় নেই, কিন্তু কবিত্ব আছে। 'চোখ পেতে বোসো'— মাসিপিসি-নাম্নী অতিথির কাছে এ-রকম একটা অসম্ভব প্রস্তাব তিনি

করতে পারতেন না যদি-না তাঁর কল্পনার সাহস থাকতো। এই সেই যুক্তিহীনতা, যার সংক্রামে ভাষা হ'য়ে ওঠে ভাবনার দ্বারা অন্তঃসত্ত্বা, কবিতা মুক্তি পায়। কিন্তু কোনো সংস্কৃত কবি কোনো মাতৃষ্বসাকে শিশুর চোখের মতো অপরিসর ও বিপজ্জনক স্থানে বসতে বলতেন কিনা, আমি সে-বিষয়ে ঘোরতর সন্দিহান।

আজকের দিনে সকলেই স্বীকার করেন যে ভাষা দুই ভাবে কাজ করে: একদিকে সে খবর দেয়, অন্যদিকে সে জাগিয়ে তোলে। তথ্য বা জ্ঞানের জগতে আমরা চাই স্পষ্ট ও সুসংলগ্ন ভাষা, যার আয়তন তার সংবাদের সঙ্গে খাপে-খাপে মিলে যাবে। কিন্তু কবিতার ভাষায় আমরা খুঁজি প্রভাব, যা তার ব্যাকরণ-নির্দিষ্ট 'অর্থ'কে অতিক্রম ক'রে বহুদূরে ছড়িয়ে পড়ে, যার বেগে আমাদের মনের অনেক স্বপ্ন, স্মৃতি, চিন্তা ও অনুষঙ্গের যেন ঘুম ভেঙে যায়, ধ্বনি থেকে প্রতিধ্বনি অনবরত প্রহত হ'তে থাকে। অলংকারশাস্ত্রে— বিশেষত 'ধ্বনি' বাদে— তুলনীয় পরিভাষার অভাব নেই; কিন্তু যাঁরা বলেন, কবিতায় ভাষা কী-ভাবে কাজ করে, সে-বিষয়ে আধুনিক ধারণার পূর্বাভাস সেখানে পাওয়া যায়, তাঁদের কথায় আমার মন কোনোরকমেই সায় দেয় না। তত্ত্বের দিক থেকে ধ্বনিবাদীরা বহুদূর অগ্রসর হয়েছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নৈয়ায়িক অভ্যাস কাটাতে পারেন নি। পারেন নি, তার কারণ তাঁদের সামনে উপযোগী উদাহরণ ছিলো না, রোমান্টিক মানস বৈষ্ণব কবিদের আগে জন্ম নেয় নি, সমগ্র ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি এক আচারনিষ্ঠ, অনুষ্ঠানধর্মী, জাতিভেদবিভক্ত কঠিন কৌলীন্যের দুর্গে বাস করেছে। আমরা তাই অবাক হ'তে পারি না, যখন বামন বলেন— 'কাব্যং গ্রাহ্যং অলংকারাৎ' বা 'সৌন্দর্যং অলংকারম্'— আমরা শুধু মর্মাহত হ'তে পারি।

ভামহ, যিনি ঐতিহাসিকের পরিচিত প্রথম আলংকারিক, তিনি স্বভাবোক্তিকে বাতিল ক'রে দিয়েছিলেন এই ব'লে যে তা শুধু খবর দিতে পারে, আর কিছু পারে না। তাঁর মতে বক্রোক্তি ও অতিশয়োক্তি নিয়েই কবিতার বাণিজ্য। ব্যঙ্গ্যার্থ বিষয়েও বলা হয়েছে যে হয় সেটি কবিতার একমাত্র অর্থ হবে, নয়তো বাচ্যার্থের চেয়ে তার উৎকৃষ্ট হওয়া চাই। আবার, ব্যঙ্গ্যার্থ থেকেও 'ধ্বনি' বা রসের ব্যঞ্জনাকে আলাদা করা হ'লো। এই শেষোক্ত মতই আমাদের পক্ষে সবচেয়ে আকর্ষণযোগ্য, কিন্তু 'ধ্বনি'র বিখ্যাত উদাহরণ— 'লীলাকমল-পত্রাণি গণয়ামাস পার্বতী'— এতে আমরা দেখতে পাই, মহৎ কবিতার নমুনা নয়, এক চারু ও সুকুমার বক্রোক্তি, যা তার ছন্দোবদ্ধতার গুণে উদ্ধৃতিযোগ্য হয়েছে। তেমনি, আমরা যখন ভামহ বা বামনের বিরোধী মত শুনতে পাই যে অলংকার থাকলেই কবিতা হয় না আর না-থাকলেও কবিতা হ'তে পারে — তখন এই তত্ত্বে আমরা উৎসাহ বোধ না-ক'রে পারি না, কিন্তু দৃষ্টান্ত দেখলেই নিরাশ হ'তে হয়। মধু দ্বিরেফঃ কুসুমৈকপাত্রে...' 'কুমারসম্ভব'-এর এই বিখ্যাত শ্লোকটিকে আমরা নিশ্চয়ই হৃদয়গ্রাহী বা মনোরম বলবো, কিন্তু তার বেশি বলবো না; এটি স্বভাবোক্তি হ'তে পারে, কিন্তু এর অভিপ্রায় বর্ণনামাত্র, যার আড়ালে অন্য কিছু নেই, আর যার চিহ্নসমূহ বর্ণিত বিষয়েরই তথ্য থেকে সংগৃহীত। 'নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা'র একটি গান—

শুনি ক্ষণে ক্ষণে মনে মনে
অতল জলের আহ্বান।
মন রয় না, রয় না, রয় না ঘরে,
চঞ্চল প্রাণ ॥

এরও বিষয় বসন্ত, বা যৌবন, বা কামোন্মাদনা, কিন্তু এতে 'বর্ণনা' নেই, বসন্ত, যৌবন বা তার সম্পৃক্ত কোনো তথ্য উল্লিখিত হয় নি, কিন্তু যৌবনের বেগ অনেক বেশি তীব্রতার সঙ্গে সঞ্চালিত হয়েছে। এখানে বিষয়ান্তরের ব্যঞ্জনা যে-ভাবে পাওয়া যাচ্ছে, ব্যঙ্গ্যার্থ বা ধ্বনির ব্যাখ্যাতাদের তা ধারণার মধ্যে ছিলো না।

আলংকারিকদের মধ্যে মতভেদ প্রচুর, কিন্তু তাঁদের প্রশংসিত শ্লোকাবলিতে, আমরা দেখতে পাই, হয় কোনো অলংকার আছে, নয় ব্যঙ্গ্যার্থ, নয় কোনো বর্ণনার বিস্তার। এদিকে আধুনিক কালে এমন অনেক পঙক্তি বা কবিতা আমরা জেনেছি, যা নিতান্তই নিরলংকার, সরল একটি স্বভাবোক্তি মাত্র, এবং যেখানে বাচ্যার্থই অনন্য, পরম ও মহাশক্তিমান। এর অনেক উদাহরণ মনে পড়ছে, কিন্তু আমি আপাতত ইচ্ছে ক'রেই বৈদেশিক উদ্ধৃতি থেকে বিরত হলাম।

ফুল বলে ধন্য আমি মাটির 'পরে।
কী ফুল ঝরিল বিপুল অন্ধকারে!
তোরা কেউ পারবি নে গো, পারবি নে ফুল ফোটাতে

উদ্ধৃত পঙক্তিগুলির প্রত্যেকটিতে ব্যঙ্গ্যার্থ বা অলংকারের বদলে যা পাওয়া যাচ্ছে তা একটি দূরস্পর্শী ও বিকীর্যমাণ প্রভাব। 'ফুল' থেকে কোনো আভিধানিক অর্থ কিছুতেই বের করা যাবে না, তার সরল অর্থ বাতিল হচ্ছে না কোনোখানেই, অথচ একটি থেকে অন্যটিতে পৌঁছনোমাত্র আমরা অনুভব করি যে শব্দটির ইঙ্গিত বদলে-বদলে যাচ্ছে : কখনো তাতে মরত্বের ভাব পাচ্ছি, কখনো ব্যর্থতার, কখনো বা সৌন্দর্যের। এই ইঙ্গিতের বিচ্ছুরণ, যাকে বিভিন্ন পাঠক (বা একই পাঠক বিভিন্ন সময়ে) ভিন্ন-ভিন্ন ভাবনায় রঞ্জিত ক'রে দেখবেন, কবিতার কাছে এটাই আমাদের প্রধান প্রার্থনা। সম্ভবত অলংকারবাদীরা এদের মধ্যেও কোনো-না-কোনো 'অলংকার' আবিষ্কার করতেন (সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সংজ্ঞাখচনার ক্ষমতা তাঁদের অসীম ছিলো), কিন্তু যে-তত্ত্ব অলংকারহীন কবিতার অস্তিত্ব স্বীকার করে না, 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্' বিষয়ে নিঃসাড় ও নীরব থাকতে বাধ্য। আর সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যে এই কৃশ, নগ্ন ও একান্ত বাণীর তুলনা কোথায়?

তত্ত্বের পরিচয় তার প্রয়োগে। রবীন্দ্রনাথের 'ফুল'— বা 'পথ' বা 'প্রদীপ'— আমরা এদের বলতে পারি চিত্রকল্প (বা হয়তো প্রতীক), এবং এই দুই আধুনিক পরিভাষার সঙ্গে কোনো কোনো অলংকার-সূত্রের সাদৃশ্য অনুমান করা অসম্ভব নয়। কিন্তু ব্যবহারগত পরীক্ষা করলেই নির্ভুলভাবে প্রভেদ ধরা পড়ে। 'চিত্রকল্প' ও 'প্রতীকে'র ব্যাখ্যা যা-ই হোক না, কার্যত তাদের এক দিকে থাকে চিত্ররচনা, আর

অন্য দিকে এক গভীর রহস্য, যাতে জাল ফেলে আমরা তুলে আনতে পারি— হয়তো শূন্যতা, হয়তো এক মুঠো শামুক, হয়তো কখনো মুক্তো বা আশ্চর্য উদ্ভিদ, আর কখনো যার স্তরে-স্তরে ডুবে গিয়ে বহু রত্ন উদ্ধার ক'রে আনি। কিন্তু রহস্য— বা যে-কোনো প্রকার অস্পষ্টতা— সংস্কৃত কবিতার ধর্মবিরোধী; তার 'লক্ষণা' বা 'ব্যঙ্গ্যার্থে'ও নিশ্চয়তা চাই। এক শ্লোকের একাধিক অর্থ আদৃত হ'তো, কিন্তু এই গুণের উদাহরণস্বরূপ অনেক সময় যা উদ্ধৃত হয়েছে তা শুধু কথা নিয়ে খেলা, যমক বা শ্লেষের চাতুর্য।

প্রসন্নাঃ কান্তিহারিণ্যো নানাশ্লেষবিচক্ষণাঃ। ভবন্তি কস্যচিৎ পুণ্যৈর্মুখে বাচো গৃহে স্ত্রিয়ঃ ॥

মুখে বাক্ ও গৃহে স্ত্রী কোন শর্তে পুণ্যমণ্ডিত হয়, একই শ্লোকের মধ্যে তা বলা হচ্ছে। 'প্রসন্ন' : যার অর্থ নির্মল' অথবা 'যার মেজাজ ভালো'; 'কান্তিহারিণী'; 'মধুর রসমণ্ডিত' বা 'যার কণ্ঠহার মনোহর'; 'নানাশ্লেষবিচক্ষণা . নানা শ্লেষ (pun) বা আশ্লেষে (আলিঙ্গনে) নিপুণ। প্রত্যেকটি বিশেষণে দুটি ক'রে অর্থ পোরা আছে, কিন্তু দ্বিতীয়টি বের করামাত্র সমস্তটাই ফুরিয়ে গেলো— তার বেশি আর-কিছু নেই।

আমি জানি, অনামা লেখকের এই রচনা সংস্কৃত কবিতার প্রতিভূ নয়; যদি ছন্দোবদ্ধ রচনামাত্রই কবিতার নাম দাবি করতে পারে তাহ'লেও এটি জাতে ছোটো থেকে যাবে, এবং আলংকারিকদের মধ্যেও অন্তত ধ্বনিবাদীরা এর নিকৃষ্টতা স্বীকার করতেন। যদি এটি সংস্কৃত সাহিত্যে আকস্মিক হ'তো তাহ'লে এটি উল্লেখ্য হ'তো না। কিন্তু এর সধর্মী রচনা সুভাষিতাবলিতে অপর্যাপ্ত এবং মহাকবিরাও শব্দব্যসনের মোহ থেকে মুক্ত নন। এর বীজ লক্ষ্য করা যায় এমনকি বাল্মীকিতেই, যিনি যথার্থ শিলারীয় অর্থে 'নাঈভ', প্রকৃতির দুলাল, যাঁর কাব্যের সহজ শ্রী আধুনিক কবির প্রার্থিত হ'লেও অপ্রাপণীয়। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে শরৎবর্ণনার একটি শ্লোক :

চণ্ডচন্দ্রকরস্পর্শহর্ষোন্মীলিততারকা। অহো রাগবতী সন্ধ্যা জহাতু স্বয়মম্বরম্ ॥

এখানেও এক ঢিলে দুই পাখি মরেছে— 'চন্দ্রকর' : চাঁদের কিরণ বা হাত; 'তারকা' : আকাশের বা চোখের তারা; 'রাগবতী' : অস্তরাগবতী বা অনুরাগবতী; 'অম্বর' : আকাশ বা বসন। 'সন্ধ্যা, চাঁদের আলোয় হৃষ্ট হ'য়ে তারা ফুটিয়ে তুলেছে, এখন সে নিজেই আকাশ ছেড়ে চ'লে যাক'— এই সরল অর্থের সংলগ্ন হ'য়ে আছে নায়িকারূপিণী সন্ধ্যার ছবি, চাঁদের হস্তস্পর্শে যার চোখ পুলকে উন্মীল, এবং এখন যে নিজেই বসন ত্যাগ করতে প্রস্তুত। এই যুগ্মচিত্রের রমণীয়তা আমরা মানতে বাধ্য, তবু এই সুখ ক্ষণকাল পরেই ভেঙে যায়, যখন দেখি দুয়ের মধ্যে কোনো পারস্পরিক সম্বন্ধ নেই, তাদের জুড়ে দেয়া হয়েছে শুধু যান্ত্রিক কৌশলে, একটি অপরটিকে কিছু দান করছে না, দুই অপরিচিতের মতো দূরে-দূরে দাঁড়িয়ে আছে। এই ধরনের পদ রচনা না-করলে বাল্মীকির কোনো ক্ষতি ছিলো না, কিন্তু সংস্কৃত ভাষা, তার

সন্ধি সমাস প্রতিশব্দ নিয়ে, এই দিকে বিরাট ফাঁদ পেতে রেখেছে।

তবু, বাল্মীকি নিজে অন্তত জানতেন না যে 'রাগবতী সন্ধ্যা'য় তিনি 'সমাসোক্তি অলংকার' ব্যবহার করছেন, আর 'বাচ্যার্থ' ও 'ব্যঙ্গ্যার্থে'রও তিনি নাম শোনেন নি ব'লে ধ'রে নেয়া যায়। কিন্তু একই কথা কালিদাস বিষয়ে বলা যায় কি? তিনি যে ভামহর পূর্ববর্তী এ-বিষয়ে ঐতিহাসিকেরা একমত; কোনো লুপ্ত, প্রাচীনতর অলংকারশাস্ত্র তাঁর কালে চলিত ছিলো কিনা, সে-বিষয়ে জল্পনা ক'রে লাভ নেই। কিন্তু তাঁর গ্রন্থাবলি আমাদের আছে, আর আছে এই সাধারণ জ্ঞান যে ব্যাকরণ যেমন ভাষার, তেমনি কবিতার অনুগামী রসতত্ত্ব। উদাহরণ জ'মে না-উঠলে ব্যাখ্যার কোনো প্রয়োজন ঘটে না। এ-কথাও সত্য যে দ্বাদশ শতকের মল্লিনাথ কালিদাসের কাব্যে যত বিচিত্র অলংকার খুঁজে পেয়েছেন তার অনেকগুলোই আমাদের মনে হয় কবিতার সাধারণ ভাষা, যা তার প্রকাশের পক্ষেই প্রয়োজন। কিন্তু তবু কালিদাসের উপর জ্ঞানের বা চাতুর্যের সন্দেহপাত অনিবার্য; তাঁর রচনা পড়ামাত্র বোঝা যায় বাল্মীকির চেয়ে— এমনকি অশ্বঘোষের চেয়ে— তিনি কত বেশি আত্মসচেতন, বিদগ্ধ, এবং বিনম্র। 'মেঘদূত'-এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে মল্লিনাথ যত অভিধান ও শাস্ত্রগ্রন্থের উল্লেখ করেছেন, তার সবই কালিদাসের পরবর্তী ব'লে ধ'রে নেবার কারণ নেই; যদি তার কিয়দংশের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ঘ'টে থাকে, তাহ'লে তাঁকে আলংকারিকের ভাষায় 'শাস্ত্রকবি' ব'লে মানতে হয়। অর্থাৎ শাস্ত্রের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ দু-মুখো; যেমন আলংকারিকেরা সম্ভবত তাঁরই কাব্য থেকে তাঁদের কোনো-কোনো ধারণা আহরণ করেছিলেন, তেমনি তিনিও মাঝে-মাঝে শ্লোক লিখেছিলেন কোনো নীতি বা কামশাস্ত্রের আক্ষরিক অনুসরণে।

হ'তে পারে, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস এখনো নিশ্চিত নয়, কিন্তু নিশ্চিত হ'লেও আমি শুধু কালক্রমের উপর নির্ভর ক'রে কিছু বলতে চাই না। রচনার মধ্যে যা পাওয়া যায়, আমার আলোচনার পক্ষে তারই সাক্ষ্য জরুরি। অলংকার বিষয়ে বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন উক্তি পাশাপাশি চিন্তা করলেই বোঝা যাবে, কবিতার বিষয়ে আধুনিক ধারণা কত ভিন্ন। মনস্তত্ত্বের হিশেবে, বনিতার ও কবিতার অলংকারে তফাৎ নেই; প্রথমটির বিষয়ে আমাদের যা আদর্শ, তা-ই দ্বিতীয়টিতে প্রতিফলিত হ'য়ে থাকে। এখন কালিদাস সর্বান্তঃকরণে অলংকারে বিশ্বাসী; তাঁর কাব্যের মেয়েরা দেখতে কেমন তা তিনি কোনো-কোনো সময়ে না-জানাতে পারেন, কিন্তু বসনভূষণের উল্লেখ করতে কখনো ভোলেন না। 'মেঘদূতে' যক্ষনারীদের তিনি যে পুষ্পাভরণে সাজিয়েছেন সেটাও তাঁর উচ্চতর বৈদগ্ধ্যেরই প্রমাণ দেয়। অলকায় সোনা ও মণিরত্নের প্রাচুর্য এত বিপুল যে তার মেয়েদের মোহিনী ক'রে দেখাতে হ'লে ফুলের গয়নাই পরানো দরকার— যে-সব ফুল, ছয় ঋতুর সংকলন ব'লে, আমরা কখনো একসঙ্গে দেখবো না!

হস্তে লীলাকমলমলকে বালকুন্দানুবিদ্ধং
নীতা লোধ্রপ্রসবরজসা পাণ্ডুতামাননে শ্রীঃ।

চূড়াপাশে নবকুরুবকং চারু কর্ণে শিরীষং
সীমন্তে চ ত্বদুপগমজং যত্র নীপং বধূনাম্ ॥

এই শ্লোক শ্রুতিমোহন ও দৃষ্টিনন্দন, এবং সেই কারণেই মনোমুগ্ধকর। কিন্তু এতে যা বলা আছে তা সবই প্রত্যাশিত ও সম্ভবপর, বিস্ময়ের আঘাত নেই এতে, নেই মূর্ত ও অমূর্তের কোনো সম্বন্ধস্থাপন, যার ফলে কবিতা শুধু অধিকৃত হবার বিষয় থাকে না আর, আবিষ্কৃত হবার দাবি জানায়।

তোমায় সাজাব যতনে কুসুমে রতনে,
কেয়ূরে কঙ্কণে কুঙ্কুমে চন্দনে।
কুন্তলে বেষ্টিব স্বর্ণজালিকা,
কণ্ঠে দোলাইব মুক্তামালিকা,
সীমন্তে সিন্দূর অরুণ বিন্দুর—
চরণ-রঞ্জিব অলক্ত-অঙ্কনে।

এই পর্যন্ত কালিদাস লিখতে পারতেন, যোগ করতে পারতেন আরো কয়েকটি ললিত উপকরণ, কিন্তু তাঁর রচনার সেখানেই সমাপ্তি ঘটতো, যা দৃশ্য ও স্পৃশ্য বস্তু নয় তার দ্বারা সখীকে সাজাবার কল্পনা কখনোই তাঁর মনে আসতো না। 'সখীরে সাজাব সখার প্রেমে/অলক্ষ্য প্রাণের অমূল্য হেমে'— এই সব কথা, যা না-থাকলে বাংলায় এটিকে কবিতা ব'লেই ভাবতুম না আমরা, কালিদাসে তার লেশমাত্র আভাস নেই। 'বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী হরতি দরতিমিরমতিঘোরম্' —এই অতিশয়োক্তিতে যা পাওয়া গেলো তা নাগরযোগ্য চাটুকারিতা মাত্র, কিন্তু সত্যিকার প্রেমিকের স্বর আমরা শুনতে পেলাম, যখন, আদিরসের মরচে-পড়া মুখস্থ-করা বুলির মধ্যে, কৃষ্ণ হঠাৎ ব'লে উঠলেন, 'ত্বমসি মম ভূষণম্'।

ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনং ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নম্—

সারা 'গীতগোবিন্দে' এই একবারই ভাষা হ'য়ে উঠলো কবিতার দ্বারা আক্রান্ত— আক্রান্ত, উন্নত ও রূপান্তরিত, যেন এক ঝাপটে চ'লে গেলো যুক্তিনির্ভর কার্পণ্যকে ছাড়িয়ে। 'তুমিই আমার ভূষণ'— এই একটি কথাই ব'লে দিচ্ছে যে জয়দেব এক সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে আছেন : ভারতীয় সাহিত্যে প্রাচীনের অস্তরাগ তিনি, এবং আধুনিকের পূর্বরাগ। কবিতা যখন সংস্কৃতের বিধিবদ্ধতা থেকে একবার বেরোতে পারলো, তখনই তার মধ্যে জেগে উঠলো অপূর্বতা ও আবিষ্কারধর্ম ; মানুষের প্রত্যাশার যা অতীত, জাগতিক সম্ভাবনার যা বহির্ভূত, সেই অনির্বচনীয়কে বাঁধতে গিয়ে ভাষা সব লজ্জাভয় ত্যাগ করলে।

আমার অঙ্গের কাঁচুলি কৃষ্ণকরাঙ্গুলি, করের ভূষণ সেবা,
আর কটির অলংকার কৃষ্ণচন্দ্রহার, সে-ভূষা বুঝিবে কেবা ?

'কে বুঝবে ?' কালিদাস নিশ্চয়ই বুঝতেন না, তিনি এটাতে দেখতেন তাঁর চেনা

কাব্যাদর্শের বিরুদ্ধে বর্বরের যুদ্ধঘোষণা সভ্যতার অবক্ষয়ের লক্ষণ। 'মেঘদূত'-এর যক্ষ ভুলতে পারে না, আর বার-বার আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে তার বিরহিণী প্রিয়া সব ভূষণ ত্যাগ করেছে; এত বড়ো দুঃখের মধ্যেও এ-কষ্ট তার কম নয়। কিন্তু মেঘ যেন ভুল না বোঝে; যদিও বিরহদশায় তার পত্নী এখন 'অন্যরূপা', স্বভাবত সে অতি রূপবতী, 'তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা' ইত্যাদি। এই শ্লোক অঙ্গে-অঙ্গে যে-তিলোত্তমাকে রচনা করেছে, আমরা সেই প্রতিমাকে দূর থেকে মুগ্ধ হ'য়ে দেখি, কিন্তু—

> সেদিন বাতাসে ছিল তুমি জানো—
> আমারি মনের প্রলাপ জড়ানো,
> আকাশে আকাশে আছিল ছড়ানো
> তোমার হাসির তুলনা ॥

এটি পড়ামাত্র, একই মুহূর্তে এবং বিনা চেষ্টায়, নায়িকার মায়াময় রূপ ও বক্তার বিরহবেদনা আমাদের অন্তঃপ্রবিষ্ট হয়, আমরা হ'য়ে উঠি কবির অভিজ্ঞতার অংশভাগী, তাঁর সঙ্গে একীভূত। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বর্ণনার বদলে এখানে যা আছে তাকে বলতে পারি ভাবনা— সব বস্তু ও তথ্যের আড়ালে নিত্য যা বিরাজমান, যার সংক্রাম থেকে মানুষের মন জড় প্রকৃতিকেও মুক্তি দেয় না। কবিতা যখন এখানে পৌঁছয় কবি তখনই বলতে পারেন— না-ব'লে তখন উপায় থাকে না— 'আমার এ-গান ছেড়েছে তার সকল অলংকার।'

১৯৫৭ — 'কালিদাসের মেঘদূত' গ্রন্থের ভূমিকার অংশ

রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক

বাংলায় স্বভাবকবি কথাটা বোধহয় প্রথম উচ্চারিত হয় গোবিন্দচন্দ্র দাসকে উপলক্ষ ক'রে। কে বলেছিলেন জানি না, কিন্তু কোনো-এক বোদ্ধা ব্যক্তিই বলেছিলেন, কেননা গোবিন্দচন্দ্রকে এই আখ্যা নির্ভুল মানিয়েছিলো, তাছাড়া এতে কবিদের মধ্যে যে শ্রেণীবিভাগের অনুক্ত উল্লেখ আছে সেটাকেও অর্থহীন বলা যায় না। 'নীরব কবি'র অস্তিত্ব উড়িয়ে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ভালো করেছিলেন, তাতে মূক-মিল্টনি কুসংস্কারের উচ্ছেদ হ'লো, কিন্তু 'স্বভাবকবি' কথাটা যে টিকে গেলো তার রীতিমতো একটা কারণ আছে। অবশ্য সাধারণ অর্থে কবিমাত্রেই স্বভাবকবি, যেহেতু কোনো-রকম শিল্পরচনাই সহজাত শক্তি ছাড়া সম্ভব হয় না, কিন্তু বিশেষ অর্থে অনেকে তার ব্যতিক্রম— বা বিপরীত— যদিও সেই উল্টো লক্ষণের এ-রকম কোনো সহজ সংজ্ঞার্থ তৈরি হয় নি। এই অর্থে 'স্বভাবকবি' বলতে শুধু এটুকু বোঝায় না যে ইনি স্বভাবতই কবি— সে-কথা না-বললেও চলে; বোঝায় সেই কবিকে, যিনি একান্তই হৃদয়নির্ভর, প্রেরণায় বিশ্বাসী, অর্থাৎ যিনি যখন যেমন প্রাণ চায় লিখে যান, কিন্তু কখনোই লেখার বিষয়ে চিন্তা করেন না, যাঁর মনের সংসারে হৃদয়ের সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তির সতিনসম্বন্ধ। এ-কথা সত্য যে কবিতায় আবেগের তাপ না-থাকলে কিছুই থাকে না, কিন্তু সেই আবেগটিকে পাঠকের মনে পৌঁছিয়ে দিতে হ'লে তার দাস হ'লে চলে না, তাকে ছাড়িয়ে গিয়ে শাসন করতে হয়। এই শাসন করার, নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি যেখানে নেই, সেখানেই এই বিশেষ অর্থে 'স্বভাবকবিত্ব' আরোপ করতে পারি। এই লক্ষণ কবিদের মধ্যে বর্তায় কখনো বা ব্যক্তিগত কারণে আর কখনো বা ঐতিহাসিক কারণে; কেউ-কেউ স্বভাবতই স্বভাবকবি, আবার কোনো-কোনো সময়ে সাহিত্যের অবস্থার ফলেই স্বভাবকবি তৈরি হ'য়ে থাকে। গোবিন্দচন্দ্র দাসকে বলা যায় স্বভাবতই স্বভাবকবি, একেবারে খাঁটি অর্থে তা-ই; কেননা, হার্দ্যরসের প্রাচুর্য সত্ত্বেও অসংযমজনিত পতনের তিনি উল্লেখ্য উদাহরণ. উপরন্তু তাঁর রচনায় এই অদ্ভুত ঘোষণা পাই যে রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক হ'য়েও তিনি রবীন্দ্রনাথের অস্তিত্বসুদ্ধ অনুভব করেন নি। অথচ এ-কথাও নিশ্চিত বলা যায় না যে তিনি রাবীন্দ্রিক দীক্ষা পেলেই তাঁর ফাঁড়া কেটে যেতো, কেননা ঐ দীক্ষার ফলেও দুর্ঘটনা ঘটেছে, দেখা দিয়েছেন বাংলাদেশের ঐতিহাসিক স্বভাবকবিরা; রবিরাজত্বের প্রথম পর্বে, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত থেকে নজরুল ইসলাম পর্যন্ত, তাঁদের সংখ্যা বড়ো কম নয়।

এ-কথা বললে কি ভুল হয় যে বিশ শতকের আরম্ভকালে যাঁরা বাংলার কবি-কিশোর ছিলেন, স্বভাবকবিত্ব তাঁদের পক্ষে ঐতিহাসিক ছিলো, বলতে গেলে

বিধিলিপি ? কেন ? অবশ্য রবীন্দ্রনাথেরই জন্য। রবীন্দ্রনাথের মধ্যাহ্ন তখন, তাঁর প্রতিভা প্রখর হ'য়ে উঠছে দিনে দিনে, আর যদিও সেই আলোকে কালো ব'লে প্রমাণ করার জন্য দেশের মধ্যে অধ্যবসায়ের অভাব ছিলো না, তবু তরুণ কবিরা অদম্য বেগে রবিচুম্বকে সংলগ্ন হয়েছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তেমন কবি নন, যাঁকে বেশ আরামে ব'সে ভোগ করা যায় ; তাঁর প্রভাব উপদ্রবের মতো, তাতে শান্তিভঙ্গ ঘটে, খেই হারিয়ে ভেসে যাবার আশঙ্কা তার পদে-পদে। তিনি যে একজন খুব বড়ো কবি তা আমরা অনেক আগেই জেনে গিয়েছি, কিন্তু যে-কথা আজও আমরা ভালো ক'রে জানি না— কিংবা বুঝি না— সে-কথা এই যে বাংলাদেশের পক্ষে বড্ড বেশি বড়ো তিনি, আমাদের মনের মাপজোকের মধ্যে কুলোয় না তাঁকে, আমাদের সহ্যশক্তির সীমা তিনি ছাড়িয়ে যান। তবু আজকের দিনে তার সম্মুখীন হবার সাহস পাওয়া যায়, কেননা ইতিমধ্যে বাংলা সাহিত্যে আরো কিছু ঘ'টে গেছে— কিন্তু বিশ শতকের প্রথম দশকে— দ্বিতীয় দশকেও— কী অবস্থা ছিলো ? অপরিসর, ক্ষীণপ্রাণ বাংলা সাহিত্য— তার মধ্যে এই বহ্নিবীজ, আগ্নেয় সত্তা ; এ কি সহ্য করা যায় ? না ;—দাশরথি রায়ের নেহাৎ চাতুরী, রামপ্রসাদের কড়াপাকের ভক্তি, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ফিটফাট সাংবাদিকতা, এমনকি মধুসূদনের তূর্যধ্বনি— আগে যখন এর বেশি আর-কিছু নেই তখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আবির্ভাবে বিস্মিত, মুগ্ধ, বিচলিত, বিব্রত, ক্রুদ্ধ এবং অভিভূত হওয়া সহজ ছিলো, কিন্তু সহজ ছিলো না তাঁকে সহ্য করা, এমনকি— সেই প্রথম সংঘাতের সময়— গ্রহণ করাও সম্ভব ছিলো না। এর প্রমাণ দু-দিক থেকেই পাওয়া যায় ; সমালোচনার মহলে নিন্দার অবিরাম উত্তেজনায়, আর কাব্যের ক্ষেত্রে উত্তরপুরুষের প্রতিরোধহীন আত্মবিলাপে। উপরন্তু অন্য প্রমাণও মেলে, যদি পাঠকমণ্ডলীর মতিগতি লক্ষ করি। রবীন্দ্রনাথের পাঠকসংখ্যা আজ পর্যন্ত অল্প— তাঁর খ্যাতির তুলনায়, তাঁর বিচিত্র বিপুল পরিমাণের তুলনায় অল্প ; আর যারা বাংলাদেশের পাঠকসাধারণ, বড়ো অর্থে পাব্লিক, তারা কিছুদিন আগে পর্যন্তও রবীন্দ্রনাথের স্বাদ নিয়েছে—রবীন্দ্রনাথের নয়, তাঁরই দুই তরলিত, আরামদায়ক সংস্করণে : গদ্যে শরৎচন্দ্রে, আর পদ্যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তে।

বাঙালি কবির পক্ষে, বিশ শতকের প্রথম দুই দশক বড়ো সংকটের সময় গেছে। এই অধ্যায়ের কবিরা— যতীন্দ্রমোহন, করুণানিধান, কিরণধন, এবং আরো অনেকে, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত যাঁদের কুলপ্রদীপ, যাঁরা রবীন্দ্রনাথের মধ্যবয়সে উদ্গত হ'য়ে নজরুল ইসলামের উত্থানের পরে ক্ষয়িত হলেন— তাঁদের রচনা যে এমন সমতলরকম সদৃশ, এমন আশুক্লান্ত, পাণ্ডুর, মৃদুল, কবিতে-কবিতে ভেদচিহ্ন যে এত অস্পষ্ট, একমাত্র সত্যেন্দ্র দত্ত ছাড়া কাউকেই যে আলাদা ক'রে চেনা যায় না— আর সত্যেন্দ্র দত্তও যে শেষ পর্যন্ত শুধু 'ছন্দোরাজ'ই হ'য়ে থাকলেন— এর কারণ, আমি বলতে চাই, শুধুই ব্যক্তিগত নয়, বহুলাংশে ঐতিহাসিক। এ-সব লক্ষণ থেকে সংগত মীমাংসা, এই কবিদের শক্তির দীনতা নয়, কেননা বিচ্ছিন্নভাবে ভালো কবিতা

এঁরা অনেকেই লিখেছেন— সে-মীমাংসা এই যে তাঁরা সকলেই এক অনতিক্রম্য, অসহ্য দেশের অধিবাসী— কিংবা পরবাসী। অর্থাৎ তাঁদের পক্ষে অনিবার্য ছিলো রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ, এবং অসম্ভব ছিলো রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ। রবীন্দ্রনাথের অনতি-উত্তর তাঁরা, বড্ড বেশি কাছাকাছি ছিলেন ; এ-কথা তাঁরা ভাবতে পারেন নি যে গুরুদেবের কাব্যকলা মায়াত্মকরূপে প্রতারক, সেই মোহিনী মায়ার প্রকৃতি না-বুঝে শুধু বাঁশি শুনে ঘর ছাড়লে ডুবতে হবে চোরাবালিতে। যাঁদের কৈশোরে যৌবনে প্রকাশিত হয়েছে 'সোনার তরী'র পর 'চিত্রা', 'চিত্রা'র পর 'কথা ও কাহিনী' ; আর তার পরে 'কল্পনা', 'ক্ষণিকা', 'গীতাঞ্জলি'— সেই মায়ায় না-ম'জে কোনো উপায় ছিলো না তাঁদের ; —সুর শুনে যে-ঘুম ভাঙবে সেই ঘুমই তাঁদের রমণীয় হ'লো ; স্বপ্নের তৃপ্তিতে বিলীন হ'লো আত্মচেতনা ; জন্ম নিলো এই মনোরম মতিভ্রম যে রিনিঠিনি ছন্দ বাজালেই রাবীন্দ্রিক স্পন্দন জাগে, আর জলের মতো তরল হ'লেই স্রোতস্বিনীর গতি পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের ব্রত নিলেন তাঁরা, কিন্তু তাঁকে ধ্যান করলেন না, অনুষ্ঠানের ঐকান্তিকতায় স্বরূপচিন্তার সময় পেলেন না ; তাঁদের কাছে এ-কথাটি ধরা পড়লো না যে রবীন্দ্রনাথের যে-গুণে তাঁরা মুগ্ধ, সেই সরলতা প্রকৃতপক্ষেই জলধর্মী, অর্থাৎ তিনি সরল শুধু উপর-স্তরে, শুধু আপাতিক-রূপে, কিন্তু গভীর দেশে অনিশ্চিত ও কুটিল ; স্রোতে, প্রতিস্রোতে, আবর্তে নিত্যমথিত ; আরো গভীরে ঝড়ের জন্মস্থল, আর হয়তো এমনকি— খরদন্ত মকর-নক্রের দুঃস্বপ্ন নীড়। যে-আশ্রমে তাঁরা স্থিত হলেন, সেই মহাকবির জঙ্গমতা তাঁরা লক্ষ করলেন না, যাত্রার মন্ত্র নিলেন না তাঁর কাছে, তাঁকে ঘিরেই ঘুরতে লাগলেন, তাঁরই মধ্যে নোঙর ফেলে নিশ্চিন্ত হলেন। অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ করতে গিয়ে তাঁরা ঠিক তা-ই করলেন যা রবীন্দ্রনাথ কোনোকালেই করেন নি। এই ভুলের জন্য— ভুল বোঝার জন্য— তাঁদের লেখায় দেখা দিলো সেই ফেনিলতা, সেই অসহায়, অসংবৃত উচ্ছ্বাস, যা 'স্বভাবকবি'র কুললক্ষণ, —শৈথিল্যকে স্বতঃস্ফূর্তি ব'লে, আর তন্দ্রালুতাকে তন্ময়তা ব'লে ভুল করলেন তাঁরা ; —আর ইতিহাসে শ্রদ্ধেয় হলেন এই কারণে যে রবিতাপে আত্মাহুতি দিয়ে তাঁরা পরবর্তীদের সতর্ক ক'রে গেছেন।

দুই

আবার বলি, এ-রকম না-হয়ে উপায় ছিলো না সে-সময়ে, অন্তত কবিতার ক্ষেত্রে ছিলো না। এ-কথাটা বাড়াবাড়ির মতো শোনাতে পারে, কিন্তু রবি-প্রতিভার বিস্তার, আর তার প্রকৃতির বিষয়ে চিন্তা করলে এ-বিষয়ে প্রত্যয় জন্মে। আমাদের পরম ভাগ্যে রবীন্দ্রনাথকে আমরা পেয়েছি, কিন্তু এই মহাকবিকে পাবার জন্য কিছু মূল্যও দিতে হয়েছে আমাদের— দিতে হচ্ছে। সে মূল্য এই যে বাংলা ভাষায় কবিতা লেখার কাজটি তিনি অনেক বেশি কঠিন ক'রে দিয়েছেন। একজনের বেশি রবীন্দ্রনাথ সম্ভব নয় ; তাঁর পরে কবিতা লিখতে হ'লে এমন কাজ বেছে নিতে

হবে যে-কাজ তিনি করেন নি ; তুলনায় তা ক্ষুদ্র হ'লে—ক্ষুদ্র হবারই সম্ভাবনা— তা-ই নিয়েই তৃপ্ত থাকা চাই। আর এইখানেই উল্টো বুঝেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ ও তাঁর সম্প্রদায়। তাঁদের কাছে, রবীন্দ্রনাথের পরে, কবিতা লেখা কঠিন হওয়া দূরে থাক, সীমাহীন রূপে সহজ হ'য়ে গেলো ; ছন্দ, মিল, ভাষা, উপমা, বিচিত্রকমের স্তবক-বিন্যাসের নমুনা— সব তৈরি আছে, আর-কিছু ভাবতে হবে না, অন্য কোনো দিকে তাকাতে হবে না, এই রকম একটা পৃষ্ঠপোষিত মোলায়েম মনোভাব নিয়ে তাঁদের কবিতা লেখার আরম্ভ এবং শেষ। রবীন্দ্রনাথ যা করেন নি, তাঁদের কাছে করবারই যোগ্য ছিলো না সেটা— কিংবা তেমন কিছুর অস্তিত্বই ছিলো না ; রবীন্দ্রনাথ যা করেছেন, ক'রে যাচ্ছেন, তাঁরাও ঠিক তা-ই করবেন, এত বড়োই উচ্চাশা ছিলো তাঁদের। আর এই অসম্ভবের অনুসরণে তাঁরা যে এক পা এগিয়ে তিন পা পিছনে হ'টে যান নি, তারও একটি বিশেষ কারণ রবীন্দ্রনাথেই নিহিত আছে। রবীন্দ্রনাথে কোনো বাধা নেই— আর এইখানেই তিনি সবচেয়ে প্রতারক— তিনি সব সময় দু-হাত বাড়িয়ে কাছে টানেন, কখনো বলেন না 'সাবধান! তফাৎ যাও!' পরবর্তীদের দুর্ভাগ্যবশত, তাঁর মধ্যে এমন কোনো লক্ষণ নেই, যাতে ভক্তির সঙ্গে সুবুদ্ধি-জাগানো ভয়ের ভাবও জাগতে পারে। দান্তের মতো, গ্যেটের মতো, স্বর্গ-মর্ত্য-নরক-ব্যাপী বিরাট কোনো পরিকল্পনা নেই তাঁর মধ্যে, নেই শেক্সপীয়রের মতো অমর চরিত্রের চিত্রশালা, এমনকি মিল্টনের মতো বাক্যবন্ধের বৃহৎরচনাও নেই। তাঁকে পাঠ করার অভিজ্ঞতাটি একেবারেই নিষ্কণ্টক— আমাদের সঙ্গে তাঁর মিলনে যেন মৃণালসূত্রেরও ব্যবধান নেই : কোনোখানেই তিনি দুর্গম নন, নিগূঢ় নন— অন্তত বাইরে থেকে দেখলে তা-ই মনে হয় ; একবারও তিনি অভিধান পাড়তে ছোটান না আমাদের, চিন্তার চাপে ক্লান্ত করেন না, অর্থ খুঁজতে খাটিয়ে নেন না কখনো। আর তাঁর বিষয়বস্তু— তাও বিরল নয়, দুষ্প্রাপ্য নয়, কোনো বিস্ময়কর বহুলতাও নেই তাতে ; এই বাংলাদেশের প্রকৃতির মধ্যে চোখ মেলে, দু-চোখ ভ'রে যা তিনি দেখেছেন তা-ই তিনি লিখেছেন, আবহমান-ইতিহাস লুঠ করেন নি, পারাপার করেন নি বৈতরণী অলকনন্দা। এইজন্য তাঁর অনুকরণ যেমন দুঃসাধ্য, তার প্রলোভনও তেমনি দুর্দম। 'মনে হচ্ছে আমিও অমন লিখতে পারি ঝুড়ি ঝুড়ি', এই সর্বনাশী ধারণাটিকে সব দিক থেকেই প্রশ্রয় দেয় তাঁর রচনা, যাতে আপাতদৃষ্টিতে পাণ্ডিত্যের কোনো প্রয়োজন নেই, যেন কোনো প্রস্তুতিরও নয়— এতই সহজে তা ব'য়ে চলে, হ'য়ে যায়- মনে হয় যেন 'ও-রকম' লেখা ইচ্ছে করলেই লেখা যেতে পারে— একটুখানি 'ভাব' আসার শুধু অপেক্ষা। অন্তত্তপক্ষে আলোচ্য কবিরা এই মোহেই মজেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের 'মতো' হ'তে গিয়ে রবীন্দ্রনাথেই হারিয়ে গেলেন তাঁরা— কি বড়ো জোর তাঁর ছেলেমানুষি সংস্করণ লিখলেন!

রবীন্দ্রনাথের কবিতা নিজেই নিজেকে ব্যক্ত করে, অন্য কোনো সাহায্যের প্রয়োজন হয় না ; এই নির্ভারতা, এই স্বচ্ছতার জন্য, পরবর্তীর পক্ষে বিপজ্জনক উদাহরণ

তিনি। যেহেতু তাঁর লেখায় পাঠকের কোনো পরিশ্রম নেই, তাই এমন ভুলও হ'তে পারে যে চোখ ফেললেই সবটুকু তাঁর দেখে নেয়া যায় ; যেহেতু তাঁর বিষয়ের মধ্যে দৃশ্যমান ব্যাপ্তি নেই, তাই এমনও ভুল হ'তে পারে যে ক্ষুদ্রতর কবিদের পক্ষে তাঁর পথই প্রশস্ত। 'আমরা যাকে বলি ছেলেমানুষি, কাব্যের বিষয় হিশাবে সেটা অতি উত্তম, রচনার রীতি হিশাবেই সেটা উপেক্ষার যোগ্য'-- রবীন্দ্রনাথের এই বাক্যটিতে তাঁর নিজের এবং অন্য কবিদের বিষয়ে অনেক কথাই বলা আছে। কথাটা তিনি বলেছিলেন, 'রচনাবলী'র প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় তাঁর 'মানসী'-পূর্ব কবিতাবলিকে লক্ষ ক'রে যে-সব কবিতার দূষ্যতা তিনি দেখেছিলেন, উপাদানের অভাবে নয়, রূপায়ণের অসম্পূর্ণতায়। উপাদান বা বিষয়বস্তুর দিক থেকে দেখলে তাঁর পরিণত কালের অনেক কবিতাই 'সন্ধ্যাসংগীত'-'প্রভাতসংগীতে'র সধর্মী, এমনকি সমগ্রভাবে তাঁর কাব্যই তা-ই ; তাঁর কাব্যের কেন্দ্র থেকে পরিধি পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে এই 'ছেলেমানুষি', যাকে তিনি বিষয় হিশেবে 'অতি উত্তম' আখ্যা দিয়েছেন। এই 'ছেলেমানুষি'র মানে হ'লো, তাঁর কবিতা বাইরে থেকে সংগ্রহ করা নানা রকম পদার্থের সন্নিপাত নয়, ভিতর থেকে আপনি হ'য়ে-ওঠা, যেন ঠিক মনের কথাটির অবারিত উচ্চারণ। চারদিকের প্রত্যক্ষ এই পৃথিবী দিনে-দিনে যেমন ক'রে দেখা দিয়েছে তাঁর চোখের সামনে, নাড়া দিয়েছে তাঁর মনের মধ্যে, তা-ই তিনি অফুরন্ত বার বলেছেন, প্রতিদিনের সুখ-দুঃখের সাড়া, মুহূর্তের বৃন্তের উপর ফুটে-ওঠা পলাতক এক-একটি রঙিন বেদনা— তাই ধ'রে রেখেছেন তাঁর কবিতায়, আর কবিতার চেয়েও বেশি তাঁর গানে। এইজন্য তাঁর কবিতা এমন দেহহীন, বিশ্লেষণ-বিমুখ ; তার 'সারাংশ' বিচ্ছিন্ন করা যায় না, তাকে দেখানো যায় না ভাঁজে-ভাঁজে খুলে ; যেটা কবিতা, আর যেটা পাঠকের মনে তার অভিজ্ঞতা, ও-দুয়ে কোনো তফাৎই তাতে নেই যেন ; তা আমাদের মনের উপর যা কাজ করবার ক'রে যায়, কিন্তু কেমন ক'রে তা করে আমরা ভেবে পাই না, সমালোচনার কলকজা দিয়েও ধরতে পারি না সেই রহস্যটুকু ; —শেষ পর্যন্ত হার মেনে বলতে হয় তা যে হ'তে পেরেছে তা-ই যথেষ্ট, তা ভালো হয়েছে তার অস্তিত্বেরই জন্য— আর কোনোই কারণ নেই তার।

এইরকম কবিতা জীবনের পক্ষে সম্পদ, কিন্তু তার আদর্শ অনবরত চোখের সামনে থাকলে অন্য কবিরা বিপদে পড়েন। বিপদটা কোথায় তা বুঝিয়ে বলি। সব মানুষেরই অনুভূতি আছে, ব্যক্তিগত সুখদুঃখ আছে ; যখন দেখা যায় যে তারই প্রকাশ আশ্চর্যভাবে কবিতা হ'য়ে উঠছে আর সেই প্রকাশটাও 'নিতান্তই সোজাসুজি', তার পিছনে কোনো অ য়োজন আছে ব'লে মনেই হয় না, তখন যে-কোনো এমন অনুভূতির কাছেই আত্মসমর্পণের লোভ জাগে অন্য কবিদের, কিংবা— খাঁটি বস্তুটির অভাবে— নিজেরাই তাঁরা নিজের মনকে উশকে তোলেন। আর তার ফল কী রকম দাঁড়ায় তারই শিক্ষাপ্রদ উদাহরণ পাই— সত্যেন্দ্রনাথ দত্তে। অনেকের মধ্যে তাঁকে বেছে নিলুম সুস্পষ্ট কারণে ; সমসাময়িক, কাছাকাছি বয়সের কবিদের মধ্যে

রচনাশক্তিতে শ্রেষ্ঠ তিনি, সর্বতোভাবে যুগপ্রতিভূ, এবং রবীন্দ্রনাথের পাশে রেখে দেখলেও তাঁকে চেনা-যায়। হ্যাঁ, চেনা যায়, আলাদা একটা চেহারা ধরা পড়ে, কিন্তু সেই চেহারাটা কী-রকম তা ভাবলেই আমরা বুঝতে পারবো কেন, রবীন্দ্রনাথ পড়া থাকলে, আজকের দিনে সত্যেন্দ্রনাথের আর প্রয়োজন হয় না। তফাৎটা জাতের নয় তা বলাই বাহুল্য ; একই আন্দোলনের অন্তর্গত জ্যেষ্ঠ এবং অনুজ কবির ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্যও নয় এটা ; আবার বড়ো কবি ছোটো কবির তফাৎ বলতে ঠিক যা বোঝায় তাও একে বলা যায় না। ইনি ছোটো কবি না বড়ো কবি, কিংবা কত বড়ো কবি— সমালোচনার কোনো-এক প্রসঙ্গে এ-সব প্রশ্ন অবান্তর ; ইনি খাঁটি কবি কিনা সেইটেই হ'লো আসল কথা। সত্যেন্দ্রনাথে এই খাঁটিত্বটাই পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথের বিরাট মহাজনি কারবারের পর খুচরো দোকানদার হওয়াতে লজ্জার কিছু নেই – সেটাকে প্রায় অনিবার্য বলা যায়, কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের মালপত্রও আপাতদৃষ্টিতে এক ব'লে বাংলা কাব্যে তাঁর আসন এমন সংশয়াচ্ছন্ন। তিনি ব্যবহার করেছেন রবীন্দ্রনাথেরই সাজসরঞ্জাম— সেই ঋতুরঙ্গ, পল্লীচিত্র, দেশপ্রেম ; কিন্তু ফুল, পাখি, চাঁদ, মেঘ, শিশির, এইরকম প্রত্যেকটি শব্দের বা বস্তুর পিছনে রবীন্দ্রনাথে যে-আবেগের চাপ পাই, যে-বিশ্বাসের উত্তাপ যার জন্য 'যূথীবনের দীর্ঘশ্বাসে'র শততম পুনরুক্তিও আমাদের মনে নতুন ক'রে জাগিয়ে তোলে স্বর্গের জন্য বিরহবেদনা, সেই প্রাণবন্ত প্রবলতার স্পর্শমাত্র সত্যেন্দ্রনাথে পাই না, তাঁর কবিতা প'ড়ে অনেক সময়ই আমাদের সন্দেহ হয় যে তাঁর 'অনুভূতি'টাই কৃত্রিম, কবিতা লেখারই জন্য ফেনিয়ে তোলা। যে-স্বপ্ন রবীন্দ্রনাথে দিব্যদৃষ্টি, কিংবা স্বপ্ন মানেই স্বপ্নভঙ্গ, সত্যেন্দ্রনাথে তা পর্যবসিত হ'লো দিবাস্বপ্নে ; যে-ফুল ছিলো বিশ্ব-সত্তার প্রতীক, তা হ'য়ে উঠলো শৌখিন খেলনা, ভাবুকতা হ'লো ভাবালুতা, সাধনা হ'লো ব্যসন, আর মানসসুন্দরীর পরিণাম হ'লো লাল পরি নীল পরির আমোদ-প্রমোদে। সেই সঙ্গে রীতির দিক থেকেও ভাঙন ধরলো ; রবীন্দ্রনাথের ছন্দের যে-মধুরতা, যে-মদিরতা, তার অন্তর্লীন শিক্ষা, সংযম, রুচি, সমস্ত উড়িয়ে দিয়ে যে-ধরনের লেখার প্রবর্তন হ'লো তাতে থাকলো শুধু মিহি সুর ঠুনকো আওয়াজ, আর এমন একরকম চঞ্চল কিংবা চটপটে তাল, যা কবিতার অ-পেশাদার পাঠকের কানেও তক্ষুনি গিয়ে পৌঁছয়। এইজন্যই সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর সময়ে এত জনপ্রিয় হয়েছিলেন ; রবীন্দ্রনাথের কাব্যকে তিনি ঠিক সেই পরিমাণে ভেজাল ক'রে নিয়েছিলেন, যাতে তা সর্বসাধারণের উপভোগ্য হ'তে পারে। তখনকার সাধারণ পাঠক রবীন্দ্রনাথে যা পেয়েছিলো, বা রবীন্দ্রনাথকে যেমন ক'রে চেয়েছিলো, তারই প্রতিমূর্তি সত্যেন্দ্রনাথ। শুধু কর্ণসংযোগ ছাড়া আর-কিছুই তিনি দাবি করলেন না পাঠকের কাছে : তাই তাঁর হাতে কবিতা হ'য়ে উঠলো লেখা-লেখা খেলা বা ছন্দোঘটিত ব্যায়াম। খেলা জিনিশটা সাহিত্যরচনায় অনুমোদনযোগ্য, যতক্ষণ তার পিছনে কোনো উদ্দেশ্য থাকে ; সেটি না থাকলে তা নেহাৎই ছেলেখেলা হ'য়ে পড়ে।[১] আর এই উদ্দেশ্য-হীন কসরৎ, শুধু ছন্দের জন্যই ছন্দ লেখা, এই প্রকরণগত ছেলেমানুষি, কোনো-

এক সময়ে ব্যাপক হ'য়ে দেখা দিয়েছিলো বাংলা কাব্যে ; সত্যেন্দ্রনাথের খ্যাতির চরমে, যখন, এমনকি, তাঁর প্রভাব রবীন্দ্রনাথকেও ছাপিয়ে উঠেছিলো, সেই সময়ে যে-সব ভূরিপরিমাণ নির্দোষ, সুশ্রাব্য এবং অন্তঃসারশূন্য রচনা 'কবিতা' নাম ধ'রে বাংলা ভাষার মাসিকপত্রে বোঝাই হ'য়ে উঠেছিলো, কালের করুণাময় সম্মার্জনী ইতিমধ্যেই তাদের নিশ্চিহ্ন ক'রে দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা, প্রথমে সত্যেন্দ্র-নাথের, তারপর তাঁর শিষ্যদের হাতে সাত দফা পরিস্রুত হ'তে-হ'তে শেষ পর্যন্ত যখন ঝুমঝুমি কিংবা লজঞ্চুষের মতো পদ্যরচনায় পতিত হ'লো, তখনই বোঝা গেলো যে ওদিকে আর পথ নেই— এবার ফিরতে হবে।

তিন

সত্যেন্দ্রনাথ ও তাঁর সম্প্রদায়ের নিন্দা করা আমার উদ্দেশ্য নয়, আমি শুধু ঐতিহাসিক অবস্থাটি দেখাতে চাচ্ছি। তাঁদের সপক্ষে যা-কিছু বলবার আছে তা আমি জানি ; প্রবন্ধের প্রথম অংশে পরোক্ষভাবে তা বলাও হয়েছে, সময়টা প্রতি-কূল ছিলো তাঁদের, বড্ড বেশি অনুকূল ব'লেই প্রতিকূল ছিলো ; রবিরশ্মিকে প্রতিফলিত করা— এছাড়া আর কবিকর্মের ধারণাই তখন ছিলো না। গদ্যের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের অনতিপরেই দু-জন রবিভক্ত অথচ মৌলিক লেখকের সাক্ষাৎ পাই আমরা— প্রমথ চৌধুরী আর অবনীন্দ্রনাথ ; কিন্তু কবিতায় রবীন্দ্রনাথের উত্থান এমনই সর্বগ্রাসী হয়েছিলো যে তার বিস্ময়জনিত মুগ্ধতা কাটিয়ে উঠতেই দু-তিন দশক কেটে গেলো বাংলাদেশের। এই মাঝখানকার সময়টাই সত্যেন্দ্র-গোষ্ঠীর সময় ; রবীন্দ্রনাথের প্রথম এবং প্রচণ্ড ধাক্কাটা তাঁরা সামলে নিলেন— অর্থাৎ পরবর্তীদের সামলে নিতে সাহায্য করলেন ; তাঁদের কাছে গভীরভাবে ঋণী আমরা। এই শেষের কথাটা শুধু বিচার ক'রে বলছি না, এ-বিষয়ে কথা বলার অভিজ্ঞতাপ্রসূত অধিকার আছে আমার। কৈশোরকালে আমিও জেনেছি রবীন্দ্রনাথের সম্মোহন, যা থেকে বেরোবার ইচ্ছেটাকেও অন্যায় মনে হ'তো— যেন রাজদ্রোহের শামিল ; আর সত্যেন্দ্রনাথের তন্দ্রাভরা নেশা, তাঁর বেলোয়ারি আওয়াজের আকর্ষণ— তাও আমি জেনেছি। আর এই নিয়েই বছরের পর বছর কেটে গেলো বাংলা কবিতার : আর অন্য কিছু চাইলো না কেউ, অন্য কিছু সম্ভব ব'লেও ভাবতে পারলো না— যতদিন না 'বিদ্রোহী' কবিতার নিশেন উড়িয়ে হৈ-হৈ ক'রে নজরুল ইসলাম[২] এসে পৌঁছলেন। সেই প্রথম রবীন্দ্রনাথের মায়াজাল ভাঙলো।

নজরুল ইসলামকেও ঐতিহাসিক অর্থে স্বভাবকবি বলেছি ; সে-কথা নির্ভুল। পূর্বোক্ত প্রকরণগত ছেলেমানুষি তাঁর লেখার আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে ; রবীন্দ্রনাথের আক্ষরিক প্রতিধ্বনি তাঁর 'বলাকা' ছন্দের প্রেমের কবিতায় যেমনভাবে পাওয়া যায়, তেমন কখনো সত্যেন্দ্রনাথে দেখি না ; আর সত্যেন্দ্রনাথেরও নিদর্শন তাঁর রচনার মধ্যে প্রচুর। নজরুলের কবিতাও অসংযত, অসংবৃত, প্রগল্ভ ; তাতে পরিণতির

দিকে প্রবণতা নেই : আগাগোড়াই তিনি প্রতিভাবান বালকের মতো লিখে গেছেন, তাঁর নিজের মধ্যে কোনো বদল ঘটে নি কখনো, তাঁর কুড়ি বছর আর চল্লিশ বছরের লেখায় কোনোরকম প্রভেদ বোঝা যায় না। নজরুলের দোষগুলি সুস্পষ্ট, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সমস্ত দোষ ছাপিয়ে ওঠে ; সব সত্ত্বেও এ-কথা সত্য যে রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলা ভাষায় তিনিই প্রথম মৌলিক কবি। সত্যেন্দ্রনাথ, শিল্পিতার দিক থেকে, অন্তত তাঁর সমকক্ষ, সত্যেন্দ্রনাথে বৈচিত্র্যও কিছু বেশি ; কিন্তু এ-দু'জন কবিতে পার্থক্য এই যে সত্যেন্দ্রনাথকে মনে হয় রবীন্দ্রনাথেরই সংলগ্ন, কিংবা অন্তর্গত, আর নজরুল ইসলামকে মনে হয় রবীন্দ্রনাথের পরে অন্য একজন কবি —ক্ষুদ্রতর নিশ্চয়ই, কিন্তু নতুন। এই যে নজরুল, রবিতাপের চরম সময়ে রাবীন্দ্রিক বন্ধন ছিঁড়ে বেরোলেন, বলতে গেলে অসাধ্যসাধন করলেন, এটাও খুব সহজেই ঘটেছিলো, এর পিছনে সাধনার কোনো ইতিহাস নেই, কতগুলো আকস্মিক কারণেই সম্ভব হয়েছিলো এটা। কবিতার যে-আদর্শ নিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, নজরুলও তা-ই, কিন্তু নজরুল বৈশিষ্ট্য পেয়েছিলেন তাঁর জীবনের পটভূমিকার ভিন্নতায়। মুসলমান তিনি, সেই সঙ্গে হিন্দু মানসও আপন ক'রে নিয়েছিলেন— চেষ্টার দ্বারা নয়, স্বভাবতই। তাঁর বাল্য-কৈশোর কেটেছে— শহরে নয়, মফস্বলে ; স্কুল-কলেজে 'ভদ্রলোক' হবার চেষ্টায় নয়, যাত্রাগান লেটো গানের আসরে ; বাড়ি থেকে পালিয়ে রুটির দোকানে, তারপর সৈনিক হ'য়ে। এই যেগুলো সামাজিক দিক থেকে তাঁর অসুবিধে ছিলো, এগুলোই সুবিধে হ'য়ে উঠলো যখন তিনি কবিতা লেখায় হাত দিলেন। যেহেতু তাঁর পরিবেশ ছিলো ভিন্ন, এবং একটু বন্য ধরনের, আর যেহেতু সেই পরিবেশ তাঁকে পীড়িত না-ক'রে উল্টে আরো সবল করেছিলো তাঁর সহজাত বৃত্তিগুলোকে, সেইজন্য, কোনোরকম সাহিত্যিক প্রস্তুতি না-নিয়েও শুধু আপন স্বভাবের জোরেই রবীন্দ্রনাথের মুঠো থেকে পালাতে পারলেন তিনি, বাংলা কবিতায় নতুন রক্ত আনতে পারলেন। তাঁর কবিতায় যে-পরিমাণ উত্তেজনা ছিলো সে-পরিমাণ পুষ্টি যদিও ছিলো না, তবু অন্তত নতুনের আকাঙ্ক্ষা তিনি জাগিয়েছিলেন ; তাঁর প্রত্যক্ষ প্রভাব যদিও বেশি স্থায়ী হ'লো না, কিংবা তেমন কাজেও লাগলো না, তবু অন্তত এটুকু তিনি দেখিয়ে দিলেন যে রবীন্দ্রনাথের পথ ছাড়াও অন্য পথ বাংলা কবিতায় সম্ভব। যে-আকাঙ্ক্ষা তিনি জাগালেন, তার তৃপ্তির জন্য চাঞ্চল্য জেগে উঠলো নানা দিকে, এলেন 'স্বপনপসারী'র সত্যেন্দ্র দত্তীয় মৌতাত কাটিয়ে, পেশীগত শক্তি নিয়ে মোহিতলাল, এলো যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের অগভীর— কিন্তু তখনকার মতো ব্যবহারযোগ্য— বিধর্মিতা, আর এই সব পরীক্ষার পরেই দেখা দিলো 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর নতুনতর প্রচেষ্টা, বাংলা সাহিত্যের মোড় ফেরার ঘণ্টা বাজলো।

চার

নজরুল ইসলাম নিজে জানেন নি যে, তিনি নতুন যুগ এগিয়ে আনছেন ; তাঁর রচনায় সামাজিক ও রাজনৈতিক বিদ্রোহ আছে, কিন্তু সাহিত্যিক বিদ্রোহ নেই। যদি তিনি ভাগ্যগুণে গীতকার এবং সুরকার না-হতেন, এবং যদি পারস্য গজলের অভিনবত্বে তাঁর অবলম্বন না-থাকতো, তাহ'লে রবীন্দ্রনাথ-সত্যেন্দ্রনাথেরই আদর্শ মেনে নিয়ে তৃপ্ত থাকতেন তিনি। কিন্তু যে-অতৃপ্তি তাঁর নিজের মনে ছিলো না, সেটা তিনি সংক্রমিত ক'রে দিলেন অন্যদের মনে ; যে-প্রক্রিয়া অচেতনভাবে তাঁর মধ্যে শুরু হ'লো, তা সচেতন স্তরে উঠে আসতে দেরি হ'লো না। যাকে 'কল্লোল'-যুগ বলা হয় তার প্রধান লক্ষণই বিদ্রোহ আর সে-বিদ্রোহের প্রধান লক্ষ্যই রবীন্দ্রনাথ। এই প্রথম রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে অভাববোধ জেগে উঠলো— বন্ধ্যা প্রাচীনের সমালোচনার ক্ষেত্রে নয়, অর্বাচীনের সৃষ্টির ক্ষেত্রেই। মনে হ'লো তাঁর কাব্যে বাস্তবের ঘনিষ্ঠতা নেই, সংরাগের তীব্রতা নেই, নেই জীবনের জ্বালাযন্ত্রণার চিহ্ন, মনে হ'লো তাঁর জীবনদর্শনে মানুষের অনস্বীকার্য শরীরটাকে তিনি অন্যায়ভাবে উপেক্ষা ক'রে গেছেন। এই বিদ্রোহে আতিশয্য ছিলো সন্দেহ নেই, কিছু আবিলতাও ছিলো, কিন্তু এর মধ্যে সত্য যেটুকু ছিলো তা উত্তরকালের অঙ্গীকরণের দ্বারা প্রমাণ হ'য়ে গেছে। এর মূল কথাটা আর-কিছু নয়— সুখস্বপ্ন থেকে জেগে ওঠার প্রয়াস, রবীন্দ্রনাথকে সহ্য করার, প্রতিরোধ করার পরিশ্রম। প্রয়োজন ছিলো এই বিদ্রোহের - বাংলা কবিতার মুক্তির জন্য নিশ্চয়ই, রবীন্দ্রনাথকেও সত্য ক'রে পাবার জন্য। লক্ষ্য করতে হবে, এই আন্দোলনে অগ্রণী ছিলেন সেই সব তরুণ লেখক, যাঁরা সবচেয়ে বেশি রবীন্দ্রনাথে আপ্লুত ; অন্তত একজন যুবকের কথা আমি জানি, যে রাত্রে বিছানায় শুয়ে পাগলের মতো 'পূরবী' আওড়াতো, আর দিনের বেলায় মন্তব্য লিখতো রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ ক'রে। অত্যধিক মধুপানজনিত অগ্নিমান্দ্য ব'লে উড়িয়ে দেখা যাবে না এটাকে, কেন না, চিকিৎসাও এরই মধ্যে নিহিত ছিলো, ছিলো ভারসাম্যের আকাঙ্ক্ষা আর আত্মপ্রকাশের পথের সন্ধান। 'নিজের কথাটা নিজের মতো ক'রে বলবো'— এই ইচ্ছেটা প্রবল হ'য়ে উঠেছিলো সেদিন, আর তার জন্যই তখনকার মতো রবীন্দ্রনাথকে দূরে রাখতে হ'লো। ফজলি আম ফুরোলে ফজলিতর আম চাইবো না, আতাফলের ফরমাশ দেবো— 'শেষের কবিতা'র এই ঠাট্টাকেই তখনকার পক্ষে সত্য ব'লে ধরা যায়।[৩] অর্থাৎ, রবীন্দ্রতর হ'তে গেলে যে রবীন্দ্রনাথের ভগ্নাংশ মাত্র হ'তে হয়, এই কথাটা ধরা পড়লো এতদিনে ;— 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর লক্ষ্য হ'য়ে উঠলো— রবীন্দ্রতর হওয়া।

অবশ্য এইভাবে কথাটা বললে ব্যাপারটাকে যেন যান্ত্রিক ক'রে দেখানো হয়, খানিকটা জেদের ভাব ধরা পড়ে। জেদ একেবারেই ছিলো না তা নয়, স্রোতের টানে জঞ্জালও কিছু ভেসে এসেছিলো, কিন্তু এই বিদ্রোহের স্বচ্ছ রূপটি ফুটে উঠলো, যখন, 'কল্লোলে'র ফেনা কেটে যাবার পরে, চিন্তায় স্থিতিলাভের চেষ্টা দেখা দিলো সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'পরিচয়ে' আর 'কবিতা' পত্রিকায় নবীনতর কবিদের স্বাক্ষর

পড়লো একে-একে। সুধীন্দ্রনাথের সমালোচনা হাওয়ার ধোঁয়া কাটাতে সাহায্য করলো ; এদিকে, নজরুলের চড়া গলার পরে, প্রেমেন্দ্র মিত্রের হার্দ্য গুণের পরে, বাংলা কবিতায় দেখা দিলো সংহতি, বুদ্ধি-ঘটিত ঘনতা, বিষয় এবং শব্দচয়নে ব্রাত্যধর্ম, গদ্য-পদ্যের মিলনসাধনের সংকেত। বলা বাহুল্য, সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই-রকম পরিবর্তন কালপ্রভাবেই ঘ'টে থাকে, কিন্তু তার ব্যবহারগত সমস্যার সমাধানে বিভিন্ন কবির ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যেরই প্রয়োজন হয়। আর বাঙালি কবির পক্ষে, বিশ শতকের তৃতীয় এবং চতুর্থ দশকে, প্রধানতম সমস্যা ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। আমাদের আধুনিক কবিদের মধ্যে পারস্পরিক বৈসাদৃশ্য প্রচুর— কোনো-কোনো ক্ষেত্রে দুস্তর ; দৃশ্যগন্ধস্পর্শময় জীবনানন্দ আর মননপ্রধান অবক্ষয়চেতন সুধীন্দ্রনাথ দুই বিপরীত প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছেন, আবার এ-দু'জনের কারো সঙ্গেই অমিয় চক্রবর্তীর একটুও মিল নেই। তবু যে এই কবিরা সকলে মিলে একই আন্দোলনের অন্তর্ভূত, তার কারণ এঁরা নানা দিক থেকে নতুনের স্বাদ এনেছেন ; এঁদের মধ্যে সামান্য লক্ষণ এই একটি ধরা পড়ে যে এঁরা পূর্বপুরুষের বিত্ত শুধু ভোগ না-ক'রে, তাকে সাধ্যমতো সুদে বাড়াতেও সচেষ্ট হয়েছেন, এঁদের লেখায় যে-রকমেরই যা-কিছু পাওয়া যায়, রবীন্দ্রনাথে ঠিক সে-জিনিশটি পাই না। কেমন ক'রে রবীন্দ্রনাথকে এড়াতে পারবো— অবচেতন, কখনো বা চেতন মনেই এই চিন্তা কাজ ক'রে গেছে এঁদের মনে ; কোনো কবি, জীবনানন্দর মতো, রবীন্দ্রনাথকে পাশ কাটিয়ে স'রে গেলেন, আবার কেউ-কেউ তাঁকে আত্মস্থ ক'রেই শক্তি পেলেন তাঁর মুখোমুখি দাঁড়াবার। এই সংগ্রামে— সংগ্রামই বলা যায় এটাকে— এঁরা রসদ পেয়েছিলেন পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের ভাণ্ডার থেকে, পেয়েছিলেন উপকরণরূপে আধুনিক জীবনের সংশয়, ক্লান্তি, বিতৃষ্ণা। এঁদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধসূত্র অনুধাবন করলে ঔৎসুক্যকর ফল পাওয়া যাবে ; দেখা যাবে, বিষ্ণু দে ব্যঙ্গানুকৃতির তির্যক উপায়েই সহ্য ক'রে নিলেন রবীন্দ্রনাথকে ; দেখা যাবে সুধীন্দ্রনাথ, তাঁর জীবন-ভুক্ পিশাচ-প্রমথর বর্ণনায়, রাবীন্দ্রিক বাক্যবিন্যাস প্রকাশ্যভাবেই চালিয়ে দিলেন, আবার অমিয় চক্রবর্তী, রবীন্দ্রনাথেরই জগতের অধিবাসী হ'য়েও, তার মধ্যে বিস্ময় আনলেন প্রকরণগত বৈচিত্র্যে, আর কাব্যের মধ্যে নানারকম গদ্য বিষয়ের আমদানি ক'রে। অর্থাৎ, এঁরা রবীন্দ্রনাথের মোহন রূপে ভুলে থাকলেন না, তাঁকে কাজে লাগাতে শিখলেন, সার্থক করলেন তাঁর প্রভাব বাংলা কবিতার পরবর্তী ধারায়। 'বেলা যে পড়ে এল জলকে চল'-এর বদলে 'গলির মোড়ে বেলা যে প'ড়ে এলো', আর 'কলসী লয়ে কাঁখে পথ সে বাঁকা'র বদলে 'কলসি কাঁখে চলছি মৃদু তালে'— এইরকম আক্ষরিক অনুকরণেরই উপায়ে একটি উৎকৃষ্ট এবং মৌলিক কবিতা লেখা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের পক্ষে সম্ভব হয়েছিলো এঁদের উদাহরণ সামনে ছিলো ব'লেই ; দশ বছর আগে এ-রকমটি হ'তেই পারতো না। সত্যেন্দ্র-গোষ্ঠী রবীন্দ্রনাথের প্রতিধ্বনি করতেন নিজেরা তা না জেনে— সেইটেই মারাত্মক হয়েছিলো তাঁদের পক্ষে ; আর এই কবিরা সম্পূর্ণরূপে জানেন রবীন্দ্রনাথের কাছে কত ঋণী এঁরা, আর সে-কথা

পাঠককে জানতে দিতেও সংকোচ করেন না, কখনো-কখনো আস্ত-আস্ত লাইন তুলে দেন আপন পরিকল্পনার সঙ্গে মিলিয়ে। এই নিষ্কুণ্ঠতা, এই জোরালো সাহস— এটাই এঁদের আত্মবিশ্বাসের, স্বাবলম্বিতার প্রমাণ। ভাবীকালে এঁদের রচনা যে-রকমভাবেই কীটদষ্ট হোক না, এঁরা ইতিহাসে শ্রদ্ধেয় হবেন অন্তত এই কারণে যে বাংলা কবিতার একটি সংকটের সময়ে এঁরা এই মৌল সত্যের পুনরুদ্ধার করেছিলেন যে সত্য-শিব-সুন্দরকে গুরুর হাত থেকে তৈরি অবস্থায় পাওয়া যায় না, তাকে জীবন দিয়ে সন্ধান করতে হয়, এবং কাব্যকলাও উত্তরাধিকারসূত্রে লভ্য নয়, আপন শ্রমে উপার্জনীয়।

নজরুল ইসলাম থেকে সুভাষ মুখোপাধ্যায়, দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী অবকাশ— এই কুড়ি বছরে বাংলা কবিতার রবীন্দ্রাশ্রিত নাবালক দশার অবসান হ'লো। এর পরে যাঁরা এসেছেন এবং আরো পরে যাঁরা আসবেন, রবীন্দ্রনাথ থেকে আর-কোনো ভয় থাকলো না তাঁদের, সে-ফাঁড়া পূর্বোক্ত কবিরা কাটিয়ে দিয়েছেন। অবশ্য অন্যান্য দুটো-একটা বিপদ ইতিমধ্যে দেখা দিয়েছে; যেমন জীবনানন্দর পাক, কিংবা বিষ্ণু দে-র বা অন্য কারো-কারো আবর্ত, যা থেকে চেষ্টা ক'রেও বেরোতে পারছেন না আজকের দিনের নবাগতরা। এতে অবাক হবার বা মন-খারাপ করার কিছু নেই; এই-রকমই হ'য়ে এসেছে চিরকাল; পুনরাবৃত্তির অভ্যাসের চাপেই পুরোনোর খোশা ফেটে যায়, ভিতর থেকে নতুন বীজ ছড়িয়ে পড়ে। নতুন যাঁরা কবিতা লিখেছেন আজকাল, তাঁরা অনেকেই দেখছি প্রথম থেকেই টেকনীক নিয়ে বড্ড বেশি ব্যস্ত;— সেটা কোথা থেকে এসেছে, তা আমি জানি, যথাসময়ে তার সমর্থনও করেছি, কিন্তু এখন সেটাকে দুর্লক্ষণ ব'লে মনে না-ক'রে পারি না। 'চোরাবালি' কিংবা 'খসড়া' লেখার সময় যে-সব কৌশল ছিলো প্রয়োজনীয়, আজকের দিনে অনেকটাই তার মুদ্রাদোষে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে; আর তাছাড়া যখন ভঙ্গি নিয়ে অত্যধিক দুশ্চিন্তা দেখা যায়— যেমন চলতিকালের ইংরেজ-মার্কিন কাব্যে— তখনই বুঝতে হয় মনের দিক থেকে দেউলে হ'তে দেরি নেই। আমি এ-কথা ব'লে কলাসিদ্ধির প্রাধান্য কমাতে চাচ্ছি না, কিন্তু কলাকৌশলকে পুরো পাওনা মিটিয়ে দেবার পরেও এই কথাটি বলতে বাকি থাকে যে কবিতা লেখা হয়— স্বরব্যঞ্জনের চাতুরী দেখাতে নয়, কিছু বলবারই জন্য, আর সেই বক্তব্য যেখানে যত বড়ো, যত স্বচ্ছন্দ তার প্রকাশ, প্রকরণগত কৃতিত্বও সেখানেই তত বেশি পাওয়া যায়। মনে হয় এখন বাংলা কবিতায় নতুন ক'রে স্বাচ্ছন্দ্য-সাধনার সময় এসেছে, প্রয়োজন হয়েছে স্বতঃস্ফূর্তিকে ফিরে পাবার। আর এইখানে রবীন্দ্রনাথ সহায় হ'তে পারেন, এ-কথাটি বলতে গিয়েও থেমে গেলুম, যেহেতু আদি উৎস বিষয়ে কোনো পরামর্শ নিষ্প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের প্রভাবের কথাটা আজকের দিনে যে আর না-তুললেও চলে, সেটাই বাংলা কবিতার পরিণতির চিহ্ন, এবং রবীন্দ্রনাথেরও 'ভক্তিবন্ধন থেকে পরিত্রাণে'র প্রমাণ। বাংলা সাহিত্যে আদিগন্ত ব্যাপ্ত হ'য়ে আছেন তিনি, বাংলা ভাষার রক্তে-মাংসে মিশে আছেন; তাঁর কাছে ঋণী হবার জন্য এমনকি তাঁকে অধ্যয়নেরও আর

প্রয়োজন নেই তেমন, সেই ঋণ স্বতঃসিদ্ধ ব'লেই ধরা যেতে পারে — শুধু আজকের দিনের নয়, যুগে-যুগে বাংলা ভাষার যে-কোনো লেখকেরই পক্ষে। আর যেখানে প্রত্যক্ষভাবে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘ'টে যাবে, সেখানেও, সুখের বিষয়, সম্মোহনের আশঙ্কা আর নেই ; রবীন্দ্রনাথের উপযোগিতা, ব্যবহার্যতা ক্রমশই বিস্তৃত হ'য়ে, বিচিত্র হ'য়ে প্রকাশ পাবে বাংলা সাহিত্যে। তাঁরই ভিত্তির উপর বেড়ে উঠতে হবে আগামী কালের বাঙালি কবিকে ; এইখানে বাংলা কবিতার বিবর্তনের পরবর্তী ধাপেরও ইঙ্গিত আছে।

১৯৫২ 'সাহিত্যচর্চা'

জীবনানন্দ দাশ-এর স্মরণে

ঢাকা, গ্রীষ্মকাল, ১৯২৭। হাতে-লেখা 'প্রগতি' পত্রিকা ছাপার অক্ষরে রূপান্তরিত হ'লো। শুঁয়োপোকার খোলশ ঝ'রে গেলো, বেরিয়ে এলো ক্ষণকালীন প্রজাপতি। কিন্তু শুধুমাত্র ক্ষণিক ব'লেই কোনো-কিছু উপেক্ষণীয় নয়; কারো হয়তো অল্প সময়েই কিছু করবার থাকে, সেটুকু ক'রে দিয়েই সে বিদায় নেয়।

'প্রগতি'র নিয়মিত লেখকদের মধ্যে রীতিমতো বিখ্যাত ছিলেন একমাত্র নজরুল ইসলাম, আর অচিন্ত্যকুমার— যাঁর 'বেদে', 'টুটা-ফুটা' সবেমাত্র বেরিয়েছে— তাঁকেও বলা যায় সদ্য-সমাগত। এই দু-জন ছাড়া অন্য সকলেই ছিলেন আসন্ন, অত্যাসন্ন, উপক্রমণিক; বৃহত্তর পাঠকসমাজের সঙ্গে তাঁদের অপরিচয়ের ব্যবধান তখনও ভেঙে যায় নি। আর এঁদের মধ্যে— সম্পাদক দু-জনকে বাদ দিয়ে— যাঁদের রচনা সবচেয়ে প্রচুর পরিমাণে ছাপা হ'তো, তাঁদের নাম জীবনানন্দ দাশ ও বিষ্ণু দে।

বিষ্ণু দে প্রথম লেখা পাঠিয়েছিলেন 'শ্যামল মিত্র' বা ঐ রকম কোনো ছদ্মনামে, নিপুণ ছন্দের কোনো কবিতা। তারপর স্বনামে ও বেনামে, গদ্যে ও পদ্যে, তাঁর অনেক লেখাই 'প্রগতি'র পাতা উজ্জ্বল করেছিলো। তাঁর সাহিত্য-জীবনের সেটা প্রথমতম অধ্যায়; লোকে তাঁর স্বনামকেই বেনাম ব'লে ভুল করেছে; অনেকেই বিশ্বাস করছে না বিষ্ণু দে'-র মতো সংক্ষিপ্ত ও সুশ্রাব্য নাম কোনো বাস্তব মানুষের পক্ষে সম্ভব।

কিছুকাল পূর্বে জীবনানন্দ দাশগুপ্ত স্বাক্ষরিত 'নীলিমা' নামে একটি কবিতা 'কল্লোলে' আমরা লক্ষ করেছিলাম; কবিতাটিতে এমন একটি সুর ছিলো যার জন্য লেখকের নাম ভুলতে পারি নি। 'প্রগতি' যখন বেরোলো, আমরা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে এই লেখককে আমন্ত্রণ জানালাম, তিনিও তার উত্তর দিলেন উষ্ণ, অকৃপণ প্রাচুর্যে। কী আনন্দ আমাদের, তাঁর কবিতা যখন একটির পর একটি পৌঁছতে লাগলো, যেন অন্য এক জগতে প্রবেশ করলাম— এক সান্ধ্য, ধূসর, আলোছায়ার অদ্ভুত সম্পাতে রহস্যময়, স্পর্শগন্ধময়, অতি-সূক্ষ্ম-ইন্দ্রিয়চেতন জগৎ— যেখানে পতঙ্গের নিশ্বাসপতনের শব্দটুকুও শোনা যায়, মাছের পাখনার ক্ষীণতম স্পন্দনে কল্পনার গভীর জল আন্দোলিত হ'য়ে ওঠে। এই চরিত্রবান নতুন কবিকে অভিনন্দন জানিয়ে ধন্য হলাম আমরা।

'প্রগতি'র প্রথম বছরের বাঁধানো সেটটি আমার অনির্ভরযোগ্য ভাণ্ডার থেকে অনেক আগেই অন্তর্হিত হয়েছে, অন্য কোথাও তা সংগ্রহ করতেও পারলাম না। পত্রিকার সূত্রপাত থেকেই জীবনানন্দর লেখা সেখানে বেরিয়েছে এই রকম একটা

ধারণা আছে আমার ; কিন্তু প্রথম বছরে কোন-কোন লেখা বেরিয়েছিলো সেটা স্পষ্টভাবে মনে আনতে পারছি না। খুব সম্ভব তার মধ্যে ছিলো '১৩৩৩', 'পিপাসার গান' আর 'অনেক আকাশ'। সৌভাগ্যত, দ্বিতীয় আর অসমাপ্ত তৃতীয় বছরের সংখ্যাগুলি এখনো আমার হাতের কাছে আছে, আর তাতে— এখন পাতা উলটিয়ে প্রায় অবাক হ'য়ে দেখছি — প্রথম দেখা দিয়েছিলো 'সহজ', 'পরস্পর', 'জীবন', 'স্বপ্নের হাতে', 'পুরোহিত' (পরবর্তী নাম 'নির্জন স্বাক্ষর'), 'কয়েকটি লাইন', 'বোধ', 'আজ', 'অবসরের গান'। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র সতেরোটি কবিতার মধ্যে 'পাখিরা', 'কল্লোলে', 'ক্যাম্পে', 'পরিচয়ে', 'মৃত্যুর আগে', 'কবিতা'য়, আর কোনো-কোনোটি 'ধূপছায়া'য় বেরিয়েছিলো, কিন্তু অধিকাংশেরই প্রথম প্রকাশ 'প্রগতি'তে, তার উপর যখন বই ছাপা হ'লো তখন ধাত্রীর কাজও আমি করেছিলাম ; তাই ঐ গ্রন্থটিকে আমার নিজের জীবনের একটি অংশ ব'লে মনে হয় আমার। প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করি যে 'আজ' নামক স্তবকবিন্যস্ত দীর্ঘ কবিতাটি 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে নেই, পরবর্তী অন্য কোনো গ্রন্থেও গৃহীত হয় নি।

'প্রগতি'তে, শুধু প্রকাশ করা নয়, নতুন সাহিত্য প্রচার করার দিকেও লক্ষ্য ছিলো আমাদের। তার জন্যে মনের মধ্যে তাগিদ ছিলো, বাইরে থেকেও উত্তেজনার অভাব ছিলো না। দেশের মধ্যে উগ্র হ'য়ে উঠেছিলো সংঘবদ্ধ, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, অপরিমিত, অনবরত বিরুদ্ধতা। যাঁরা যুদ্ধঘোষণা করলেন তাঁরা কেউ সাহিত্যের মহাজনি কারবারি, কেউ বা তাঁদের আশ্রিত, কেউ মহিলা, কেউ বড়ো ঘরের ছেলে, কেউ নামজাদা সম্পাদক অথবা লণ্ডনে পাশ-করা প্রোফেসর, আর কেউ বা ফরাশি জর্মান আর এক লাইন রাশিয়ান জানেন। তুলনায় আমরা, যারা নেহাৎই কলেজের ছাত্র কিনা সবেমাত্র উত্তীর্ণ, যে-কোনোরকম সাংসারিক বিচারে আমরা কত দুর্বল তা না-বললেও চলে ; কিন্তু যেহেতু সংসারের নিয়ম আর সাহিত্যের বিধান এক নয়, যেহেতু নিন্দুকের লক্ষ কথাকে কীটের অন্নে পরিণত ক'রে একটিমাত্র কবিতার পঙক্তি তারার মতো জ্বলজ্বল করে, তাই আমরা হেরে যাই নি, ভেঙে যাই নি, স'রে যাই নি, দাঁড়িয়ে ছিলাম শরবর্ষণের সামনে, কিছু-কিছু প্রত্যুত্তরও দিয়েছিলাম। সেই দু-বছর বা আড়াই বছর, যে-ক'দিন 'প্রগতি' চলেছিলো, আমি বাদানুবাদে লিপ্ত হয়েছিলাম, শুধুমাত্র সদর্থকভাবে নিজের কথাটা প্রকাশ না-ক'রে প্রতিপক্ষের জবাব দিতেও চেয়েছিলাম— সেই সব আক্রমণেরও উত্তর, যাতে আক্রোশের ফণা বিষাক্ত হ'য়ে উঠেছে, আর ইতর রসিকতার অন্তরালে দেখা যাচ্ছে পান-খাওয়া লাল-লাল দাঁত, কালচে মোটা ঠোঁট, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের সময় দুঃশাসনের ঘৃণিত, লোলুপ, ব্যর্থকাম দৃষ্টি। এইরকম আক্রমণের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিলেন জীবনানন্দ, আর তাতে আমার যেমন উত্তেজনা হ'তো নিজের বিষয়ে ব্যঙ্গবিদ্রূপে তেমন হ'তো না ; যেহেতু তাঁর কবিতা আমি অত্যন্ত ভালোবেসেছিলুম, আর যেহেতু তিনি নিজে ছিলেন সব অর্থে সুদূর, কবিতা ছাড়া অন্য সব ক্ষেত্রে নিঃশব্দ, তাই আমার মনে হ'তো তাঁর বিষয়ে বিরুদ্ধতার প্রতিরোধ করা বিশেষভাবে আমার কর্তব্য। 'প্রগতি'র সম্পাদকীয়

আলোচনার মধ্যে জীবনানন্দর প্রসঙ্গ, সমসাময়িক অন্য লেখকদের তুলনায়, কিছু বেশি পৌনঃপুনিক ব'লে মনে হয় ; তার অনেকটা অংশই যে প্রতিবাদ সে-কথা ভাবতে আজ আমার খারাপ লাগে। অবশ্য আমি অচিরেই বুঝেছিলাম যে প্রতিবাদ মানেই শক্তির অপব্যয়, আর পরবর্তী দীর্ঘকাল ধ'রে সেই অপব্যয় সন্তর্পণে এড়িয়ে চলেছি, কিন্তু এখানে অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে হ'লো, তা না-হ'লে সেই সময়কার সম্পূর্ণ ছবিটি পাওয়া যাবে না। আজ নতুন ক'রে স্মরণ করা প্রয়োজন যে জীবনানন্দ, তাঁর কবিজীবনের আরম্ভ থেকে মধ্যভাগ পর্যন্ত, অসূয়াপন্ন নিন্দার দ্বারা এমনভাবে নির্যাতিত হয়েছিলেন যে তারই জন্য কোনো-এক সময়ে তাঁর জীবিকার ক্ষেত্রেও বিঘ্ন ঘটেছিলো। এ-কথাটা এখন আর অপ্রকাশ্য নেই যে 'পরিচয়ে' প্রকাশের পরে 'ক্যাম্পে' কবিতাটির সম্বন্ধে 'অশ্লীলতা'র নির্বোধ এবং দুর্বোধ্য অভিযোগ এমনভাবে রাষ্ট্র হয়েছিলো যে কলকাতার কোনো-এক কলেজের শুচিবায়ুগ্রস্ত অধ্যক্ষ তাঁকে অধ্যাপনা থেকে অপসারিত ক'রে দেন। অবশ্য প্রতিভার গতি কোনো বৈরিতার দ্বারাই রুদ্ধ হ'তে পারে না, এবং পৃথিবীর কোনো জন কীটস অথবা জীবনানন্দ কখনো নিন্দার ঘায়ে মূর্ছা যান না—শুধু নিন্দুকেরাই চিহ্নিত হ'য়ে থাকে মূঢ়তার, ক্ষুদ্রতার উদাহরণস্বরূপ। মার্কিন লেখক হেনরি মিলার একখানা বই লিখেছেন, যার নাম *Remember to Remember*। এই নামটি উল্লেখযোগ্য, কেন না আমাদের ব্যক্তিগত আর সামাজিক দায়িত্বের বড়ো একটা অংশ হ'লো মনে রাখা। জীবনে যেখানে-যেখানে সুন্দরের স্পর্শ পেয়েছি সেটা যেমন স্মরণযোগ্য, তেমনি যেখানে কুৎসিতের পরাকাষ্ঠা দেখলাম সেটাকে যেন দুর্বলের মতো মার্জনীয় ব'লে মনে না করি। যেন মনে রাখি, মনে রাখতে ভুলে না যাই।

দুই

'প্রগতি'র পাতায় জীবনানন্দর কবিতা বিষয়ে যে-সব আলোচনা বেরিয়েছিলো তার কিছু-কিছু অংশ এখানে তুলে দেবার লোভ হচ্ছে। আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে এই উদ্ধৃতিগুলির লেখক আর বর্তমান প্রবন্ধকার ঐতিহাসিক অর্থে একই ব্যক্তি ; কিন্তু এর রচনাভঙ্গি, আর লেখার মধ্যে ইংরেজি শব্দের অবিরল ব্যবহার দেখে আজ আমার কর্ণমূল আরক্ত হচ্ছে। তবু, সব দোষ সত্ত্বেও, অংশগুলি অন্য কারণে ব্যবহার্য হ'তে পারে : প্রথমত, এতে বোঝা যাবে একজন প্রথম ভক্ত পাঠকের মনে জীবনানন্দর কবিতা কী-রকম ভাবে সাড়া তুলেছিলো ; দ্বিতীয়ত, এই তিরিশ বছরে বাংলা কবিতা কত দূর অগ্রসর হয়েছে তা বোঝার পক্ষেও এগুলো কিঞ্চিৎ কাজে লাগতে পারে।

জীবনানন্দবাবু বাংলা কাব্যসাহিত্যে একটি অজ্ঞাতপূর্ব ধারা আবিষ্কার করেছেন ব'লে আমার মনে হয়। তিনি এ-পর্যন্ত মোটেই popularity অর্জন করতে পারেন নি, বরঞ্চ তাঁর রচনার প্রতি অনেকেই বোধ হয় বিমুখ ; —অচিন্ত্যবাবুর

মতো তাঁর এরি মধ্যে অসংখ্য imitator জোটে নি। তার কারণ বোধ হয় এই যে জীবনানন্দবাবুর কাব্যরসের যথার্থ উপলব্ধি একটু সময়সাপেক্ষ,…তাঁর কবিতা একটু ধীর-সুস্থে পড়তে হয়, আস্তে-আস্তে বুঝতে হয়।

জীবনানন্দবাবুর কবিতায় যে-সুরটি আগাগোড়া বেজেছে, তা'কে ইংরেজ সমালোচকের ভাষায় 'renascence of wonder' বলা যায়।…তাঁর ছন্দ ও শব্দযোজনা, উপমা ইত্যাদিকে চট ক'রে ভালো কি মন্দ বলা যায় না— তবে "অদ্ভুত" স্বচ্ছন্দে বলা যায়।…তাঁর প্রধান বিশেষত্ব আমরা এই লক্ষ্য করি যে সংস্কৃত শব্দ যতদূর সম্ভব এড়িয়ে চ'লে শুধু দেশজ শব্দ ব্যবহার ক'রেই তিনি কবিতা রচনা করতে চাচ্ছেন। ফলে তাঁর diction সম্পূর্ণরূপে তাঁর নিজস্ব বস্তু হয়ে পড়েছে—তা'র অনুকরণ করাও সহজ ব'লে মনে হয় না।…[তিনি] এমন সব কথা বসাচ্ছেন যা পূর্বে কেউ কবিতায় দেখতে আশা করে নি— যথা, "ফেঁড়ে", "নটকান", "শেমিজ", "থুর্তনি" ইত্যাদি। এর ফলে তাঁর কবিতায় যে অপূর্ব স্বাতন্ত্র্য এসেছে সে-কথা আগেই বলেছি ; তাঁর নিজের ব্যবহারের জন্য তিনি একটি আলাদা ভাষা তৈরী ক'রে নিতে পেরেছেন, এর জন্য তিনি গৌরবের অধিকারী। * * *

এ-কথা ঠিক যে তিনি [জীবনানন্দ] পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত আগাগোড়া রোমাণ্টিক। এক হিশেবে তাঁকে প্রেমেন্দ্র মিত্রের antithesis বলা যেতে পারে। প্রেমেন্দ্রবাবু বাস্তব জগতের সকল রূঢ়তা ও কুশ্রীতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ, বাস্তব জীবনের নিষ্ঠুরতা তাঁকে নিরন্তর পীড়া দিচ্ছে।…জীবনানন্দবাবু এই সংসারের অস্তিত্ব আগাগোড়া অস্বীকার করেছেন, তিনি আমাদের হাত ধ'রে এক অপূর্ব রহস্যলোকে নিয়ে যান ; —সে মায়াপুরী হয়তো আমরা কোনোদিন স্বপ্নে দেখে থাকবো।…[সেইজন্যেই] আমি বলেছিলাম যে তাঁর কবিতায় "renascence of wonder" ঘটেছে। * * *

[তাঁর] ছন্দ অসমছন্দ হ'লেও "বলাকা"র ছন্দের সঙ্গে এর পার্থক্য কানেই ধরা পড়ে ; —"বলাকা"র চঞ্চলতা, উদ্দাম জলস্রোতের মতো তোড় এর নেই ;—এ যেন উপলাহত মন্থর স্রোতস্বিনী— থেমে-থেমে, অজস্র ড্যাশ ও কমার বাঁধে ঠেকে-ঠেকে উদাস, অলস গতিতে ব'য়ে চলেছে। এতে প্রচুর উৎসাহের তাড়া নেই, আছে একটি মধুর অবসাদের ক্লান্তি। এই সুর যেন বহুদূর থেকে আমাদের কানে ভেসে আসছে। * * *

জীবনানন্দবাবুর…বহু কবিতায়…পরমবিস্ময়কর কথা-চিত্র পাওয়া যায়, সে ছবিগুলো সব মৃদু রঙে আঁকা, তাঁর কবিতার tone আগাগোড়া subdued।…দৃষ্টান্তস্বরূপ এই ক'টি লাইন নেয়া যাক—

আমার এ গান
কোনোদিন শুনিবে না তুমি এসে, —
আজ রাত্রে আমার আহ্বান
ভেসে যাবে পথের বাতাসে, —

তবুও হৃদয়ে গান আসে !
ডাকিবার ভাষা
তবুও ভুলি না আমি, —
তবু ভালোবাসা
জেগে থাকে প্রাণে !
পৃথিবীর কানে
নক্ষত্রের কানে
তবু গাই গান !
কোনোদিন শুনিবে না তুমি তাহা, —জানি আমি—
আজ রাত্রে আমার আহ্বান
ভেসে যাবে পথের বাতাসে
তবুও হৃদয়ে গান আসে !

এখানে যেন কথা শেষ হ'য়েও শেষ হয় নি ; —কথা ফুরিয়ে গেলেও তা'র বিষণ্ণ সুরটি পাঠকের মনকে যেন haunt করতে থাকে। একটি বা কয়েকটি লাইন পুনরাবৃত্তি করার···ফলে গোটা কবিতাটি যেন চট ক'রে থেমে যায় না, ভ্রমরের পাখার মতো গুঞ্জন ক'রে ভেসে যায়।

('প্রগতি'— আশ্বিন, ১৩৩৫, সম্পাদকীয় মন্তব্য)

অনিল। * * * আজকালকার একটি কবির লেখা প'ড়ে আমার আশা হচ্ছে, আর বেশি দেরি নেই, হাওয়া বদলে আসছে।

সুরেশ। কে তিনি ?

অনিল। জীবনানন্দ দাশ।

সুরেশ। জীবানন্দ দাশ ? কখনো নাম শুনি নি তো !

অনিল। জীবানন্দ নয়, জীবনানন্দ। নামটা অনেককেই ভুল উচ্চারণ করতে শুনি। তাঁর নাম না শোনবারই কথা ! কিন্তু তিনি যে একজন খাঁটি কবি তা'র প্রমাণস্বরূপ আমি তোমাকে তাঁর একটি লাইন বলছি— 'আকাশ ছড়ায়ে আছে নীল হয়ে আকাশে-আকাশে।'···আকাশের অন্তহীন নীলিমার দিগন্ত-বিস্তৃত প্রসারের ছবিকে একটি মাত্র লাইনে আঁকা হয়েছে— একেই বলে magic line। আকাশ কথাটার পুনরাবৃত্তি করবার জন্যই ছবিটি একেবারে স্পষ্ট, সজীব হ'য়ে উঠেছে ; শব্দের মূল্য-বোধের এমন পরিচয় খুব কম বাঙালি কবিই দিয়েছেন।

সুরেশ। (অনিচ্ছাসত্ত্বে) লাইনটি ভালো বটে।

অনিল। এই কবি···উভচর ভাষা অবলম্বন ক'রে আমাদের ধন্যবাদভাজন হয়েছেন। আজকালকার কবিদের মধ্যে তাঁর ভাষা সব চেয়ে স্বাভাবিক। সরল, নিরলঙ্কার, ঘরোয়া ভাষার একটা উৎকৃষ্ট উদাহরণ শুনবে ? তুমি যদি অনুমতি করো, প্রগতি থেকে জীবনানন্দর একটি কবিতার খানিকটা পড়ে' শোনাই।

সুরেশ। শুনি ?
অনিল। (পড়িল)।

তুমি এই রাতের বাতাস,
বাতাসের সিন্ধু— ঢেউ,
তোমার মতন কেউ
নাই আর।
অন্ধকার— নিঃসাড়তার
মাঝখানে
তুমি আনো প্রাণে
সমুদ্রের ভাষা,
রুধিরে পিপাসা
যেতেছে জাগায়ে,
ছেঁড়া দেহে— ব্যথিত মনের ঘায়ে
ঝরিতেছে জলের মতন,
রাতের বাতাস তুমি— বাতাসের সিন্ধু— ঢেউ,
তোমার মতন কেউ
নাই আর।

এই passageটির একমাত্র weak point হচ্ছে রুধির কথাটা। তা ছাড়া, একেবারে নিখুঁত। এতে melody না থাকে, music আছে— একটা ক্লান্ত উদাস সুরের meandering। থেমে-থেমে পড়তে হয়— তবে সুরটি কানে ধরা পড়বে। যেমন – 'রাতের, বাতাস তুমি। বাতাসের, সিন্ধু, ঢেউ ॥ তোমার, মতন কেউ। নাই আর ॥'

সুরেশ। তা তো বুঝলাম, কিন্তু 'ছেঁড়া দেহ'।

অনিল। ঠিকই— দেহ কথাটা এখানে সঙ্গত হয় নি। ···শরীর কথাটাকে তো তিনিই [জীবনানন্দ] জাতে তু'লে দিয়েছেন। তবে দেহ কথাটাও তো কেবলমাত্র অভিধানগত নয়।

সুরেশ। দেহ সম্বন্ধে আপত্তি করবার কিছুই ছিলো না, কিন্তু ছেঁড়া

অনিল। ছিন্ন না বললে মানে বোঝো না নাকি ?

সুরেশ। ছেঁড়া শুনলেই হাসি পায়।

অনিল। অনভ্যাস। স'য়ে গেলেই এর সৌন্দর্য ধরা পড়বে। দ্যাখো, এতদিনে আমাদের এ-কথাটা উপলব্ধি করা উচিত যে সংস্কৃত আর বাংলা এক ভাষা নয়, সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলার নাড়ির বাঁধন বহুকাল ছিঁড়ে গেছে। বাংলা এখন একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, সাবালক ভাষা— তা'র ব্যাকরণ, তা'র বিধি-বিধান, তা'র spirit সংস্কৃত থেকে আলাদা।··· অথচ, আশ্চর্যের

বিষয় বাংলা কবিতা এখন পর্য্যন্ত সংস্কৃত কথাগুলোর প্রতিই পক্ষপাত দেখাচ্ছে, সংস্কৃত convention গুলো এখনো কাটিয়ে উঠতে পারে নি। আমাদের কবিতায় এখনো সুন্দরীরা বাতায়নপাশে দাঁড়িয়ে কেশ আলুলিত ক'রে দেয়, মুকুরে মুখ দেখে, চরণ অলক্তক-রঞ্জিত করে, শুভ্র ও শীতল শয্যায় শোয়। আমাদের নায়িকাদের এখনো হস্তে লীলাকমলমলকে বালকুন্দানুবিদ্ধং ইত্যাদি, যদিও ও-সব ফ্যাশান দেশ থেকে বহুকাল উঠে গেছে। সংস্কৃতের দুয়ারে এই কাঙালপনা ক'রে আর কতকাল আমরা মাতৃভাষাকে ছোট ক'রে রাখবো ? আমাদের ভুল জীবনানন্দ দাশ বুঝতে পেরেছেন ব'লে মনে হয়; ভাষাকে যথাসম্ভব খাঁটি বাংলা ক'রে তোলবার চেষ্টা তাঁর মধ্যে দেখা যায়। তিনি সাহস করে লিখেছেন :

> সেই জল মেয়েদের স্তন
> ঠাণ্ডা— শাদা – বরফের কুচির মতন।

শুনে তোমার— শুধু তোমার কেন ? অনেকেরই— হাসি পাবে, বলবে— 'ঠাণ্ডা— শাদা— এ আবার কী ?' কিন্তু ঐ শব্দ দুটো গদ্যে লিখতে পারি, মুখে বলতে পারি— আর কবিতাতেই লিখতে পারবো না ? কেন কবিতায় জানালাকে জানালা বলবো না, বিছানাকে বিছানা ?...যত কথা আমাদের মুখের ভাষায় স্থান পেয়েছে... কাব্যসমাজ থেকে তাদের একঘরে ক'রে রেখে কেন আমরা আমাদের কবিতাকে এক বিপুল শব্দ-সম্ভার থেকে বঞ্চিত করবো ? মৌখিক ভাষার ইডিয়মগুলো ব্যবহার ক'রে কবিতাকে স্বাভাবিক ও সহজ ক'রে তুলবো না কেন ?... আমি তো বলি, ক্ষণিকার ভাষা, জীবনানন্দের কবিতার ভাষা purest বাংলা, কারণ তা বাংলা ছাড়া আর কিছু নয়।[১]

('প্রগতি'— ভাদ্র, ১৩৩৬, 'বাংলা কাব্যের ভবিষ্যৎ')

ইচ্ছে ক'রেই উদ্ধৃতি একটু দীর্ঘ করলাম, সেই সময়কার সাহিত্যিক আবহাওয়ার কিছু আভাস দেবার জন্য। আজকের দিনের পাঠক নিশ্চয়ই এ-কথা ভেবে অবাক হচ্ছেন যে কবিতায় 'ঠাণ্ডা' বা 'শাদা' কথাটার ব্যবহারের সমর্থনের জন্য এতগুলো বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন হ'তে পারে, কিন্তু এ-কথা সত্য যে গম্ভীর ভাবের কবিতায় দেশজ ও বিদেশী শব্দের এমন স্বচ্ছন্দ, সংগত ও প্রচুর ব্যবহার জীবনানন্দর আগে অন্য কোনো বাঙালি কবি করেন নি। মনে পড়ছে 'পাখিরা' কবিতা প্রথম পাঠেই আমাদের পক্ষে রোমাঞ্চকর হয়েছিলো 'স্কাইলাইটে'র জন্য, 'প্রথম ডিমে'র জন্য, 'রবারের বলের মতন' ছোটো বুকের জন্য, আর সেখানে 'লক্ষ লক্ষ মাইল ধ'রে সমুদ্রের মুখে' মৃত্যু ছিলো ব'লে। ওটা যে ঐকাহিক চমক-লাগানো ব্যাপার নয়, সপ্রাণ এবং সবীজ নূতনত্ব, এতদিনে সেটা নিঃসংশয়ে প্রমাণ হ'য়ে গেছে। এমনকি, মৌখিক ভাষায় প্রচলিত তৎসম শব্দেরও ব্যবহারজাত মালিন্য ঘুচিয়ে তাতে কাব্যের

স্পন্দন তিনি এনেছিলেন ; 'তোমার শরীর— তা-ই নিয়ে এসেছিলে একদিন', এই পঙ্‌ক্তিটি প'ড়ে আমি 'শরীর' কথাটাকে নতুন ক'রে আবিষ্কার করেছিলাম। তার আগে নায়িকাদের কোনো 'শরীরে'র অস্তিত্ব আমরা শুনি নি, শুনেছি 'দেহ', 'দেহলতা', 'তনুলতা', 'দেহবল্লরী'। এই উদাহরণ আমাদেরও রচনার সাহস বাড়িয়ে দিয়েছিলো।

তিন

কবে কোথায় জীবনানন্দকে প্রথম দেখেছিলাম মনে পড়ছে না। পাঁচ মিনিট দূরে থেকেও 'কল্লোল'-আপিশে তিনি আসতেন না, কিংবা কদাচ আসতেন ; অন্তত আমি তাঁকে কখনো সেখানে দেখি নি। হ্যারিসন রোডে তাঁর বোর্ডিঙের তেতলা কিংবা চারতলায় অচিন্ত্যকুমারের সঙ্গে একবার আরোহণ করেছিলাম মনে পড়ে, আর একবার কলেজ স্ট্রীটের ভিড়ের মধ্যে আমরা কয়েকজন তাঁকে অনুসরণ করতে করতে বউবাজারের মোড়ের কাছে এসে ধ'রে ফেলেছিলাম। কয়েকদিনের জন্য ঢাকায় এলেন একবার, মেঘলা দিনে মাঠের পথে ঘুরলাম তাঁর সঙ্গে ; পরে, তাঁর বিবাহের অনুষ্ঠানে, ঢাকার ব্রাহ্মসমাজে উপস্থিত আছি অজিত, আমি, অন্যান্য বন্ধুরা। কলকাতায় চ'লে আসার পর রমেশ মিত্র রোডের একতলা ঠাণ্ডা ঘরে তাঁর সঙ্গে বসে আছি, শীতকাল, বিকেল হ'য়ে এলো। হঠাৎ চেয়ার-টেবিল ন'ড়ে উঠলো, আমরা বাইরে ছোট্ট বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম, মিনিটখানেক পরে ফিরে এসে বসলাম আবার। পরের দিন কাগজে পড়লাম উত্তর বিহারে ভূমিকম্পের খবর।

কিন্তু এই সবই ঝাপসা স্মৃতি, এদের মধ্যে কোনো ধারাবাহিকতাও নেই। আসলে, জীবনানন্দর স্বভাবে একটি দুরতিক্রম্য দূরত্ব ছিলো— যে-অতিলৌকিক আবহাওয়া তাঁর কবিতার, তা-ই যেন মানুষটিকেও ঘিরে থাকতো সব সময়— তার ব্যবধান অতিক্রম করতে ব্যক্তিগত জীবনে আমি পারি নি, সমকালীন অন্য কোনো সাহিত্যিকও না। এই দূরত্ব তিনি শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন ; তিন বা চার বছর আগে সন্ধেবেলা লেকের দিকে তাঁকে বেড়াতে দেখতাম— আমি হয়তো পিছনে চলেছি, এগিয়ে গিয়ে কথা বললে তিনি খুশিও হতেন, অপ্রস্তুতও হতেন, আলাপ জমতো না ; তাই আবার দেখতে পেলে আমি ইচ্ছে ক'রে পেছিয়েও পড়েছি কখনো-কখনো, তাঁর নির্জনতা ব্যাহত করি নি। কখনো এলে বেশিক্ষণ বসতেন না, আর চিঠিপত্রেও তাঁর সেই রকম স্বভাব-সংকোচ। যুদ্ধের তৃতীয় বা চতুর্থ বছরে একবার আমরা পাক্ষিক সাহিত্যসভার ব্যবস্থা করেছিলুম ; তাতে, এ. আর. পি.র কর্মভার সত্ত্বেও, সুধীন্দ্রনাথ মাঝে-মাঝে আসতেন, কিন্তু জীবনানন্দ এসেছিলেন একবার মাত্র ; এসে, একটি কবিতা পড়ার জন্য বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হ'য়ে, অথবা তারই ফলে, আমাদের একটু অপ্রস্তুত ক'রে দিয়ে আকস্মিকভাবে বিদায় নিয়েছিলেন। তাঁর মুখে তাঁর নিজের কবিতাপাঠ আমি কখনো শুনি নি,

যদিও শুনেছি ইদানীং তরুণদের কাছে তাঁর সংকোচ কেটে গিয়েছিলো। অথচ, সেই 'প্রগতি'র সময় থেকে তাঁর সঙ্গে আমার সাহিত্যিক বন্ধুতা ও সাযুজ্য ছিলো বিরামহীন ; দেখাশোনায় যেটুকু হয়েছে তার চাইতে অনেক বেশি গভীর ক'রে তাঁকে পেয়েছি তাঁর রচনার মধ্যে— যার অনেকখানি অংশের সঙ্গে আমার পরিচয় প্রকাশের পূর্বেই ঘ'টে গেছে। এই সম্বন্ধ পঁচিশ বছরের মধ্যে শিথিল হয় নি ; 'কবিতা' প্রকাশেব অন্যতম পুরস্কার ছিলো আমার পক্ষে একসঙ্গে তিনটি-চারটি ক'রে পাঠানো তাঁর নতুন কবিতা পড়া ; আনন্দ পেয়েছি 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র প্রুফ দেখে, 'এক পয়সায় একটি' গ্রন্থমালায় 'বনলতা সেন' প্রকাশে তাঁর সম্মতি পেয়ে, তাঁর বিষয়ে লিখে, কথা ব'লে, তাঁকে আবৃত্তি ক'রে। বাংলা কবিতার যতগুলো পঙক্তি বা স্তবক আমার বিবর্ধমান বিস্মরণশক্তি এখনও হারিয়ে ফেলে নি, কিংবা পরিবর্তমান রুচি বর্জন করে নি, যেগুলোকে আমি বহু বছর ধ'রে অনেকটা রক্ষা-কবচের মতো মনে-মনে বহন ক'রে আসছি, তার মধ্যে জীবনানন্দর পঙক্তির সংখ্যা অনেক। সেই সব কবিতা বেঁচে আছে আমার মনে, অন্য অনেক পাঠকেরও মনে— ভাবী কালেও বেঁচে থাকবে ; তবু আজ এই কথা ভেবেই দুঃখ করি যে আমাদের পক্ষে স্বল্পপরিচিত সেই মানুষটিকে আর চোখে দেখবো না।

চার

জীবনানন্দর কবিতা নিয়ে ইতিপূর্বে কিছু-কিছু আলোচনা আমি করেছি ; আজ আবার প'ড়ে আরো কিছু নতুন কথা আমার মনে হচ্ছে। এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই যে ইন্দ্রিয়বোধের আনুগত্যে তিনি অতুলনীয়, রূপদক্ষতাই তাঁর চরিত্রলক্ষণ— আর এ-সব কথা পাঠকমহলে যথেষ্টরকম জানাজানিও হ'য়ে গেছে এতদিনে। কিন্তু তাঁর কবিতার মধ্যে দুটি ধারা দেখতে পাওয়া যায়, তারা যেন পরস্পরকে পরিপূরণ ক'রে চলেছে। একদিকে আমরা রাখতে পারি তাঁর বিশুদ্ধ ইন্দ্রিয়ানুভূতির কবিতা বর্ণনাধর্মী, অনুষঙ্গময়, নস্টালজিয়ায় পরাক্রান্ত : যেমন 'মৃত্যুর আগে', 'অবসরের গান', 'হাওয়ার রাত', 'ঘাস', 'বনলতা সেন', 'নগ্ন নির্জন হাত'— পাঠক আরো অনেক জুড়ে নিতে পারবেন— আমি 'নির্জন স্বাক্ষর' বা '১৩৩৩' ধরনের প্রেমের কবিতাকেও এরই অন্তর্গত করতে চাই। অন্য দিকে কাছে যে-সব কবিতা মননরূপী শয়তান অথবা দেবতার পরামর্শে লেখা, যেখানে লেখক বর্ণনার দ্বারা অন্য কিছু বলতে চেয়েছেন, যেখানে কবির আবেগ বাইরের জগতে প্রতিরূপ খুঁজে পেয়েছে, চিন্তার সঙ্গে গ্রথিত হ'য়ে আরো নিবিড়ভাবে জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখ করবো 'বোধ', 'ক্যাম্পে', আর সেই লাশ-কাটা ঘরের আশ্চর্য কবিতাটি, যার নাম দেয়া হয়েছিলো 'আট বছর আগের একদিন'। 'কয়েকটি লাইন'কে বলা যায় 'বোধ'-এর সঙ্গী-কবিতা— দুটিই কবির স্বগতোক্তি— প্রথমটিতে কবি নিজের শক্তির বিষয়ে সচেতন হ'য়ে ঘোষণা করছেন তাঁর নূতনত্ব ('কেউ যাহা জানে নাই— কোনো এক বাণী,/আমি ব'হে আনি'), ব'লে দিচ্ছেন তাঁর কাব্যের বৈশিষ্ট্য

কোনখানে ('উৎসবের কথা আমি কহি নাক',/পড়ি নাক' দুর্দশার গান/শুনি শুধু সৃষ্টির আহ্বান') ; আর দ্বিতীয়টিতে তিনি জীবনের সঙ্গে কাব্যের দ্বন্দ্বে পীড়িত, তাঁর 'বোধ' আর-কিছু নয়, তাঁরই কবিপ্রতিভা, যার তাড়নায় 'সকল লোকের মাঝে ব'সে আমার নিজের মুদ্রাদোষে আমি একা হতেছি আলাদা'। আবার, তাঁর আবেগরঞ্জিত বেদনাময় বর্ণনার কাব্যেও বিভিন্ন বিভাগ করা যায় : প্রথমত, সান্ধ্য বা নৈশ কবিতা, বা যে-কবিতায় সকল সময়কেই সন্ধ্যার মতো মনে হয়, যেখানে আলো ম্লান, ছায়া ঘন, কুয়াশার পরদা ঝুলে আছে ('মাঠের গল্প', 'হায় চিল', 'বনলতা সেন', 'কুড়ি বছর পরে', 'শঙ্খমালা') ; দ্বিতীয়ত, আলো যেখানে উজ্জ্বল আর প্রবল অবয়ব নিয়ে প্রকাশ পেয়েছে ('অবসরের গান', 'ঘাস', 'শিকার', 'সিন্ধু-সারস'), আর তৃতীয়ত, যে-সব কবিতায় একাধারে স্থান পেয়েছে আলো আর অন্ধকার, রৌদ্র আর রাত্রি, কান্তি আর অবগুণ্ঠন। এই শেষোক্ত শ্রেণীর মধ্যে 'মৃত্যুর আগে' কবিতাটিকে আমি ফেলতে চাই না, কেননা বাংলার পল্লীপ্রকৃতির এই চিত্রশালাটিতে 'হিজলের জানালায় আলো আর বুলবুলি'কে যদিও একবার দেখা যায়, আর 'ধানের গুচ্ছের মতো সবুজ সহজ' ভোরবেলাটিকেও চিনতে পারি, তবু এর পক্ষপাত নৈশতার দিকেই, পড়তে-পড়তে আমাদের মন বারে-বারেই ছায়াচ্ছন্ন গাঢ়তায় মন্থর হ'য়ে আসে। আমি ভাবছিলাম 'হাওয়ার রাত' বা 'অন্ধকার'-এর মতো কবিতার কথা, যেখানে তারা-ভরা অন্ধকারের কথা বলতে-বলতে কবির হৃদয় 'দিগন্তপ্লাবিত বলীয়ান রৌদ্রের আঘ্রাণে' ভ'রে যায়, যেখানে 'অন্ধকারের সারাৎসারে অনন্ত মৃত্যুর মতো মিশে থেকে' কবি হঠাৎ 'ভোরের আলোর মূর্খ উচ্ছ্বাসে' জেগে ওঠেন, দেখতে পান 'রক্তিম আকাশে সূর্য' আর 'সূর্যের রৌদ্রে আক্রান্ত এই পৃথিবী'। ভাবছিলাম 'নগ্ন নির্জন হাত'-এর বিস্ময়কর গঠনের কথা— কবিতাটির আরম্ভ অন্ধকারে, তার পটভূমিকাই ফাল্গুনের অন্ধকার, অথচ শেষের অংশে 'রক্তাভ রৌদ্রের বিচ্ছুরিত স্বেদ' আর 'রক্তিম গেলাসে তরমুজ মদ' আমাদের মনে এমন একটি প্রদীপ্ত সমৃদ্ধির অভিঘাত রেখে যায় যে মনেই হয় না পুরো কবিতাটিতে আলো ছাড়া, উজ্জ্বলতা ছাড়া অন্য কোনো প্রসঙ্গ আছে। যেমন 'হায় চিল'-এ দুপুরবেলাতেই সন্ধ্যা নেমে আসে, তেমনি 'হাওয়ার রাত' কবিতায় অন্ধকারটাই আলোর উল্লাসে উতরোল হ'য়ে উঠলো— 'মৃত্যুর আগে'র ছবিগুলোর মতো এ-সব ছবি স্বপ্রতিষ্ঠ নয়, তারা কবির ভাবনা-বেদনারই প্রতিফলন।

পাঁচ

আলোচনার আরো অনেক ক্ষেত্র আছে। দেখানো যেতে পারে, বিদ্রূপের শক্তি তাঁর হাতে কী-রকম আত্মস্থ আর গম্ভীর হ'য়ে উঠেছিলো 'সোনার পিত্তলমূর্তি' অথবা 'অজর, অক্ষর অধ্যাপকে'র উদ্দেশে লেখা পঙক্তিগুলিতে,[২] কিংবা কেমন ক'রে আলোছায়ার দৃশ্যমান জগৎ থেকে তিনি স্বপ্নগোচর অতিবাস্তবের মায়ালোকে প্রবেশ করেছিলেন 'বিড়াল', 'ঘোড়া', 'সেই সব শেয়ালেরা' ধরনের কবিতায়।

শেলি, কীটস্‌, পূর্ব-ইয়েটস আর কোথাও-কোথাও সুইনবার্নকে তিনি কেমন ক'রে ব্যবহার করেছিলেন তা তুলনার দ্বারা দেখানো যেতে পারে; সহজেই প্রমাণ করা যায় যে ইয়েটস-এর 'O Curlew'-র তুলনায় তাঁর 'হায় চিল' অনেক বেশি তৃপ্তিকর কবিতা, আর 'The Scholars'-এর সঙ্গে 'সমারূঢ়ে'র সম্বন্ধ যেমন স্পষ্ট, তার স্বাতন্ত্র্যও তেমনি নির্ভুল। 'ওড টু এ নাইটিঙ্গেল'-এর কোনো-কোনো পঙক্তি 'অবসরের গান'-এ কেমন নতুন শস্য হ'য়ে ফ'লে উঠেছে, তাও সহজেই বোধগম্য। যদি কখনো কোনো পাঠক জীবনানন্দর অসংরক্ত, অ-মানবিক জগতে শ্রান্তি বোধ করেন, তাঁকে অনুরোধ করা যায় 'ক্যাম্পে' আর 'আট বছর আগের একদিন' পুনর্বার পড়তে— জীবনানন্দর সমগ্র কাব্যের মধ্যে এই দুটি কবিতা সবচেয়ে প্রাণতপ্ত ও স্তরবহুল; এখানে তিনি মানুষের ঘুম আর জাগরণকে একই রকম 'সচ্ছল'ভাবে মেনে নিয়ে তৃপ্ত হন নি ('জাগিবার কাল আছে— দরকার আছে ঘুমাবার;/এই সচ্ছলতা আমাদের'), নিজের কথা নিজে লঙ্ঘন ক'রে উৎসবের কথা বলেছেন, ব্যর্থতার গানও গেয়েছেন। 'ক্যাম্পে' কবিতায় মৃগয়ার গল্প অবলম্বন ক'রে প্রেমের ভয়াবহ গম্ভীর স্তম্ভ' তুলেছেন তিনি, মানবিক প্রেমের, যৌন প্রেমের, যা ব্যাপ্ত হ'য়ে আছে 'কোথাও ফড়িঙে কীটে, মানুষের বুকের ভিতরে', যার ক্ষমতার চাপে ক্ষমতাশালী মাংসাশী শিকারিদেরও হৃদয়গুলো 'বসন্তের জ্যোৎস্নায় মৃত মৃগদের' মতোই পাংশু হ'য়ে প'ড়ে থাকে। আর, 'মৃত্যুকে দলিত ক'রে' 'জীবনের গভীর জয়' তিনি প্রচার করেছেন 'আট বছর আগের একদিন'-এ। এই কবিতাটি এতই দ্যোতনাময় যে এটিকে ভাঁজে-ভাঁজে খুলে দেখালে আলোচনার সহায় হ'তে পারে। এর আরম্ভ— 'শোনা গেল লাসকাটা ঘরে/নিয়ে গেছে তারে।' ক্রমশ আমরা জানতে পারলাম যে কোনো-এক পুরুষ উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করেছে— আর এই খবরটি শুনেই কবি অনুভব করলেন— মৃত্যুকে নয়, তাঁর চারদিকে চাঁদ-ডুবে-যাওয়া অন্ধকারে 'জীবনের দুর্দান্ত নীল মত্ততা'কে :

> তবুও তো পেঁচা জাগে ;
> গলিত স্থবির ব্যাং আরো দুই মুহূর্তের ভিক্ষা মাগে
> আরেকটি প্রভাতের ইসারায়— অনুমেয় উষ্ণ অনুরাগে।
>
> টের পাই যূথচারী আঁধারের গাঢ় নিরুদ্দেশে
> চারিদিকে মশারির ক্ষমাহীন বিরুদ্ধতা
> মশা তার অন্ধকার সঙ্ঘারামে জেগে থেকে জীবনের স্রোত ভালোবাসে।

মনে পড়লো বাঁচার ইচ্ছার, বাঁচার চেষ্টার অন্যান্য উদাহরণ :

> রক্ত ক্লেদ বসা থেকে রৌদ্রে ফের উড়ে যায় মাছি ;
> সোনালি রোদের ঢেউয়ে উড়ন্ত কীটের খেলা কতো দেখিয়াছি।...
> দুরন্ত শিশুর হাতে ফড়িঙের ঘন শিহরন
> মরণের সাথে লড়িয়াছে ;

কিন্তু এই প্রাকৃত প্রেরণা মানুষের পক্ষে তো সর্বস্ব নয় :

> চাঁদ ডুবে গেলে পর প্রধান আঁধারে তুমি অশ্বত্থের কাছে
> একগাছা দড়ি হাতে গিয়েছিলে তবু একা-একা ;
> যে-জীবন ফড়িঙের, দোয়েলের— মানুষের সাথে তার হয় নাকো দেখা
> এই জেনে।

হয়তো গাছের ডাল প্রতিবাদ করেছিলো, ভিড় ক'রে বাধা দিয়েছিলো জোনাকিরা, থুরথুরে অন্ধ প্যাঁচা ইঁদুর ধরার প্রস্তাব এনে জীবনের 'তুমুল গাঢ় সমাচার' জানিয়েছিলো —কিন্তু চেতনার সংকল্পে প্রকৃতি বাধা দিতে পারলো না।

এর পর অনিবার্য প্রশ্ন : কেন মরলো লোকটা ? কোন দুঃখে ? কিসের ব্যর্থতায় ? না— কোনো দুঃখই ছিলো না ; স্ত্রী ছিলো, সন্তান ছিলো, প্রেম ছিলো, দারিদ্র্যের গ্লানিও ছিলো না। কিন্তু—

> জানি— তবু জানি
> নারীর হৃদয়— প্রেম— শিশু— গৃহ— নয় সবখানি ;
> অর্থ নয়, কীর্তি নয়— সচ্ছলতা নয়—
> আরো-এক বিপন্ন বিস্ময়
> আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে
> খেলা করে ;
>
> আমাদের ক্লান্ত করে
> ক্লান্ত— ক্লান্ত করে ;
> লাসকাটা ঘরে
> সেই ক্লান্তি নাই ;
> তাই...

যদি এই অচিকিৎস্য জীবন-ক্লান্তিতেই কবিতার শেষ হ'তো, তাহ'লে এটি এত দূর পর্যন্ত আলোচ্য হ'তো না। কিন্তু ঠিক শেষের ক-লাইনেই আবার আমরা অন্য একটি স্বর শুনলাম— যেন একটি ঢেউ স'য়ে যেতে যেতে দ্বিগুণ বেগে ফিরে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো— কবি ফিরিয়ে আনলেন জরাজীর্ণ প্যাঁচাটাকে, যে আত্মহত্যায় বাধা দিতে পারে নি, কিন্তু জীবিতের কানে অবিরাম জ'পে যাচ্ছে তার প্রাণসত্তার আদিম আনন্দ। আর এই প্রগাঢ় পিতামহীর দৃষ্টান্তেই কবি উদ্বুদ্ধ হলেন— 'আমরা দু-জনে মিলে শূন্য ক'রে চ'লে যাবো জীবনের প্রচুর ভাঁড়ার' —মৃত্যু পার হ'য়ে বেজে উঠলো জীবনের জয়ধ্বনি, আর— সেইসঙ্গে— নির্বোধ ও পাশব জীবনের প্রতি চৈতন্যের বিদ্রূপ।

ছয়

তাঁর উপমা, বিশেষণ ও ভাষাপ্রয়োগ নিয়ে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ রচিত হ'তে পারে। যেহেতু তিনি মুখ্যত ইন্দ্রিয়বোধের কবি, তাই উপমা তাঁর পক্ষে একটি প্রধান অবলম্বন, তাঁর হাতে বিশেষণও অনেক সময় উপমার মতো কর্মিষ্ঠ। 'শিকার' কবিতায় বত্রিশটি পঙক্তির মধ্যে পাওয়া যাবে চোদ্দটি উপমা, 'মতো' শব্দের তেরো বার ব্যবহার; 'হাওয়ার রাত'-এ 'মতো'-র সংখ্যা আট। এতে যাঁরা আপত্তি করেন তাঁদের ভেবে দেখতে বলবো, ভিন্ন বস্তুর সঙ্গে তুলনা বা সমীকরণ ছাড়া বর্ণনার কোনো উপায় আছে কিনা, যে-কোনো কবিতায় কতখানি ছবি থাকে, আর কবি যদি জ্ঞানের ভাষায় কথা বলতে যান তাহ'লে তিনি কবি থাকেন আর কতটুকু। আর দুটি কথা বিবেচ্য : জীবনানন্দ একটিও উপমা প্রয়োগ না-ক'রে 'আকাশলীনা' ('সুরঞ্জনা, ঐখানে যেয়ো নাকো তুমি') বা 'সমারূঢ়' ('বরং নিজেই তুমি লেখো নাকো একটি কবিতা')-র মতো অজর কবিতা লিখেছেন ;[৩] আর তাঁর অনেক উপমাই সরল বা আক্ষরিক নয়, তা থেকে নানা স্তরে নানা ইঙ্গিত বিচ্ছুরিত হ'তে থাকে, যেমন গানের পরে অনুরণন। কাস্তের মতো চাঁদ, রবারের বলের মতো বুক, বরফের কুচির মতো স্তন— এইসব উপমার উপর আমি জোর দেবো না, কেননা এদের নির্ভর শুধু চোখে-দেখা বা হাতে-ছোঁয়া সাদৃশ্যের উপর, তাঁর আগে কেউ ব্যবহার করেন নি ব'লেই এরা স্মরণীয়। আমি উল্লেখ করবো আরো আগেকার লেখা একটি পঙক্তি—

আঁখি যার গোধূলির মতো গোলাপি, রঙিন—

পড়ামাত্রই আমাদের মনে যে-নূতনত্বের চমক লাগে সেটা অচিরেই কাটিয়ে উঠে আমরা বুঝতে পারি যে এখানে ঠিক লাল রঙের চোখটাকে বোঝানো হচ্ছে না, সন্ধ্যারাগের মদির আবেশের দিকেই এর লক্ষ্য, আর সঙ্গে-সঙ্গে মনে প'ড়ে যায় গোধূলির সঙ্গে বিবাহ-লগ্নের সংযোগ। 'মোরগ ফুলের মতো লাল আগুন' —এটা হ'লো চাক্ষুষ উপমা কিন্তু সেই আগুনই যখন সূর্যের আলোয় 'রোগা শালিকের হৃদয়ের বিবর্ণ ইচ্ছার মতো' হ'য়ে যায়, তখন শুধু ফ্যাকাশে চেহারাটাই আমরা চোখে দেখি না, মনের মধ্যেও নির্বাপণের বেদনা অনুভব করি। কী উপমায়, কী বিশেষণে, একটি ইন্দ্রিয়ে আঘাত দিয়ে অন্য ইন্দ্রিয় জাগিয়ে তোলেন তিনি— 'ঘাসের ঘ্রাণ হরিৎ মদের মতো পান' করতে হ'লে বর্ণ, গন্ধ আর আস্বাদকে পরস্পরের মধ্যে মিশিয়ে দিতে হয় ; 'বলীয়ান রৌদ্র' বললে রোদ যেন আয়তন পেয়ে ঋজু হ'য়ে দাঁড়িয়ে ওঠে, আবার সেই রোদকেই 'কচি লেবুপাতার মতো' নরম আর সবুজ বললে তাকে দেখা যায় তখনও-শিশির-শুকিয়ে-না-যাওয়া মাটির উপর সুগন্ধি হ'য়ে শুয়ে থাকতে। এরই পাশে-পাশে 'পরদায় গালিচায় রক্তাভ রৌদ্রের স্বেদ' আর সন্ধ্যাবেলায় 'জাফরান রঙের সূর্যের নরম শরীর' চিন্তা করলে রোদ বস্তুটাকে আমরা যেন কোনো স্থাপত্যকর্মের মতো প্রদক্ষিণ ক'রে-ক'রে দেখে নিতে পারি। তেমনি, রাত্রি কখনো

'বিরাট নীলাভ খোঁপা নিয়ে যেন নারী মাথা নাড়ে', কখনো 'জ্যোৎস্নার উঠানে খড়ের চালের ছায়া'টুকুর মধ্যে স্তব্ধ ও সংহত, কখনো 'নক্ষত্রের রুপালি আগুনে' উজ্জ্বল, আর কখনো দেখি সন্ধ্যার অন্ধকার 'ছোটো-ছোটো বলের মতো' পৃথিবীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো। যে-দুটো বস্তু স্বভাবতই খুব কাছাকাছি তাদের মধ্যে উপমাসম্বন্ধ অপ্রচলিত কিন্তু জীবনানন্দ কখনো-কখনো তাদের একত্র ক'রে দুটোকেই আরো স্পষ্ট ক'রে ফোটাতে পেরেছেন ('কাঁচা বাতাবির মতো ঘাস', 'শিশিরের শব্দের মতন সন্ধ্যা') ; আবার, যে-দুটো বস্তু অপরিমেয়রূপে অ-সদৃশ, তাদেরও একসূত্রে বেঁধে দিয়েছে তাঁর বিরাট কল্পনাশক্তি, যার ফলে আমরা পেয়েছি 'চীনেবাদামের মতো বিশুষ্ক বাতাস', 'পাখির নীড়ের মতো' বনলতা সেনের চোখ, আর আত্মঘাতীর জানলার ধারে 'অদ্ভুত আঁধারে···উটের গ্রীবার মতো কোনো এক' প্রবল নিস্তব্ধতা। এ-সব উপমা ইন্দ্রিয়ের সীমা অতিক্রম ক'রে ভাবনার মধ্যে আন্দোলন তোলে, সাদৃশ্যের সূত্রগুলি ছড়িয়ে পড়ে অনুভূতির রহস্যলোকে। বউবাজারের নৈশ ফুট-পাতে, যেখানে কুষ্ঠরোগী, 'লোল নিগ্রো' আর 'ছিমছাম ফিরিঙ্গি যুবকে'র ছায়াছবির উপর ইহুদি গণিকার আধো-জাগা গানের গলা ঝ'রে পড়ছে, সেখানকার বাতাস নেহাৎই প্রাকৃত অর্থে শুকনো নয়, যুদ্ধকালীন বিশৃঙ্খলার চাপে দেশের মধ্যে সমস্ত রস শুকিয়ে গিয়ে চীনেবাদামের খোলার মতো শূন্য আর ভঙ্গুর হ'য়ে উঠলো, এই রকম একটা ইঙ্গিত এখানে পাওয়া যায়। কোনো মহিলার চোখের আকার নিশ্চয়ই পাখির বাসার মতো হয় না, কিন্তু ক্লান্ত প্রাণের পক্ষে কখনো কোনো চোখ আশ্রয়ের নীড় হ'তে পারে। যে-মানুষ আপন হাতে মরতে চলেছে তার জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দিলো 'উটের গ্রীবার মতো' নিস্তব্ধতা, এই অপরিচিত ও অপ্রত্যাশিত ছবিতে আসন্ন আত্মঘাতের আবহাওয়াটা আরো থমথমে ও ঘনিষ্ঠ হ'য়ে উঠলো। হয়তো এখানে আরো কিছু ইঙ্গিত আছে, এই 'উট' যেহেতু মৃত্যুর দিকেই প্রলুব্ধ করছে, তাই মনে হয় উপমাটি সেই প্রাচীন কাহিনী থেকে আহৃত, যেখানে উট এসে প্রথমে শুধু ঘাড়টুকু রাখার অনুমতি চাইলো, তারপর প্রকাণ্ড শরীর নিয়ে সমস্ত ঘর জুড়ে গৃহস্থকেই বহিষ্কৃত ক'রে দিলে। অনেক বিশেষণও এই রকম মনস্তত্ত্বঘটিত : আত্মহত্যার উদ্‌যোগের সময় অশ্বত্থের 'প্রধান আঁধার', জীবনপ্রেমিক মশক-সংঘে সমাকীর্ণ 'যূথচারী আঁধার', শিকারের পরে শিকারিদের 'নিরপরাধ' ঘুম, 'প্রগাঢ় পিতামহী' প্যাঁচার জীবনস্পৃহার 'তুমুল গাঢ় সমাচার'।

'সমাচার' কথাটাও লক্ষণীয়। মিশনারিরা 'গসপেল'-এর আক্ষরিক অনুবাদ করেন 'সুসমাচার' -- এ-কথা মনে রাখলেই ধরা পড়ে যে শব্দটিতে এখানে 'খবরে'র চাইতে অনেক বেশি কিছু বোঝাচ্ছে। শুধু বিশেষণে নয়, বিশেষ্যপদেও, আর সাধারণভাবে ভাষাব্যবহারে তাঁর দুঃসাহসী আক্রমণ বারে-বারেই রত্ন ছিনিয়ে এনেছে বিদেশী শব্দ, গেঁয়ো শব্দ, কথ্য বুলি, অপ্রচলিত শব্দ, আর যে-সব শব্দকে আশাহীন-রূপে গদ্য ব'লে আমরা জেনেছি— এইসব ভাণ্ডারের উপর সহজ অধিকার তাঁর কাব্যের একটি প্রধান লক্ষণ। ছন্দব্যবহারে বৈচিত্র্য নেই, আপাতরমণীয়তাও নেই,

কিন্তু সেজন্যে কোনো অভাববোধও নেই আমাদের ; যা আছে, তার সম্মোহন এত ব্যাপক যে তিনি আজকের দিনেও অনায়াসে এবং অনাক্রমণীয়ভাবে 'ছিল-দেখিল' মিল দিতে পেরেছেন, যা অন্য কোনো কবির পক্ষেই সম্ভব হ'তো না। তাঁর কাব্যের পাঠক শুধু বিশেষণের প্রভাবে আবিষ্ট হবেন বার-বার, শিহরিত হবেন পুনরুক্তির আঘাতে ('এইখানে সরোজিনী শুয়ে আছে, জানি না সে শুয়ে আছে কিনা' ; 'ঘাসের উপর দিয়ে ভেসে যায় সবুজ বাতাস/অথবা সবুজ বুঝি ঘাস'), মুগ্ধ হবেন যখন হঠাৎ এক-একটি অত্যন্ত চেনা আর গদ্যধর্মী কথার প্রভাবে পুরো পঙক্তিটি আলোকিত হ'য়ে ওঠে।

> আমি সেই সুন্দরীরে দেখে লই— নুয়ে আছে নদীর এ-পারে
> বিয়োবার দেরি নাই— রূপ ঝ'রে পড়ে তার—
> শীত এসে নষ্ট ক'রে দিয়ে যাবে তারে :

ভব্য সমাজে অনুচ্চার্য একটি ক্রিয়াপদের জন্যই হেমন্ত ঋতুর এই ছবিটি এমন উজ্জ্বল হ'তে পারলো। তেমনি, বিকেলের আলোর স্বচ্ছ গভীরতায়, শুধু বাইরের প্রকৃতি নয়— আমাদের হৃদয় সুদ্ধ ডুবে গেলো শুধু একটা 'মাইল' শব্দ আছে ব'লে—

> অকূল সুপুরিবন স্থির জলে আলো ফেলে এক মাইল শান্তি কল্যাণ
> হয়ে আছে।

দৃশ্যটিকে 'এক মাইলে'র মধ্যে সীমিত করা হয়েছে ব'লেই এখানে অসীমের আভাস লাগলো।

উদাহরণ আর বাড়াতে চাই না, কিন্তু এটুকু না-বললে আমার বক্তব্য সম্পূর্ণ হয় না যে তাঁর কাব্যে গদ্য ভাষা এমনভাবে নিবিষ্ট হয়েছিলো যে রীতিমতো বিপজ্জনক শব্দও তাঁর আদেশে বিশ্বস্ত ভৃত্যের মতো কাজ ক'রে গেছে—

> হলুদ কঠিন ঠ্যাং উঁচু ক'রে ঘুমোবে সে শিশিরের জলে
>
> প্রেম ছিলো, আশা ছিলো,...তবু সে দেখিল
> কোন্ ভূত ?

বলা বাহুল্য, 'ভূত' বা 'ঠ্যাং'-এর মতো শব্দের ব্যবহার অন্য যে-কোন কবির পক্ষে হাস্যকর হ'তো।

সাত

তাঁর অনন্যতা বিষয়ে অনেক পাঠকই আজকের দিনে সচেতন, আর তিনি যে আমাদের 'নির্জনতম' কবি, অত্যধিক পুনরুক্তিবশত এই কথাটার ধার ক্ষ'য়ে গেলেও এর যাথার্থ্যে আমি এখনও সন্দেহ করি না। 'আমার মতন কেউ নাই আর' —তাঁর এই স্বগতোক্তি প্রায় আক্ষরিক অর্থেই সত্য। যৌবনে, যখন মানুষের মন

স্বভাবতই সম্প্রসারণ খোঁজে, আর কবির মন বিশ্বজীবনে যোগ দিতে চায়, সকলের সঙ্গে মিলতে চায় আর সকলের সঙ্গে বিলিয়ে দিতে চায় নিজেকে, সেই নি'ঝরের স্বপ্নভঙ্গের ঋতুতেও তিনি বুঝেছেন যে তিনি স্বতন্ত্র, 'সকল লোকের মধ্যে আলাদা', বুঝেছেন যে তাঁর গান জীবনের 'উৎসবের' বা 'ব্যর্থতার' নয়, অর্থাৎ বিদ্রোহের, আলোড়নের নয়— তাঁর গান সমর্পণের, আত্মসমর্পণের, স্থিরতার। 'পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত' রোমাণ্টিক হ'য়েও, তাই, তিনি ভাবের দিক থেকে রোমাণ্টিকের উল্টো[৪]; আধুনিক বাংলা কাব্যের বিচিত্র বিদ্রোহের মধ্যে তাঁকে আমরা দেখতে পাই না। বস্তুত, তাঁকে যেন বাংলা কাব্যের মধ্যে আকস্মিকরূপে উদ্ভূত ব'লে মনে হয়; সত্যেন্দ্রনাথ ও নজরুল ইসলামের ক্ষণিক প্রভাবের কথা বাদ দিলে— তিনি যে মহাভারত থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত প্রবাহিত তাঁর পূর্বজ স্বদেশীয় সাহিত্যের কোনো অংশের দ্বারা কখনো সংক্রমিত হয়েছিলেন, বা কোনো পূর্বসূরির সঙ্গে তাঁর একাত্মবোধ জন্মেছিলো, এমন কোনো প্রত্যক্ষ পরিচয় তাঁর কাব্যে নেই বললেই চলে। এ থেকে এমন কথাও মনে হ'তে পারে যে তিনি বাংলা কাব্যের ঐতিহ্যস্রোতের মধ্যে একটি মায়াবী দ্বীপের মতো বিচ্ছিন্ন ও উজ্জ্বল; এবং বলা যেতে পারে যে তাঁর কাব্যরীতি— 'হুতোম' অথবা অবনীন্দ্রনাথের গদ্যের মতো— একেবারেই তাঁর নিজস্ব ও ব্যক্তিগত, তাঁরই মধ্যে আবদ্ধ, অন্য লেখকের পক্ষে সেই রীতির অনুকরণ, অনুশীলন বা পরিবর্ধন সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে, এ-বিষয়েও সন্দেহ নেই যে চলতিকালের কাব্যরচনার ধারাকে তিনি গভীরভাবে স্পর্শ করেছেন, সমকালীন ও পরবর্তী কবিদের উপর তাঁর প্রভাব কোথাও-কোথাও এমন সূক্ষ্মভাবে সফল হ'য়ে উঠেছে যে বাইরে থেকে হঠাৎ দেখে চেনা যায় না। বাংলা কাব্যের ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর আসনটি ঠিক কোথায় সে-বিষয়ে এখনই মনস্থির করা সম্ভব নয়, তার কোনো প্রয়োজনও নেই এই মুহূর্তে; এই কাজের দায়িত্ব আমরা তুলে দিতে পারি আমাদের ঈর্ষাভাজন সেই সব নাবালকদের হাতে, যারা আজ প্রথম বার জীবনানন্দর স্বাদুতাময় আলো-অন্ধকারে অবগাহন করছে। আপাতত, আমাদের পক্ষে, এই কথাই কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মর্তব্য যে 'যুগের সঞ্চিত পণ্যে'র 'অগ্নিপরিধি'র মধ্যে দাঁড়িয়ে যিনি 'দেবদারু গাছে' 'কিন্নরকণ্ঠ' শুনেছিলেন, তিনি এই উদ্‌ভ্রান্ত, বিশৃঙ্খল যুগে ধ্যানী কবির উদাহরণস্বরূপ।

১৯৫৫ 'কালের পুতুল'

ভাষা, কবিতা ও মনুষ্যত্ব

একমাত্র মানুষের ভাষা আছে, এবং মানুষমাত্রেরই ভাষা আছে। সমস্ত জীবজগতে অন্য কারো ভাষা নেই।

জীবের কাছে প্রকৃতির চাহিদা এই যে সে বংশানুক্রমে পৃথিবীতে টি'কে থাকবে। এই চাহিদা মেটাবার জন্য ভাষার কোনো প্রয়োজন হয় না। আত্মরক্ষা, প্রজনন ও সন্তানপালন— এই তিন কর্মই বিনা ভাষায় সম্পন্ন ও সুসম্পন্ন হ'তে পারে।

এমনকি মানুষের পক্ষেও ভাষা ব্যতিরেকে ক্ষুধা ও তৃষ্ণা ব্যক্ত করা সম্ভব, এবং যৌন কামনা জানাতে ও জাগাতে হ'লে বরং ভাষার চেয়ে কটাক্ষই বেশি কাজে লাগে। শিকার বা যুদ্ধ যখন মানুষের জীবিকার উপায় ছিলো তখন চীৎকার তার বলবৃদ্ধি করেছে, এবং সন্তানের জন্মের ভূমিকাস্বরূপ আজ পর্যন্ত নরনারীর কণ্ঠ যা উচ্চারণ ক'রে থাকে, আমাদের পূর্বপুরুষ তার নাম দিয়েছিলেন শীৎকার। চীৎকার বা শীৎকার, এর কোনোটাকেই ভাষা বলে না।

প্রজাপতির সংকল্পপূরণ ভাষানিরপেক্ষ ব্যাপার। দুই অংশিদার, পরস্পরের ভাষা না-জেনেও, পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব লাভ করতে পারে। যদি আণবিক অস্ত্রে মানবজাতির ধ্বংস ঘটে, টি'কে থাকে শুধু কতিপয় কাফ্রি পুরুষ ও কতিপয় এস্কিমো নারী, তাহলে— যদি ঐ দু-দলে সাক্ষাৎ হয়— তারাই মানবজাতিকে আসন্ন লুপ্তি থেকে বাঁচাতে পারবে না তা নয়। তারা পরস্পরের সঙ্গে কথা বলতে পারে না ব'লে সেই মহৎ কর্মে বিঘ্ন হবে না।

অন্যান্য প্রাণীর গলা দিয়েও আওয়াজ বেরোয়। খিদে পেলে, আঘাত পেলে, কামের বা বাৎসল্যের আবেগে অধিকাংশ স্থলচর পশু নিজ-নিজ বিধিবদ্ধ ধ্বনিসমষ্টি ব্যবহার ক'রে থাকে। পুরুষ-পাখি ইনিয়ে-বিনিয়ে সঙ্গিনীকে আহ্বান করে, আমাদের কানে তা সুশ্রাব্য ব'লে বোধ হয়, আমরা তার নাম দিয়েছি 'গান'। কিন্তু সেই ধ্বনিসমূহের পরপারে, অন্য এক দিগন্তে, মানুষের ভাষার উদয় হয়েছিলো।

পিঁপড়ে ও মৌমাছি সংঘবদ্ধ সামাজিক জীবন যাপন করে; মৌচাক বা বল্মীকের গঠনপটুত্ব অস্বীকার করা যায় না। এই প্রাণীদের বিষয়ে বিস্ময়কর তথ্য বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন। এরা ব্যূহরচনা জানে, পারে দূরে কাছে খবর পাঠাতে, বিপৎকালে স্বজাতিকে সতর্ক ক'রে দিতে। অর্থাৎ, সামাজিক জীবন ভাষা বিনাও সম্ভব।

সরকারী ভাষা-কমিশনের বিবৃতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

দুই

ভারতীয় ভাষা-কমিশনের যে-বিবৃতি সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে তার মুখবন্ধের সংস্কৃত বচন উদ্ধৃতিযোগ্য :

…যদ্বৈ বাঙ্‌ নাভবিষ্যৎ ন ধর্মো নাধর্মো ব্যজ্ঞাপয়িষ্যৎ ন সত্যং নানৃতং ন সাধু নাসাধু ন হৃদয়জ্ঞো নাহৃদয়জ্ঞো বাগেবৈতৎ সর্বং বিজ্ঞাপয়তি বাচমুপাস্স্বেতি।

(ছান্দোগ্য-উপনিষদ্‌ (৭।২।১)

যদি বাক্‌ না থাকতো তবে ধর্ম বা অধর্ম বিজ্ঞাপিত হ'তো না ; সত্য বা অসত্য, শুভ বা অশুভ, মনোজ্ঞ বা অমনোজ্ঞ— কিছুই বিজ্ঞাপিত হ'তো না। বাক্‌কে উপাসনা করো।

বাক্‌ যদি উপাস্য হয় তা কি শুধু এইজন্য যে তার অভাবে 'কিছুই বিজ্ঞাপিত হ'তো না' ? ভাষা ছাড়া কিছুই জানা যায় না, এ-কথা কি সত্য ? নিমের পাঁচন মুখে পড়লেই আমরা জানতে পারি সেটা মনোজ্ঞ নয়, আর মধু যে মনোজ্ঞ তার প্রমাণ রসনাতেই নির্ভুলভাবে পাওয়া যায়। ভঙ্গিতে ও চোখের দৃষ্টিতে মিথ্যা ধরা পড়ে ; শীতে আচ্ছাদন বা তৃষ্ণার জল যে শুভ বস্তু তা স্বতই ও সেই মুহূর্তেই বিজ্ঞাপিত হ'য়ে থাকে। যে-লোকটার এইমাত্র পকেট কাটা গেলো তাকে ধর্ম ও অধর্মের তফাৎ বোঝাবার জন্য শাস্ত্র প'ড়ে শোনাতে হয় না। অতএব, যদিও উপনিষদের বচন, ভাষার এই সংজ্ঞার্থ অগ্রাহ্য।

কিন্তু উপনিষদ্‌-সমূহেই ভাষা বিষয়ে অন্য যে-সব বাণী আছে, সেগুলিকে উপেক্ষা ক'রে যে ভাষা-কমিশন এই বিশেষ বচনটিকে বীজমন্ত্ররূপে গ্রহণ করেছেন —তা দৈবাৎ নয়, রীতিমতো সুচিন্তিতভাবে। ভাষা বিষয়ে অধিকাংশ সদস্যের যা মনোভাব— ভাষা বলতে তাঁরা যা বোঝেন— তার নিকটতম সংহত রূপ এই বচনে বিধৃত আছে। সে-মনোভাব তাঁদের ২৬৯ পৃষ্ঠাব্যাপী দীর্ঘায়িত আলোচনার মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে কাজ ক'রে যাচ্ছে, এবং ২৬৯ পৃষ্ঠা ধ'রে যে-কথা তাঁরা প্রচ্ছন্ন রেখেছেন তা স্পষ্টভাবে, নির্ভুলভাবে প্রকট হ'য়ে উঠেছে গ্রন্থের সর্বশেষ অনুচ্ছেদটিতে :

Language is in a sense profoundly important and in another sense of little or no consequence ! It is important at the level of instrumentality. It is a loom on which the life of a people is woven. It is, however, of no intrinsic consequence in itself because it is essentially an instrumentality : the loom, not the fabric ; only a vehicle of thought and not thought itself ; a receptacle ; for the traditions, usages and cultural memories of a people, but not their substance. It is not language but education that is aimed at in the schools ; it is not language but good government that is aimed at in the field of public administration ; it is not language but justice

that is sought in the law courts. That which lends itself to the most convenience is the correct solution of the language problem in the various fields. Surely, there does not have to be heat and passion over the issue of Language, ever the instrumentality and not the substance! (ভাষা-কমিশনের রিপোর্ট : পরিচ্ছেদ ১৫, অনুচ্ছেদ ১৮, পৃ ১৬৯)

ভাবানুবাদ :

ভাষা এক অর্থে অত্যন্ত বেশি জরুরি, অন্য অর্থে এতে প্রায় কিছুই এসে যায় না! ভাষা যেখানে যন্ত্র সেখানে তা মূল্যবান। ভাষা সেই তাঁত, যাতে জাতির জীবন বোনা হ'য়ে থাকে। কিন্তু তার নিজস্ব মূল্য কিছু নেই, কেননা তা সারত একটি যন্ত্র মাত্র, শুধু তাঁত, বস্ত্র নয়, শুধু চিন্তার বাহন কিন্তু চিন্তা নয় ; একটি জাতির আচার, ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক স্মৃতির আধার, কিন্তু তাদের সারবস্তু নয়। বিদ্যালয়ে আমাদের লক্ষ্য ভাষা নয়, শিক্ষা : সরকারি কর্মের ক্ষেত্রে আমাদের যা লক্ষ্য তা ভাষা নয়, সুশাসন ; আদালতে আমাদের লক্ষ্য ভাষা নয়, সুবিচার। সুবিধা যাতে সর্বাধিক, বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভাষাসমস্যার সেটাই নির্ভুল সমাধান। ভাষার প্রশ্ন নিয়ে নিশ্চয়ই হৃদয়াবেগ ও উত্তেজনার প্রয়োজন করে না— যে-ভাষা কখনোই সারবস্তু নয়, শুধু যন্ত্র।

অনুচ্ছেদটির প্রথম ও শেষ বাক্যে একেবারে সরলভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে ভাষা নামক বস্তুটা কোনো বস্তুই নয়, তাতে প্রায় কিছুই এসে যায় না। এই বক্তব্যকে জোরালো ক'রে তোলার জন্য এর প্রণেতাগণ দু-দুটি অবজ্ঞাসূচক বিস্ময়চিহ্নেও বিদ্ধ করেছেন একে— যেন ভাষা ব্যাপারটাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে চান। 'Instrument'-এর বদলে 'instrumentality' ব'লে ঠিক কী তফাৎ করা হ'লো, তা বোঝার মতো সুগভীর ইংরেজি জ্ঞান আমার নেই ; কিন্তু এ-কথা সহজেই অনুমেয় যে 'যন্ত্র'রূপে স্বীকার করলেও যেটুকু স্বকীয় মর্যাদা দিতে হয় তাও তাঁরা ভাষাকে দিতে নারাজ, তাকে তাঁরা অতি কষ্টে মানতে পারেন বড়ো জোর একটি 'যান্ত্রিকতা' হিশেবে - যা সম্পূর্ণ নির্বস্তুক, বিমূর্ত, প্রায় অস্তিত্বহীন। কিন্তু শব্দপ্রয়োগের সূক্ষ্ম বিচারে যদি প্রবৃত্ত না-ও হই, তাহ'লেও সন্দেহ করা যায় না যে ভাষা-কমিশনের অধিকাংশ সদস্য ভাষা বলতে বোঝেন একটি যন্ত্র বা বাহন, একটি আধার বা উপায় মাত্র, যার সাহায্যে আমরা বিভিন্ন কর্ম সম্পাদন ক'রে থাকি। এবং আমি এই মুহূর্তেই ব'লে নিতে চাই যে ভাষা বিষয়ে এই ধারণা সারত ভুল, মূলত মিথ্যা, মানুষের মনুষ্যত্বের প্রতিবাদী।

ভাষা যে-অর্থে উপায়মাত্র— 'means of communication'— সে-অর্থে ইতর প্রাণীরও ভাষা আছে। পাখি ডাকে, পশু গর্জন করে, পিঁপড়ে প্রভৃতি কীটেরা স্পর্শের দ্বারা বার্তা পৌঁছিয়ে দেয়। শুধু বার্তা পৌঁছিয়ে দেবার জন্য মানুষেরও সব

সময় ভাষার দরকার করে না। চোখের দ্বারা প্রেম, ঘৃণা, অনুরোধ, নিষেধ, ভয়, বিতৃষ্ণা ব্যক্ত করা যায়; হাতের স্পর্শে প্রকাশ করা যায় সেবা, কামনা, শুভেচ্ছা, আবার সেই স্পর্শেরই ওজন বাড়িয়ে দিলে হিংসাবৃত্তি প্রকট হ'য়ে ওঠে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অসংখ্য সাংকেতিক ভঙ্গি মানবসমাজে প্রচলিত আছে : চিমটিও একপ্রকার বার্তা— 'communication', চিমটিভোগীর 'উঃ' শব্দও তা-ই। ভাষা বাদ দিয়েও যদি এতদূর পর্যন্ত বিনিময় করা যায়, আত্মরক্ষা ও বংশবৃদ্ধিতে বিঘ্ন না ঘটে, এবং সামাজিক জীবনও সম্ভব হয়, তাহ'লে মানুষের ভাষার প্রয়োজন হ'লো কেন?

উত্তরে বলা যেতে পারে যে চিমটি, চুম্বন বা হ্রেষ'ধ্বনির তুলনায় ভাষা অনেক ব্যাপকতর অর্থে বার্তাবহ; মানবসমাজের বহুবিচিত্র কর্মের যথাযোগ্য সম্পাদনের পক্ষে যথেষ্ট হবে এমন চিহ্নসমূহ শুধু ভাষাতেই পাওয়া যায়; — স্পর্শে, ভঙ্গিতে বা নিনাদে নয়। 'আমার খিদে পেয়েছে' বা 'আমি তোমাকে কামনা (বা ঘৃণা) করি'— এ-রকম কথা ভঙ্গির দ্বারা বলা গেলেও 'কংগ্রেসকে ভোট দিন', 'সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক' বা 'একনায়কত্বের অবসান চাই' বলতে হ'লে ভাষা ভিন্ন চলে না। 'গ্রীষ্মের পরে বর্ষা আসে', 'ভারতের বর্তমান রাষ্ট্রপতি হিন্দি প্রচার ক'রে থাকেন', 'একটি ত্রিভুজের দুই ভুজ যুক্ত হ'লে তৃতীয় ভুজের চেয়ে দীর্ঘ হবেই'— এ-সব বলার জন্য ভাষা চাই। এবং এ-সব কথা বাংলায় যত ভালোভাবে বলা যায়, কানাড়া, মারাঠি, হিন্দি বা উড়িয়াতেও ততটাই— উনিশ-বিশের বেশি তফাৎ এখানে হ'তে পারে না। যে-বস্তু একটা 'উপায়মাত্র, সারবস্তু নয়', যার 'নিজস্ব মূল্য কিছুই নেই', তা হিন্দি হোক বা ইংরেজি হোক বা রাশিয়ান হোক, তাতে কী-ই বা এসে যাচ্ছে। অতএব— এই হ'লো ভাষা কমিশনের অধিকাংশ সভ্যের পরামর্শ— আসুন আমরা সর্বভারতে সবাই মিলে হিন্দিকে গ্রহণ করি, তাতে জাতীয় ঐক্য দৃঢ় হবে এবং সারা দেশে সর্বপ্রকার কাজ চালাবার পক্ষে সুবিধে হবে সবচেয়ে বেশি।

যদি ভাষার কাজ হ'তো শুধু বার্তাজ্ঞাপন, তথ্যপরিবেষণ ও স্লোগান বা বিজ্ঞাপনধর্মী স্থূল আবেগের প্রকাশ, যদি তার দ্বারা শুধু সরকারি পত্র, রিপোর্ট, দলিল, সাংবাদিক প্রবন্ধ বা জনসভার বক্তৃতা রচনা করতে হ'তো, তাহ'লে এ-কথা মেনে নেবার তেমন বাধা ছিলো না। যদি ভাষার দ্বারা মানুষ ইতিহাস, ধর্মনীতি, অর্থনীতি, আইন, বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যা ছাড়া আর-কিছুর চর্চা না করতো, তা'হলেও এ-কথা মেনে নেয়া একেবারে অসম্ভব হ'তো তা নয়। কেন না ইতিহাসে দেখা যায় যে মানুষ পরভাষায় এইসব কাজই চালাতে পেরেছে। মোগল আমলের ভারতে পারস্য যখন রাজকার্যের ভাষা ছিলো তখন উচ্চাভিলাষী ব্যক্তিরা তা শিখে নিয়েছেন; মধ্যযুগের য়োরোপে ইটালি, হল্যাণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি সব দেশেই পণ্ডিতেরা লাতিন ভাষায় সূক্ষ্ম জটিল বিতর্ক ও সারবান গ্রন্থরচনা করেছেন; উনিশ শতকের রাশিয়াতে ফরাশি ছিলো— শুধু দরবারি আমির-ওমরাহের নয়, সমগ্র শিক্ষিত শ্রেণীর সামাজিক ও পারিবারিক ভাষা, যাতে এমনকি মা ছেলেকে আদর করেন বা তরুণযুগলের প্রেমালাপ চলে। গত দেড়শো বছরের মধ্যে ভারতবর্ষে ইতিহাস ও

প্রত্নতত্ত্ব থেকে আরম্ভ ক'রে সেন্সাস-রিপোর্ট পর্যন্ত বহু বিষয়ে মূল্যবান গবেষণাপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় বহু পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে, যার ভাষা ইংরেজি এবং প্রণেতাগণ ভারতীয়। ইংরেজিতে আমরা যা পেরেছি, হিন্দিতে বা তা পারবো না কেন?

কিন্তু একটি প্রশ্ন বাকি থেকে যায়। কেন, যে-কালে য়োরোপ ভ'রে বিদগ্ধজন লাতিনে ভিন্ন চিন্তা করতেন না, সেই কালেই য়োরোপের কবিরা তাঁদের নিজ-নিজ মাতৃভাষায় রচনা ক'রে গেছেন শৌর্য এবং প্রেমসম্পৃক্ত অসংখ্য রোমান্স— যার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন আর্থারের রাজসভার কাহিনীমণ্ডল— আর কেনই বা পরবর্তী পশ্চিমী সাহিত্য সেই দেশীয় সাহিত্যের প্রভাবেই ভরপুর? কেন, প্রভাঁসালের মতো লৌকিক ভাষায় লাতিনপ্লাবিত য়োরোপ তার আধুনিক গীতিকাব্যের মূলসূত্র আবিষ্কার করেছিলো? কেন ক্যাথলিক ধর্মের যেটি শ্রেষ্ঠ সপ্রাণ অভিব্যক্তি, সেই 'ডিভাইন কমেডি'র ভাষা লাতিন হ'লো না, হ'লো তখনকার অবহেলিত ইটালিয়ান? উনিশ শতকের রুশ লেখকেরা যখন অমর সাহিত্য সৃষ্টি করলেন, সেই সাহিত্যের ভাষা কেন ফরাশি হ'লো না, হ'লো রাশিয়ান— যাতে তাঁরা ভৃত্য, পিতামহী ও কৃষকদের সঙ্গে ভিন্ন পারতপক্ষে কথা বলতেন না? আর কেনই বা গত দেড়শো বছরের মধ্যে, বিদেশীর পক্ষে যতদূর সম্ভব উত্তমরূপে ইংরেজি শিখেও, কোনো ভারতীয় ইংরেজিতে কোনো মৌলিক সাহিত্যগ্রন্থ প্রণয়ন করে নি, যা সাহিত্যের সম্পদরূপে স্বীকৃত হয়েছে?

এ-সব প্রশ্নের উত্তর দিতে মুহূর্তের বেশি সময় লাগে না। মানুষ পরভাষায় প্রায় যে-কোনো কাজই চালাতে পারে, পারে না শুধু কাব্য, নাটক, উপন্যাস লিখতে, সৃষ্টিশীল সাহিত্য রচনা করতে। কেন পারে না? যেহেতু সাহিত্য যেখানে সৃষ্টিশীল সেখানে মানুষের সমগ্র অন্তরাত্মা সক্রিয় হ'য়ে ওঠে— শুধু তার বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়বোধ ও হৃদয়বৃত্তি নয়, তার নির্জ্ঞান মন, তার আত্মায় অধিষ্ঠিত নরক ও স্বর্গ, তার পূর্বপুরুষের ধূসর স্মৃতিপুঞ্জ। স্পষ্ট দিবালোকে যুক্তিনির্ভর জীব ও প্রজা হিশেবে যা-কিছু কর্ম আমরা ক'রে থাকি— সন্তানপালন, রাষ্ট্রচালনা, শিক্ষাদান, বিচার-বিতরণ, তার বিধিবদ্ধতার খাপে-খাপে প্রায় যে-কোনো ভাষাকেই মানিয়ে নেয়া যায়, এবং সুবিধে বুঝে একটা ফেলে আর-একটাকে গ্রহণ করলেও আপত্তি ওঠে না। যদি মানবিক ভাষার বদলে চিহ্ন ব্যবহার করলে গণিত অথবা বিজ্ঞানের বেশি সুবিধে হয়, নিশ্চয়ই তা-ই করতে হবে। উদ্দেশ্য যেখানে সুনির্ণীত, যেখানে আমরা জ্ঞান দিতে চাই, কিছু প্রমাণ করতে চাই, চাই বিরোধী মতকে পরাস্ত করতে অথবা দেশপ্রেমের মতো কোনো সমষ্টিগত আবেগ জাগাতে, সেখানে ভাষা জিনিশটাকে নেহাৎই একটা উপায় হিশেবে স্বীকার করা যেতে পারে। কিন্তু এ ছাড়াও অন্য একটা জীবন আছে মানুষের, তা না-থাকলে সে পূর্ণ মানব হ'তো না। সে-জীবন গোধূলির, আধো অন্ধকারের, স্বপ্নের। এই বিজ্ঞানপোষিত বিশ শতকেও স্বপ্নে আমরা ছেলেমানুষ বা আদিম মানুষে রূপান্তরিত হই, সেখানে আমাদের দিনের আলোর সব শিক্ষা ধ্ব'সে পড়ে, ত্রাস, আশা, উদ্যম কোনো যুক্তি মানে না— স্বপ্নালোকিত সুড়ঙ্গের

মধ্যে হাৎড়ে-হাৎড়ে, হামাগুড়ি দিয়ে চলতে হয় আমাদের। সেই অচিন্তিত চলার কোনো চিহ্ন যদি খুঁজে পাই আমরা, সে-চিহ্ন একটিমাত্র উপায়ে বিধৃত হ'তে পারে : তা মাতৃভাষা। সেই আদিম ও আবিল অন্ধকার থেকে যদি কোনো স্বচ্ছ মণি আমরা ছেঁকে তুলতে চাই, চাই কোনো স্মৃতি, আবিষ্কার বা অভিজ্ঞানকে ছিনিয়ে আনতে, সে-কাজ সম্ভব হ'তে পারে একমাত্র সেই ভাষাতে, যা আমাদের অচেতনের অন্তরঙ্গ, এবং যার মধ্যে পরতে-পরতে জড়িত হ'য়ে আছে আমাদের সমস্ত পূর্বপুরুষের বহুযুগব্যাপী জীবনসূত্র। এবং এই কাজই কবি ক'রে থাকেন : সচেতন জীবনের সঙ্গে অচেতনের ঘটকালি করেন তিনি ; আমাদের বন্য বিশৃঙ্খল স্বপ্নসত্তাকে চিন্ময় রূপ দান করেন, চৈতন্যকে পূর্ণতা দেন স্বপ্নযামিনীর সংস্পর্শে এনে। মানুষের এই একটি কাজ, যা ভাষা বিনা সম্ভব হয় না, এবং বিশেষ ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ ভাষায় ভিন্ন সম্ভব হয় না। অতএব এই কাজটিকে পরীক্ষা না-করা পর্যন্ত আমরা জানতে পারি না, ভাষা বলতে সত্যি কী বোঝায়, মানবজীবন ও মনুষ্যত্বের সঙ্গে তার সম্বন্ধ কী। ভাষা ও সাহিত্য অবিচ্ছেদ্যভাবে পরস্পর-সম্পৃক্ত ; একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটির আলোচনা অসম্ভব। কিন্তু ভাষা-কমিশনের বিবৃতিটি নানা বিষয়ে আলোচনা ক'রেও ঠিক এই প্রসঙ্গের সীমান্তে এসে থেমে গেছে। 'বিদ্যালয়ে আমাদের লক্ষ্য ভাষা নয়, শিক্ষা ; সরকারি কর্মের ক্ষেত্রে আমাদের যা লক্ষ্য তা ভাষা নয়, সুশাসন, আদালতে আমাদের লক্ষ্য ভাষা নয়, সুবিচার।' কিন্তু এর পরে কবিতার কথা উল্লেখ করতে হ'লে বলতে হতো, 'কবিতায় আমাদের লক্ষ্য ভাষা নয়, কবিতা' – যার অর্থ দাঁড়াতো, 'কবিতায় আমাদের লক্ষ্য ভাষা ভিন্ন আর-কিছু নয়।' কিন্তু এ-কথা কমিশনের অধিকাংশ সদস্য বলতে পারতেন না ও বলতে পারেন নি, কেননা তাহ'লে মহোদয়গণের সকল যুক্তি ভেঙে পড়ে। যদিও তাঁদের আলোচনার বিষয় ভাষা, সৃষ্টিশীল সাহিত্য বিষয়ে আদ্যন্ত একটি গভীর নীরবতা বজায় রেখেছেন তাঁরা। ভালোই করেছেন ; আমাদের পক্ষে বোঝা আরো সহজ হয়েছে যে তাঁদের সচেতন উদ্দেশ্য, মুখবন্ধের উদ্ধৃতি থেকে আরম্ভ ক'রে সর্বশেষ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত, পদে-পদে ভ্রান্তিপ্রচার।

আইন, শিক্ষা, শাসন প্রভৃতিকে যথাবিহিত সম্মান জানাবার পর আমরা যখন সাহিত্যের আহ্বান শুনতে পাই, তখনই ভাষা বিষয়ে অন্য একটি ধারণায় আমাদের অন্তঃস্থল উদ্ভাসিত হ'তে থাকে ; এই একটি ক্ষেত্রে প্রবেশ করলে আমরা উপলব্ধি করি যে ভাষা কোনো উপায়মাত্র নয়, ভাষাই উৎস ; চিন্তা থেকে ভাষা নির্গত হয় না, ভাষাই চিন্তাকে জন্ম দেয়। স্বপ্নে আমরা যা দেখি সেই ছবিগুলোকে বলা যায় বিশ্বপুরাণের চিত্রকল্প, মানবাত্মার আবেগসমষ্টির আদিরূপ ; সেই ক্ষণিক, চঞ্চল ও অসংলগ্ন চিত্রসমূহ তাদের অব্যবহিত আবেগসঞ্চার পরিহার ক'রে যখন ভাষার মধ্যে স্থিরতা, স্থায়িত্ব ও স্বচ্ছতা পেলো, তখনই চিন্তা নামক কাজটি সম্ভব হ'লো মানুষের পক্ষে। তার আগে চিন্তা ছিলো না, ছিলো শুধু আবেগের আঘাত আর ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি। বাঘ যখন ক্ষুধার আবেগে আকুল শুধু তখনই সে হরিণটাকে লক্ষ্য

করে, অন্য সময়ে হরিণের কোনো অস্তিত্বই নেই তার কাছে। কিন্তু মানুষ যখন হরিণকে আহার অথবা আদর করতে না চায় তখনও হরিণের সত্তা তার কাছে সুস্পষ্ট, কেননা 'হরিণ' নামক শব্দটাকে সে পেয়েছে। ঐ শব্দ আছে ব'লেই, হরিণ বিষয়ে কোনো ব্যক্তিগত আবেগের অধীন না-হ য়েও, তাকে ইন্দ্রিয়দ্বারা অনুভব না-ক'রেও, ঐ জন্তুকে মনে-মনে ধারণা করতে পারে সে, অর্থাৎ তার বিষয়ে চিন্তা করতে পারে। যদি স্বপ্নের চিত্রভাষা ছাড়া আর-কিছু না-থাকতো, তাহ'লেও পুরাণের অস্তিত্ব থাকতো না তা নয়, কিন্তু ইতিহাস সম্ভব হ'তো না। যদি মানুষ তার স্খলমান মুহূর্তগুলির অব্যবহিত প্রভাবের মধ্যেই আবদ্ধ থাকতো, তাহ'লেও ভ্রূণাবস্থায় রূপকথা সম্ভব হ'তো না তা নয়, কিন্তু বিজ্ঞান হ'তো না। তাঁরই নাম কবি, যিনি আবেগের দৈহিক অভিঘাত থেকে যাত্রা ক'রে সেই দৈহিক অভিঘাত থেকে মুক্তি দেন মানুষকে, ইন্দ্রিয়গত সংবেদনকে রূপান্তরিত করেন সেই আধ্যাত্মিক সামগ্রীতে, যাকে আমরা অভিজ্ঞতা ব'লে থাকি। আমাদের এই আদিকবি একাধারে কাব্য, ইতিহাস ও বিজ্ঞানের জনক : তাঁর চিত্তে আবেগ থেকে জ্ঞান নিষ্কাশিত হ'য়ে জ্ঞান আবার সঞ্জীবিত হয়েছে আবেগে ; বিশ্বপুরাণ থেকে মানবেতিহাস বিশ্লিষ্ট হবার পর ইতিহাস আবার পুরাণের স্রোতে মিশ্রিত হ'য়ে নতুন ক'রে প্রাণ পেয়েছে। এবং তাঁর ও ভাষার জন্ম একই লগ্নে ; তাঁর সত্তা একান্তরূপে ভাষানির্ভর। মানুষের ভাষা আছে, এতেই প্রমাণ হয় যে তার সারাৎসার কবির। মানুষ যদি কবি না হ'তো তাহ'লে তার ভাষার প্রয়োজন হ'তো না।

এইজন্যে জর্মান দার্শনিক হামান্ বলেছিলেন যে 'কবিতাই মানবজাতির মাতৃভাষা।' য়োহান্ গেয়র্গ হামান্, যাঁর প্রভাবের বশবর্তী হ'য়ে প্রথমে হের্ডের ও পরে য়ার্কাব আধুনিক ভাষাতত্ত্বের ভিত্তিস্থাপন করেন, তাঁর এই বাক্যের সমর্থন আছে পৃথিবীর বহু পুরাণে ও ধর্মগ্রন্থে। ইহুদির অতি-সরল সৃষ্টিকাহিনীতে চিন্তনীয় অংশ সেখানে আরম্ভ হ'লো, যেখানে ভগবান, ছয় দিনে বিশ্বনির্মাণ ও সপ্তম দিনে বিশ্রাম করার পর, যাবতীয় জন্তু ও প্রাণীকে আদমের সামনে উপস্থিত করলেন নামকরণের জন্য। প্রত্যেক প্রাণীর একটি ক'রে নাম চাই, এবং সে-নাম আদমকেই দিতে হবে। ভগবানের এই নির্দেশেই বোঝা যায় যে আদমের পতন অনিবার্য, এবং সে-পতন ভগবানেরই অভিপ্রেত ছিলো। কেননা যে-মানুষ নামকরণ করে সে অমরকাননের অজ্ঞান অবস্থা ইতিমধ্যেই পেরিয়ে গেছে, হ'য়ে উঠেছে একাধারে কবি ও বিজ্ঞানী। জ্ঞানের ও আনন্দের আকাঙ্ক্ষা, মানুষের এই দুই বৃত্তি সমভাবে সজাগ, একটিকে বাদ দিয়ে তার অন্যটি সম্পূর্ণ হয় না। 'হে বিদেশী ফুল, যবে আমি পুছিলাম / কী তোমার নাম / হাসিয়া দুলালে মাথা, বুঝিলাম তবে / নামেতে কী হবে। / আর কিছু নয়, / হাসিতে তোমার পরিচয়'। —লেখক যদিও রবীন্দ্রনাথ, তবু এই কথাকে পূর্ণ মানবের উক্তি ব'লে মানতে পারি না আমরা ; কোনো অচেনা ফুল দেখলে আমরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রথমেই জিগেস করি, 'এর নাম কী ?', এবং রবীন্দ্রনাথও তা-ই করেছিলেন। সেই নামের সংজ্ঞার্থ উদ্ভিদবিজ্ঞানীর

পক্ষে এক প্রকার, কবির পক্ষে অন্য প্রকার ; কিন্তু নাম জিনিশটা দু-জনেরই চাই তা না পাওয়া পর্যন্ত ঐ ফুল মানুষের পক্ষে আধ্যাত্মিক অর্থে ব্যবহার্য হয় না। মানুষের ভাষাকে শেষ পর্যন্ত বলা যেতে পারে নামের সমষ্টি ; হিন্দু শাস্ত্র অনুসারে এই জগৎ নাম ও রূপের দ্বারা গঠিত। আর এ-বিষয়েও বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রে মতভেদ নেই যে শুধু পরমেশ্বরের নাম আবৃত্তি ক'রে মানুষ ত্রাণ পেতে পারে।

'প্রারম্ভে ছিলো বাক্', এই ব'লে সন্ত ইয়ন তাঁর যীশুজীবনী আরম্ভ করেছেন। রনাল্ড নক্স-কৃত বাইবেলের নূতন অনুবাদে কথাটা ঈষৎ ভিন্নভাবে বলা আছে— 'কালের যখন আরম্ভ তখনই বাক্ ছিলেন ; পরমেশ্বরের সহচর ছিলেন বাক্ ; সেই বাক্ই পরমেশ্বর। তিনি (বাক্) ছিলেন, কালের প্রারম্ভে, পরমেশ্বরের সহচর হ'য়ে। তাঁরই মধ্য দিয়ে সর্বভূত উদ্ভূত হ'লো ; যা-কিছু হয়েছে তাঁর বিহনে কিছুই হয় নি। তাঁরই মধ্যে ছিলো প্রাণ, সেই প্রাণ মানবের আলোকস্বরূপ।' এবং, সন্ত ইয়নের মতে, যীশুর মধ্যে 'the word was made flesh', যীশু এই বাক্-এরই অবতার। উপনিষদ্-সমূহে ব্রহ্মের নামান্তর 'অক্ষর', এবং সংস্কৃতে ঐ শব্দের অর্থ একাধারে 'অপরিবর্তনীয়' বা 'ধ্বংসহীন', এবং 'শব্দ' বা 'বর্ণমালার চিহ্ন'। বাক্ ও ব্রহ্মকে এক ব'লে ভাবা হয়েছে এখানে, এক ব'লে বিশ্বাস করা হয়েছে। 'অক্ষর' বলতে ওঙ্কারকেও বোঝায়, যে-ওঙ্কার জীবাত্মারূপ বাণের ধনুস্বরূপ (মুণ্ডকোপনিষদ্ : ২।২।৪), আত্মা থেকে অভিন্ন (মাণ্ডুক্যোপনিষদ্ : ৮) ; ধ্যানের অবলম্বন (মুণ্ডকোপনিষদ্ : ২।২।৬) এবং সর্ববেদের প্রধান ও স্বয়ং পরমেশ্বর (তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ : ১।৪।১)। অক্ষরকে না-জানলে বেদজ্ঞান বৃথা, কেননা পরমাকাশরূপ অক্ষরেই (ব্রহ্মেই) ঋগাদি বেদ ও সর্বদেবতা আশ্রিত আছেন (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ : ৪।৮)। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে, সর্বজীবের প্রাণের উৎসই বাক্ ; পশু, মানব ও দেবগণের মধ্যে সকলেই বাঙ্‌নির্ভর, বাক্ ধ্বংসহীন, সনাতনের আদিসন্তান, বেদাদির মাতা ও বিশ্বের নাভিস্বরূপ। প্রাচীন পারসীকের ধর্মগ্রন্থ— যেখানে শুভ ও অশুভের দ্বন্দ্বকে সৃষ্টির মূলসূত্র ব'লে কল্পনা করা হয়েছে— তার সৃষ্টিকাহিনী অনুসারে ভগবানের পরম শক্তি বাক্, বাক্ পার্থিব সৃষ্টির পূর্বজ ও শয়তানের শক্তির বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ। বহু আদিম জাতির পুরাণেও এই বিশ্বাস পাওয়া যায় যে বাক্ ও সৃষ্টিকর্তা অভিন্ন এবং বাক্ থেকে সৃষ্টি উৎসারিত হয়েছে।

বাক্ থেকে সৃষ্টি উৎসারিত হয়েছে, জীবনের বহু ক্ষেত্রে এর কোনো নিদর্শন আমরা পাই না, বরং উল্টো দিকেই অনেক সাক্ষী সংগ্রহ করা যেতে পারে। কথাটা আজকের দিনে উচ্চার্য হ'তো না, যদি না, হার্বার্ট স্পেন্সারের ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ ক'রে, মানবজাতি নির্ভুলভাবে জানিয়ে দিতো যে কবিতা না-হ'লে তার চলে না। যন্ত্র এবং উপযোগবাদের এই ব্যাপ্তির দিনেও কবিতার সত্তা যে অনাক্রমণীয়, এতেই বোঝা যায় যে মানুষের আদি পুরাণসমূহ ভুল করে নি। বাক্ থেকে জগৎ সৃষ্টি হয়েছে, কবিতাই এ-কথার তর্কাতীত প্রতিষ্ঠাভূমি। আমরা যখন কবিতা পাঠ করি, বা স্মরণ করি, তখনই বুঝি ভাষার মূল্য তার নিজেরই মধ্যে, তার অভিধানগত

অর্থের মধ্যে সে-মূল্যকে ধরানো যায় না ; বাহনমাত্র নয় সে, নিজেই দেবতা। কবি যখন কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত হন তিনি তখনই বোঝেন যে সৃষ্টির উৎসস্থলই ভাষা, তাঁর রচিত কাব্যটি যতটা তাঁর ঠিক ততটাই তাঁর ভাষার সৃষ্টি ; যে ভাষা তাঁর হাতে একটি যন্ত্র হওয়া দূরে থাক, তিনি বরং তখনকার মতো ভাষার একটি নিমিত্তে পরিণত হন, এবং নিমিত্ত হিশেবে তিনি কতদূর পর্যন্ত বাধ্য, মনোযোগী ও তন্ময় হ'তে পারেন তারই উপর তাঁর কৃতার্থতা নির্ভর করে। এবং ভাষার উচ্চতম ও সত্য রূপও এখানেই আমরা দেখতে পাই— কবিতায় বা সৃষ্টিশীল সাহিত্যে।

তিন

ভাষা-কমিশন যে-ঔপনিষদিক বচন উদ্ধৃত করেছেন এবারে সেটিতে ফিরে আসা যাক। 'যদি বাক্ না থাকতো তবে ধর্ম বা অধর্ম বিজ্ঞাপিত হ'তো না, সত্য বা অসত্য, শুভ বা অশুভ, মনোজ্ঞ বা অমনোজ্ঞ— কিছুই বিজ্ঞাপিত হ'তো না।' এই উক্তির প্রকৃত অর্থ এই নয় যে ভাষা একটি উপায়মাত্র— কেননা শিশুও জানে যে ভাষা বিনাও মনোজ্ঞ ও অমনোজ্ঞের তফাৎ বোঝা যায় ; এর আসল অভিপ্রায় এ-বিষয়ে আমাদের সতর্ক ক'রে দেয়া যে ভাষা বস্তুটি উভমুখী। সত্য ও মিথ্যা, ভালো ও মন্দ, ধর্ম বা অধর্ম, প্রীতিকর ও কষ্টকর— ভাষা একাধারে ও নির্বিচারে সবই জানাতে পারে, এইসব বিপরীত-যুগলের নিরপেক্ষ প্রকাশক সে। ভাই ভাইকে গুলি ক'রে মারার পর আদালতে নির্দোষ ব'লে প্রমাণিত হয়, তা উকিলের ভাষারই সাহায্যে ; যুদ্ধের সময় প্রত্যেক দেশের প্রচারকর্তারা শত্রুপক্ষকে পিশাচরূপে প্রতিপন্ন করেন, তারও মূলে আছে ভাষা। এবং কোনো সরকারি কমিশন, পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে ভাষা ব্যবহার ক'রেই, এমন কোনো প্রস্তাবকে সারা দেশের পক্ষে হিতকর ব'লে ঘোষণা করতে পারেন, যাতে স্বল্পসংখ্যকের স্ফীতি ঘটিয়ে অধিকাংশকে বিনষ্ট করা হবে। ব্যবহারের অসাধুতা সঙ্গে-সঙ্গেই ধরা পড়ে, ভাষার অসাধুতা সূক্ষ্ম ব'লেই আরো বেশি ভয়াবহ। বাণিজ্যে, সংসারকর্মে, রাষ্ট্রচালনায় এই ভাষাগত অসাধুতা ব্যাপকভাবে দেখা যায়— শুধু আজকের দিনে নয়, ইতিহাসের যুগে-যুগে। যে-বস্তু এত বেশি বিকারপ্রবণ তাকে উপাস্য বলি কেমন ক'রে ?

হয়তো এই অর্থেই হোল্ডার্লিন বলেছিলেন যে 'ভাষা মানুষের সবচেয়ে বিপজ্জনক সম্পত্তি'। বুদ্ধিমানের হাতে ভাষার বিকৃতি সহজেই ঘ'টে থাকে ; এবং যাঁর যত বেশি বুদ্ধি তিনি ভাষাকে তত বেশি বিকৃত করতে পারেন। 'গালিভার্স ট্র্যাভলস'-এর শেষ অধ্যায়ে সুইফট যে-অশ্বরূপী আদর্শ জীবের কল্পনা করেছিলেন তাদের পরিমিত ভাষায় 'মতামতে'র প্রতিশব্দ নেই, কেননা সেই পরম যুক্তিবাদী অশ্বসমাজ একান্তভাবে প্রমিতির প্রবক্তা, তাদের মধ্যে কখনো কোনো মতভেদ ঘটে না। আঠারো-শতকী আদর্শ-অনুযায়ী মানুষ একটি যুক্তিময় যন্ত্র হয় নি ব'লে আক্ষেপ করবো না আমরা, কেননা আমরা সকলেই জানি যে মানুষ যেমন কাম ক্রোধ লোভ ইত্যাদি রিপুর বশবর্তী, তেমনি তার মধ্যে প্রেম ভক্তি ত্যাগ ও সৃষ্টিশীলতার মতো

মহৎ বৃত্তিও বিদ্যমান, এবং এই প্রবৃত্তি ও বৃত্তিসমূহ অন্যোন্যনির্ভর। একদিকে কামুক হিংসুকী লোভী প্রভৃতি না-হ'লে অন্যদিকে সে সন্ত, বীর বা ঋষিও হ'তে পারতো না ; সুইফট-এর 'উইনিম'-সমাজে সকলেই নৈতিক অর্থে ও নীরসভাবে ভালো, কিন্তু মহৎ কেউ নয়। মানুষ যেখানে জান্তব সেখানে সে অযৌক্তিক, আর যেখানে সে দেবতার মতো সেখানে সে অতিযৌক্তিক : তার নিম্নতম ও উচ্চতম স্তর সমানভাবে যুক্তিবহির্ভূত। এবং সাধারণত এই দুই স্তরের অস্তিত্ব যুগপৎ ও অবিচ্ছেদী ব'লে মানবসমাজে কোনো বিশুদ্ধ যুক্তি সম্ভব হয় না ; দার্শনিক দূরকল্পনায় তার ধারণা থাকলেও, কার্যত সব যুক্তির মধ্যেই প্রবেশ করে কোনো প্রবৃত্তি বা বৃত্তি, কোনো স্বার্থপর কামনা বা কোনো উন্নত আদর্শপ্রসূত আবেগ, এবং ঐ দুই বস্তুর একটি থেকে অন্যটিকে চিনে নেয়া যে সব সময় সহজ হয় না তার কারণই মানুষের উভমুখী প্রকৃতি। যে-কোনো প্রশ্ন উঠুক, সভ্য মানুষ তার দুই দিকেই প্রায় একই রকম প্রভাবশালী তর্ক করতে পারে ; নিজে যা বিশ্বাস করে না তার সমর্থন ক'রে ডিবেটিং ক্লাবে বাহবা পায় কলেজের ছাত্র ; যখন যে-সরকার প্রতিষ্ঠা পান তাঁদেরই পছন্দমতো মতপ্রচারে রাজপুরুষের যুক্তির অভাব ঘটে না। শয়তান শাস্ত্র আওড়ায় ; জুলিয়স সীজার বীর না অত্যাচারী, সে-বিষয়ে জনতার ধারণা ব্রূটাস বা মার্ক অ্যান্টনির বক্তৃতা অনুসারে বদলে যায়। যাকে আমরা যুক্তি বলি তার সাহায্যে অনেক সময়ই সত্যকে জানা যায় না ; যে-ভাষা যুক্তির বাহন, সেই ভাষাই নানা বিভ্রমের সৃষ্টি করে। ভাষা যেখানে বাহন বা উপায়মাত্র, সেখানে তার বিকারপ্রবণতা অচিকিৎস্য।

কিন্তু এমন কোনো ক্ষেত্র কি নেই, ভাষা যেখানে মিথ্যাচারী হ'তে পারে না, আর তা যদি না থাকে তাহ'লে ভাষার নিজস্ব মূল্যই বা কোথায়। এই প্রশ্নের উত্তরে হ্যেল্ডার্লিনেরই আর-একটি কথা উদ্ধৃত করবো : 'মানুষের সবচেয়ে অনপকারী কর্ম কবিতা।' 'অনপকারী'—কথাটাকে খুব কমিয়ে অত্যন্ত মৃদুভাবে বলা হয়েছে ; এর আসল অর্থ বুঝতে হ'লে কবিতার সঙ্গে ভাষার সম্বন্ধের কথা ভাবতে হবে। কবিতা সবচেয়ে অনপকারী কর্ম এই অর্থে যে কবিতায়— সৃষ্টিশীল সাহিত্যে— এবং একমাত্র সেখানেই— ভাষা হ'য়ে ওঠে অধিকার, নিষ্কলুষেয়, অমোঘভাবে সত্য। সাহিত্যের মহত্তম মুহূর্তগুলিতে সত্যের বদলে অসত্য, ধর্মের বদলে অধর্ম, মনোজ্ঞের বদলে অমনোজ্ঞের প্রকাশিত হবার উপায় নেই ; কিন্তু আইন, বাণিজ্য বা রাষ্ট্রচালনা যেখানে সবচেয়ে উন্নত সেখানেও ভাষার মিথ্যাচার সম্ভব হ'তে পারে এবং হ'য়ে থাকে। কেননা আমাদের বোঝা ব্যাপারটা বুদ্ধির কাজ, আর উপলব্ধি স্বজ্ঞার ; বুদ্ধি যদি আপন গুণেই নির্ভরযোগ্য হ'তো তাহ'লে মানবসমাজে ভুল বোঝা ব'লে কিছু থাকতো না ; বুদ্ধির এই অপলাপী স্বভাব শোধন ক'রে নিতে হ'লে স্বজ্ঞার সঙ্গে তার যোগসাধন চাই। স্বজ্ঞার উপলব্ধিতে কখনো ভুল হয় না কিন্তু প্রকাশের ক্ষমতা তার নেই : সে যখন বুদ্ধিকে তার সেবকরূপে গ্রহণ করে তখনই ভাষা হ'য়ে ওঠে সত্য, আর কবিতা সেই সত্য ভাষারই নামান্তর। এই ভাষা, মানুষের সমগ্র অন্তরাত্মা যাতে দীপ্যমান, তা তার মাতৃভাষা ভিন্ন আর-কিছু হ'তে পারে না। অন্যান্য

ক্ষেত্রে আমরা উপযোগ বুঝে ভাষা বদলাতে পারি, যেমন পারি সুবিধেমতো বিভিন্ন বেশ ধারণ করতে, কিন্তু ভাষা যেখানে আবিকার ও সত্য সেই সাহিত্যের প্রসঙ্গে ভাষা বলতে শুধু মাতৃভাষাকে বুঝতে হবে। মাতৃভাষা আমাদের চিন্তার জননী, আমাদের আত্মিক জীবনের পরিচালিকা। এবং সেই ভাষা 'কখনোই সারবস্তু নয়, শুধু যন্ত্র', আর তা নিয়ে 'হৃদয়াবেগ বা উত্তেজনা'র প্রয়োজন করে না, এ-কথা যাঁরা বলেন ভাষা বিষয়ে তাঁদের কোনো পরামর্শ বিষয়ে শ্রদ্ধাবান হওয়া অসম্ভব।

চার

কিন্তু— কেউ-কেউ আপত্তি তুলতে পারেন— হিন্দি ভারতের সরকারি ভাষা হ'লে অন্যান্য সাহিত্যের ক্ষতি হবে কেন? যেমন লাতিনপ্লাবিত য়োরোপে ভিন্ন-ভিন্ন মাতৃভাষায় কাব্য রচিত হয়েছিলো, উনিশ-শতকী রুশ মনীষীরা ফরাশির আধিপত্য সত্ত্বেও খাঁটি রুশীয় সাহিত্য সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন, এবং ইংরেজশাসিত ভারতের কোনো-এক অংশে মাতৃভাষা ও তার সাহিত্যের নবজন্ম ঘটেছিলো, তেমনি নিখিল ভারতের সরকারি কাজে হিন্দি ব্যবহৃত হ'লেও ভিন্ন-ভিন্ন সাহিত্যের বিকাশ হবার বাধা কী? মাতৃভাষা যদি আত্মিক ব্যাপারই হয় তার উন্নতিসাধন তো আমাদেরই হাতে আছে, রাষ্ট্র সেখানে কী করতে পারে? একই রকম যুক্তি অনুসারে ইংরেজ আমলে কেউ-কেউ বলতেন যে পরাধীনতা একটা কথার কথা মাত্র, তার অবসান ঘটাবার চেষ্টাও অনর্থক; কেননা পরাধীন অবস্থাতেও আমরা আকাশের নীলিমা দেখে খুশি হ'তে পারি, এবং যোগাসনে মোক্ষলাভেরও বাধা হয় না। আর আজকের দিনে, এই যুক্তি অনুসারেই, অনেকে ব'লে থাকেন যে অন্তরের স্বাধীনতা কেউ কেড়ে নিতে পারে না, অতএব একনায়কত্বে দোষ নেই। ভাষা বিষয়ে আসল কথাটা এই যে কোনো পরভাষার আধিপত্য— সেই পরভাষা মাতৃভাষার তুলনায় অনেক উন্নত হ'লেও— মানুষ বেশিদিন সহ্য করতে পারে না: এত যে বলশালী সংস্কৃত ভাষা তাকেও হার মানতে হ'লো বিভিন্ন অপরিণত কথ্য ভাষার কাছে; লাতিন ভাষার আদিভূমি ইটালিতে মধ্যযুগীয় য়োরোপের প্রথম 'ভার্নাকুলর'-সাহিত্যের প্রোজ্জ্বল অভ্যুদয় ঘটলো; ইংরেজ সাহিত্যের গরীয়ান এলিজাবেথীয় যুগ, আর গ্যেটের যুগে জর্মান সাহিত্যের উত্থান— এ-দুয়েরই পটভূমিতে আছে বাইবেলের জেমসীয় ও লুথারীয় অনুবাদ— অর্থাৎ ধর্মের ক্ষেত্রে লাতিন থেকে মুক্তিপ্রাপ্তি; এবং উনিশ শতকে রুশ সাহিত্যের আকস্মিক ও আশ্চর্য আবির্ভাবের একটি কারণ এই যে রাশিয়া, আদিচার্চের অধীন ব'লে, প্রথম থেকেই মাতৃভাষাকে ধর্মীয় কাজে ব্যবহার করেছে। আর উনিশ-শতকী বাংলাদেশে— ইংরেজি শিক্ষা সত্ত্বেও, বা তারই ফলে— স্বীয় ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে যুগান্তরকারী জাগরণ ঘটলো, যার পরিণতি 'স্বদেশী' আন্দোলনে। বাংলার সেই নবজন্মক্ষণেই আধুনিক ভারতের ভিত্তি স্থাপিত হয়, এ-কথা ভারতবর্ষীয় সকলেই জানেন, যদিও অনেকে আজকাল স্বীকার করতে চান না।

ভারতে ইংরেজি ভাষার অবস্থা বিষয়ে আর-একটু বলা দরকার। প্রথমেই স্মর্তব্য যে ইংরেজি শাসকেরা তাঁদের ভাষাকে জোর ক'রে আমাদের উপর চাপান নি; এ-দেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তনের জন্য উদ্যোগী ও সচেষ্ট হয়েছিলেন আমাদেরই রামমোহন থেকে বিদ্যাসাগর পর্যন্ত মহাপুরুষগণ। কেন সচেষ্ট হয়েছিলেন? যেহেতু তাঁরা বুঝেছিলেন যে ভারতের শ্বেতাঙ্গ শাসকগণ আধুনিক জগৎ ও মানসতার প্রতিভূ, এবং তাঁদের ভাষাকে বাহনরূপে ব্যবহার ক'রে আমরা মধ্যযুগ থেকে আধুনিক কালে বদলি হ'তে পারি। সেকালে দেশের যে-সব অংশে পাশ্চাত্ত্য চিন্তার অনুপ্রেরণা প্রত্যাখ্যাত হয়, বাদশাহি স্মৃতিমন্থর সেই উত্তরভারতে মধ্যযুগের অবসান ঘটতে বিলম্ব হ'লো, কিংবা এখনো সম্পূর্ণভাবে ঘটে নি— এবং একই কারণে হিন্দি ভাষায় ও সাহিত্যে আধুনিক জীবন স্বাভাবিকভাবে বিম্বিত হ'তে পারছে না। কিন্তু যেখানে পশ্চিমের দিকে পুরোপুরি দরজা খুলে গেলো— যেমন বাংলাদেশে— সেখানেও ইংরেজি ভাষা গৃহীত হ'লো একটি মূল্যবান উপায় হিশেবে, তার বেশি নয়; মধুসূদনের ব্যর্থ প্রয়াসের পরে প্রায় সকলেই বুঝে নিলেন যে ইংরেজিতে আমরা কাব্য রচনা করতে পারি না, আত্মাকে প্রকাশ করতে পারি না, যে বিশ্বমানসে স্থান পেতে হ'লে মাতৃভাষারই চর্চা করা আমাদের কর্তব্য। এবং সেই মাতৃভাষার চর্চায় ইংরেজি কখনো আমাদের প্রতিবন্ধক হয় নি, উল্টে প্রেরণা দিয়েছে, এবং এখনো দিচ্ছে। গত দেড়শো বছরে, অন্তত বাংলাদেশে, ইংরেজি যেটুকু প্রসারলাভ করেছে, তার তুলনায় বহুগুণ বেশি বিস্তার ও মর্যাদাবৃদ্ধি ঘটেছে মাতৃভাষার। স্যর আশুতোষ যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্যে এম. এ. উপাধির প্রবর্তন করেন তখন ব্রিটিশ রাজ পূর্ণপ্রতাপে অধিষ্ঠিত; যখন রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবের অভিভাষণ বাংলাভাষায় রচনা করেন তখনও ইংরেজের ভারত-ত্যাগ কল্পনামাত্র; এবং যখন বিদ্যালয়ে শিক্ষার বাহনরূপে ইংরেজির বদলে মাতৃভাষা প্রতিষ্ঠিত হ'লো, বা সরকারি কার্যের উপযোগী বাংলা পরিভাষা রচনার জন্য প্রথম সমিতি গঠিত হ'লো, তখন পর্যন্ত ইংরেজ আমলের অবসান ঘটে নি। ইংরেজি ভাষা, ইংরেজের রাজত্বকালেই, একে-একে বহু ক্ষেত্রে মাতৃভাষাকে জায়গা ছেড়ে দিয়েছে।

কিন্তু আজকের দিনের স্বাধীন ভারতের ভাগ্যাকাশে হিন্দি যে-ভাবে দেখা দিয়েছে তাকে মদমত্ত ও ব্যভিচারী বললে ভুল হয় না। দাবি তার প্রকাণ্ড, উদ্ধত তার উচ্চাশা। আমাদের সংবিধানপত্রে ভারতের সরকারি ভাষারূপে স্বীকৃত হয়েছে হিন্দি, সেই স্বীকৃতিও প্রামাণিক কিনা সন্দেহ করা যেতে পারে, কেননা এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিলো লোকসভায় নয়, অতি সংকীর্ণ মতাধিক্যের জোরে বিধানসভায়। তৎসত্ত্বেও, শুধু সরকারি ভাষা নিয়ে কথা হ'লে এই স্বীকৃতিকে গ্রহণ করা অনেকের পক্ষে হয়তো একেবারে অসম্ভব হ'তো না। কিন্তু স্বাধীনতার পরবর্তী দশ বছর ধ'রে হিন্দি সর্বভারতে প্রচারিত হয়েছে— সরকারি ভাষা হিশেবে নয়, তাকে বলা হয়েছে রাষ্ট্রভাষা বা 'জাতীয় ভাষা'— the national language। সেই সঙ্গে ভারতের

অন্যান্য প্রধান ভাষাগুলির জন্য অন্য একটি বিশেষণ উদ্ভাবিত হয়েছে : 'regional', অর্থাৎ 'আঞ্চলিক' বা 'দৈশিক'। এই দুটো শব্দকেই আমরা সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করছি। যে-ভাষা কোনো নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলের মাতৃভাষা, তাকেই 'আঞ্চলিক' বলা যেতে পারে ; আর সে-অর্থে তামিল, বাংলা, কানাড়া, মলয়ালি যতটা 'আঞ্চলিক', হিন্দিও ঠিক ততটাই তা-ই ; এবং ফরাশি, জর্মান, জাপানি, রুশ প্রভৃতি ভাষা যতটা আঞ্চলিক, বাংলা, তেলুগু, মরাঠি, গুজরাটি প্রভৃতি ভাষাও ঠিক তা-ই। অতএব এই বিশেষণের কোনো অর্থই হয় না ; এর ব্যাপক ব্যবহার— যা সরকারি ভাষা-কমিশনের বিবৃতিতেও বিরাজমান— তার উদ্দেশ্যই হ'লো হিন্দি ভিন্ন অন্যান্য ভারতীয় ভাষার মর্যাদাহানি। 'রাষ্ট্রভাষা' কথাটার দুটো অর্থ হ'তে পারে : রাষ্ট্রিক কর্মের জন্য ব্যবহৃত ভাষা বা সরকারি ভাষা, এবং 'জাতীয় ভাষা'— অর্থাৎ যে-ভাষা দেশের সমগ্র প্রজাগণের মাতৃভাষা। প্রথম অর্থ গ্রহণ করলে প্রশ্ন ওঠে : কোন সরকারের কথা ভাবা হচ্ছে ? পশ্চিম বাংলা, মান্দ্রাজ না নয়া দিল্লি ? আসাম, উড়িষ্যা, অন্ধ্র বা পশ্চিম বাংলার সরকার হিন্দি ভাষায় তাঁদের কাজকর্ম চালাবেন, এ-রকম কল্পনা সম্ভব হয় শুধু হিটলারের মতো মতিগতি হ'লে। এ-রকম কল্পনা কোথাও দেখা দিয়েছে কিনা সেটা এই আলোচনাপ্রসঙ্গে প্রকাশ পাবে ; এখানে ব'লে নেয়া দরকার যে হিন্দি-প্রচারকদের অত্যুগ্র উৎসাহ— যাতে স্বয়ং রাষ্ট্রপতি অবিরল ইন্ধন জুগিয়ে আসছেন— 'রাষ্ট্রভাষা'র দ্বিতীয় অর্থ চালাবার জন্যই বদ্ধপরিকর ; হিন্দির সঙ্গে যাঁদের স্বার্থ জড়িত বা যাঁদের স্বাধীন চিন্তার ক্ষমতা নেই, এমন অনেকে ধ'রে নিয়েছেন যে ভারতের 'জাতীয়' অর্থাৎ সার্বভৌম ভাষার নামই হিন্দি। এই কথাটা শুধু ভুল নয়, অসত্য ; শুধু অসত্য নয়, মিথ্যা। যে-অর্থে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'জাতীয়' ভাষা ইংরেজি, সে-অর্থে কোনো-একটি স্বাভাবিক সার্বভৌম ভাষা ভারতের এখনো নেই, কখনোই ছিলো না। ইতিহাসের কোনো অধ্যায়েই নিখিলভারত এক ভাষায় কথা বলে নি ; এই বৈচিত্র্যই তার ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য, তার ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রাণশক্তি ; এই বৈচিত্র্যকে রক্ষা করতে আমাদের বর্তমান রাষ্ট্র-নায়কেরাও প্রতিশ্রুত আছেন। যদি 'জাতীয়' কথাটার ব্যবহার করতেই হয় তাহ'লে আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে সংবিধানপত্রে গৃহীত চোদ্দটি ভাষাই আমাদের 'জাতীয় ভাষা'। এই চোদ্দটি ভাষার মধ্য থেকে হঠাৎ একটিকে ভিত্তিহীন সার্বভৌমতার সিংহাসনে বসিয়ে, অন্য বারোটি জীবিত, সমকক্ষ ও কোনো-কোনো ক্ষেত্রে অনেক বেশি উন্নত ভাষাকে 'আঞ্চলিক'রূপ অবাস্তব ও অপমানজনক বিশেষণের আড়ালে প্রচ্ছন্ন রাখার এই যে দুশ্চেষ্টা, তা সম্ভব হ'তে পারে শুধু সেই যুক্তির বলে, যে-যুক্তিতে ইংরেজ সরকার একদা বিনা বিচারে বহু ভারতীয়কে অনির্দিষ্ট কালের জন্য অবরুদ্ধ রেখেছিলেন। ইংরেজের যুক্তি ছিলো 'ল অ্যাণ্ড অর্ডার' ; হিন্দি-প্রচারকদের যুক্তি হ'লো 'সর্বভারতীয় ঐক্য'। নিজগুণে উভয় বস্তুই বাঞ্ছনীয় ও শ্রদ্ধেয়, তাতে সন্দেহ নেই ; কিন্তু সেদিন ইংরেজ যেমন আইন ও শৃঙ্খলার নামেই সুবিচারকে হত্যা করেছিলো, তেমনি হিন্দি-প্রচারকরাও আজ উদ্যত হয়েছেন

ভারতীয় ঐক্যের নামেই সর্বভারতীয় ঐক্য, সংবিধানে প্রতিশ্রুত মৌলিক অধিকার ও ভারতের সদ্যোজাত গণতন্ত্রকে একই সঙ্গে বিধ্বস্ত করতে।

পাঁচ

ভাষা-কমিশন গঠিত হয়েছিলো একটি সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে; ভারতের সরকারি ভাষা কী হ'তে পারে সে-বিষয়ে ভারত-সরকারকে পরামর্শ দেবেন তাঁরা— কিন্তু এই কমিশন কার্যত তাঁদের অধিকার লঙ্ঘন ক'রে গিয়েছেন; সর্বভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থা বিষয়েও আলোচনায় তাঁরা কার্পণ্য করেন নি। এবং যেহেতু শিক্ষিত ব্যক্তিরাই সাধারণত সাহিত্যের পাঠক ও লেখক হ'য়ে থাকেন, আমাদের প্রসঙ্গের পক্ষে এই অংশই প্রয়োজনীয়। শিক্ষার বাহন পরভাষা হওয়া অনুচিত, এই সূত্র অবলম্বন ক'রে কমিশনের অধিকাংশ সভ্য ইংরেজির বিরুদ্ধে প্রভূত বাক্যব্যয় করেছেন; এবং শিক্ষার বাহন হিশেবে ইংরেজির অপসারণ বিষয়ে আমরা তাঁদের সঙ্গে সর্বান্তঃকরণে একমত। এর পরের প্রশ্ন: শিক্ষার বাহন কী হবে— এর আংশিক মীমাংসা ইতিপূর্বেই হ'য়ে গেছে; ভারতের অধিকাংশ বিদ্যালয়েই আজ শিক্ষার বাহন সেই-সেই রাজ্যের মাতৃভাষা; ইংরেজি এখনো বাহনরূপে স্বীকৃত আছে শুধু বিশ্ববিদ্যালয়িক উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থায়, তাও সর্বত্র ও সর্বতোভাবে নয়। এখানে মাতৃভাষার দাবি এতই অপ্রতিরোধ্য যে কমিশনের সদস্যেরাও তা ঠেলতে পারেন নি, অন্তত মৌখিকভাবে তা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন; এবং প্রসঙ্গত ভারতীয় মাতৃভাষাসমূহের (তাঁদের মতে 'আঞ্চলিক' ভাষা) উদ্দেশে যে-সব সহৃদয় মন্তব্য করেছেন, তাঁদের মূল বক্তব্য মনে রাখলে সেগুলোকে মনে হয় কুম্ভীরের অশ্রুপাতের মতোই করুণাশীল। শিক্ষার বাহন মাতৃভাষা হওয়াই বাঞ্ছনীয়, এই মর্মে স্বীকারোক্তির পর তাঁরা বলছেন যে নিখিলভারতের সমস্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের চোদ্দ বছর বয়ঃক্রম পর্যন্ত হিন্দি ভাষা শেখানোই চাই। উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে বাহন কী হবে সে-বিষয়ে কোনো স্পষ্ট নির্দেশ তাঁরা দিচ্ছেন না; কোনো-কোনো ক্ষেত্রে মাতৃভাষা, কোনো-কোনো ক্ষেত্রে হিন্দি, এমনকি কোনো-কোনো ক্ষেত্রে ইংরেজি থাকতে পারে, এই তাঁদের পরামর্শ। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এ-বিষয়ে তাঁদের নিজ-নিজ বুদ্ধি-অনুসারে মনস্থির করুন, এতেও তাঁদের মৌখিক আপত্তি নেই। কথাটা শুনতে মন্দ না, কিন্তু এর পরেই তাঁদের আসল অভিপ্রায় অব্যর্থভাবে বিদ্ধ করে আমাদের, যখন তাঁরা বলেন যে বিশ্ববিদ্যালয়িক স্বারাজ্যই শেষ কথা নয়, রাষ্ট্রভাষা-প্রয়োগের নীতিকে শেষ পর্যন্ত সবার উপরে স্থান দিতে হবেই ('...the principle of "autonomy of Universities" can, in the final analysis, have only a qualified bearing and the national language policy must ultimately prevail.')। এ-কথার অর্থ কী, তা বুঝতে একটুও দেরি হয় না। যদি কমিশনের অনুমোদনসমূহকে ভবিষ্যতের পূর্বাভাস ব'লে ধ'রে নেয়া যায়, যদি ভারত-সরকারের ভাষাসংক্রান্ত নীতির কোনো মৌলিক পরিবর্তন না ঘটে, তাহ'লে সরকারি তরফ

থেকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে হিন্দি বিষয়ে কী-রকম পরামর্শ, নির্দেশ, প্রলোভন বা তর্জনবাক্য পৌঁছতে থাকবে, তা ধারণা করতে হ'লে দৈবজ্ঞ হবার প্রয়োজন করে না। এবং যে-ভাষা হবে লোকসভার, আইনপ্রণয়নের, সুপ্রীম কোর্টের ও সর্বভারতীয় সরকারি পরীক্ষাসমূহের অনন্য বাহন, যে-ভাষায় হাইকোর্টের বিচারপতিরা রায় দিতে বাধ্য থাকবেন, যে-ভাষা প্রাদেশিক সরকারের পরীক্ষাগুলিতে ব্যবহৃত হ'তে পারবে, এবং যে-ভাষায় নিম্নতর আদালতেও ওকালতি করার বাধা থাকবে না— সেই ভাষাকে অহিন্দিভাষী সর্বভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কণ্ঠনালীতে প্রেরণ করা খুব বেশি কঠিন হবে না, এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। সহ্য না হোক, গিলতেই হবে; মরতে হ'লেও গিলতে হবে। যদি তার ফলে কালক্রমে ভারতের অহিন্দিভাষী বিশালতর অংশে শিক্ষা, স্বাধীনতা ও মনুষ্যত্বের অপমৃত্যু ঘটে, তাহ'লেও 'রাষ্ট্রভাষা'কে সবার উপরে স্থান দিতে হবে— 'the national language policy must prevail'। ভাষা-কমিশনের অধিকাংশ সদস্যের যেগুলি বিশেষ অনুমোদন— বিদ্যালয়ে হিন্দি শিক্ষার আবশ্যিকতা যার অন্যতম— তার সার অর্থ এই যে হিন্দি-না-জানা ভারতীয় প্রজা আর ভারতীয় প্রজা বা নাগরিক ব'লেই গণ্য হ'তে পারবে না। উচ্চশিক্ষার বাহন হিশেবে মাতৃভাষা ও ইংরেজির সম্ভাবনা স্বীকার ক'রে নিয়েও সদস্যেরা বহু যুক্তিসহকারে বুঝিয়েছেন যে সর্বভারতে উচ্চশিক্ষার অনন্য বাহন যদি হিন্দি হয়, তাহ'লেই ভারতীয় ঐক্য বিষয়ে আমরা নিশ্চিন্ত হ'তে পারি —অতএব সেই পন্থাই সবচেয়ে প্রশস্য। প্রসঙ্গত আর-একটি কথা তাঁরা বলছেন, যা প'ড়ে তাঁদের ভয়াবহ অভিসন্ধি বিষয়ে আর সন্দেহ থাকে না। ভারতের সব 'আঞ্চলিক' ভাষা থেকে শব্দসংকলন ক'রে হিন্দিকে সমৃদ্ধ করে তোলা হোক, তাহ'লে হিন্দিও সর্বপ্রকার কর্মের পক্ষে উপযোগী হ'য়ে উঠবে, এবং কালক্রমে ভারতের সবগুলি আত্মীয় ভাষা পরস্পরে মিশ্রিত হ'য়ে একটিমাত্র হিন্দিতে পরিণত হ'তে পারবে – যে-ভাষা হবে সত্যিকার অর্থে সার্বভৌম বা ন্যাশনাল, এবং ভারতীয় ঐক্যের স্থায়ী ভিত্তি। অর্থাৎ, অধিকাংশ সদস্যের ইচ্ছা, ভারতের অন্যান্য প্রধান ভাষাগুলি অশিক্ষিতের উপভাষায় পরিণত হোক, হ'য়ে যাক কালক্রমে অচলিত ও লুপ্তপ্রায়, ত্রয়োদশ-ভুজধারী হ'য়ে বিরাজ করুক একমাত্র হিন্দি। এবং তাঁদের সব অনুমোদনের পিছনে, প্রকাশ্য-বা প্রচ্ছন্নভাবে, এই উদ্দেশ্যই কাজ করছে। বলা বাহুল্য, এই দেশপ্রেমী পরিকল্পনার মধ্যে সংস্কৃতের স্থান হ'তে পারে না, কেননা শিক্ষার ক্ষেত্রে হিন্দির এক বিরাট প্রতিযোগী হবে সংস্কৃত। বাংলা অসমিয়া উড়িয়া আর থাকবে না, থাকবে না গুজরাটি বা মরাঠি, পঞ্জাবি আর উর্দু তো ইতিমধ্যেই হিন্দির মধ্যে গৃহীত হয়েছে, তামিল তেলুগু কানাড়া মলয়ালি আবদ্ধ হবে ঠাকুমা-দিদিমার প্রবচনে— এমনকি সংস্কৃতের শেষ স্থান হবে জাদুঘরের শ্মশানভূমিতে। এক পক্ষের এই আত্মত্যাগ ও অন্য পক্ষের এই পরস্বাপহরণের হেতু কী? না, ভারতীয় ঐক্য রক্ষা করা চাই। ঐক্যের নামে এইরকম ভাষামেধ-যজ্ঞের ষড়যন্ত্র অন্য কোনো জাতির ভাগ্যে ইতিপূর্বে ঘটেছে কিনা জানি না।

আমি দুঃস্বপ্ন দেখছি না ; সদস্যগণের সুখস্বপ্নকে বাস্তবের ভাষায় অনুবাদ করছি। যদি তাঁদের অনুমোদনগুলি কার্যে পরিণত হয়, আর তার পরে এক শতক বা অর্ধ শতক ধ'রেও ভাষাবিষয়ে একই ব্যবস্থা টি'কে থাকে, তাহ'লে ভারতের অন্যান্য প্রধান ভাষার এবং সেইসব ভাষাশ্রয়ী সাহিত্য ও সংস্কৃতির, ক্রমিক অবক্ষয় অনিবার্য। এক শতক বা অর্ধ শতক জাতির জীবনে অত্যল্পকাল এ-কথা এখন আর সত্য নেই ; আধুনিক সংঘপ্রকরণ ও যন্ত্রবিদ্যা তথাকথিত প্রগতির বেগ অত্যন্ত দ্রুত ক'রে দিয়েছে। আমরা যেন না ভুলি যে আজকের দিনে রাষ্ট্রের শক্তি অপরিমেয়, অতীতের কোনো অধ্যায়ে, ইতিহাসের নৃশংসতম অত্যাচারী সম্রাটের যুগেও রাষ্ট্র এমন পরাক্রান্ত ছিলো না। ছিলো না, তার কারণ এমন কোনো যন্ত্র বা ব্যবস্থা তখন আবিষ্কৃত হয় নি, যার দ্বারা প্রত্যক্ষ -ও পরোক্ষভাবে, দিনের পর দিন, কর্মের ও বিশ্রামের প্রতিটি মুহূর্তে সমগ্র প্রজাবৃন্দের মনের উপর রাষ্ট্র তার অভিপ্রেত প্রভাব বিস্তার করতে পারে। উপরন্তু, গণতান্ত্রিক দেশ হ'য়েও ভারতের বর্তমান রাষ্ট্রে একনায়কত্বের কোনো-কোনো লক্ষণ অঙ্গীকৃত হয়েছে। পাশ্চাত্ত্য গণতন্ত্রসমূহের তুলনায়, এখানে স্বাধীন উদ্যমের ক্ষেত্র অনেক সংকীর্ণ। আমাদের বাণিজ্য সম্পূর্ণ স্বাধীন নয়, পঞ্চবার্ষিকী সংকল্পের অনুগামী। আমাদের শিক্ষাতন্ত্র সম্পূর্ণ আত্মবশ নয়, কেননা বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ধনীর বদান্যতায় পুষ্ট হ'তে পারে না, তাদের জীবিকার প্রধান বা অনন্য নির্ভর রাজকোষ। আমাদের রেডিওতে ইংলণ্ডের মতো স্বাবলম্বিতা বা মার্কিনদেশের মতো স্বাধীনতা নেই ; তা একান্তভাবে রাষ্ট্র-কর্তৃক অধিকৃত। আমাদের সংবাদপত্রগুলির স্বাধীনতা আইনত বহুদূর পর্যন্ত আছে তা সত্য, কিন্তু সে-স্বাধীনতা তাঁরা যে সব সময় ব্যবহার করতে চান বা করতে পারেন এমন প্রমাণ আমরা এখনো পাই নি ; কোনো নেপথ্যসংকেতে তাঁদের কোনো মূলনীতি বা কর্মসূচির রাতারাতি বদল হ'তে আমরা দেখি নি তা নয়। আর যেখানে প্রত্যক্ষ-ভাবে কর্তৃত্ব চলে না, সেখানেও পরোক্ষভাবে প্রভাববিস্তারে আমাদের রাষ্ট্র ক্রমশই অধিকতর সচেষ্ট হচ্ছেন। সাহিত্য, নাট্য ও ললিতকলার অকাদেমি এর উদাহরণ, গ্রন্থ ও চিত্রের জন্য পুরস্কার ঘোষণা এর উদাহরণ, রেডিও-কর্তৃক অনুষ্ঠিত 'সাহিত্য-সমারোহ' এর উদাহরণ, আন্তর্বিশ্ববিদ্যালয়িক যুব-উৎসবও এর উদাহরণ। সাহিত্য ও শিল্পকলার পরিপোষণের জন্য আমাদের রাষ্ট্র যে অকস্মাৎ ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছেন, এবং সেই উদ্দেশ্যে প্রজার অর্থ ব্যয় ক'রে বড়ো-বড়ো কার্যালয় স্থাপন করেছেন, এই ব্যাপারটাকে, একজন সাহিত্যিক হিশেবে, আমি সুলক্ষণ ব'লে মনে করতে পারি না : আমার মতে আধুনিক রাষ্ট্রের পক্ষে শিল্পীদের বিষয়ে উদারতম আচরণ হ'লো উপেক্ষা— একটি পরিচ্ছন্ন ও নিরভিমান উপেক্ষা। সেকালে রাজাদের পোষকতায় সৎসাহিত্যের সৃষ্টি হ'তে পেরেছিলো, এই নজির এখানে একেবারেই অচল ; কেননা সেকালে রাজা ছিলেন একজনমাত্র ব্যক্তি ; তাঁর শক্তি ছিলো, আধুনিক মানে, অতিশয় সংকীর্ণ, এবং কখনো-কখনো তিনি সজ্জনও হতেন। তার উপর, বিক্রমা-দিত্য থেকে ফ্রেডেরিক দি গ্রেট পর্যন্ত, কবিদের পোষণ ক'রে তাঁরা ব্যক্তিগত

অহমিকারই তৃপ্তিসাধন করেছেন, অন্তরালে কোনো রাষ্ট্রিক উদ্দেশ্য তাঁদের ছিলো না। ফলত, কবিরা তাঁদের মৌখিক চাটুকারিতা করলেও— ভলতেয়ার ফ্রেডেরিককে তাও করেন নি— স্বকর্মে স্বাতন্ত্র্যরক্ষা ক'রে চলতে পারতেন। কিন্তু একালের নৈর্ব্যক্তিক, যান্ত্রিক, অতিকায় ও সার্বিক শক্তিশালী রাষ্ট্র যখন শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষণের ভার নেয়, তার অর্থ দাঁড়ায় সেই স্বাধীনতার সংকোচন বা বিলুপ্তি, যে-স্বাধীনতা শুধু শিল্পীর নয়, দেশ, রাষ্ট্র, সমাজ ও সভ্যতার সবচেয়ে বড়ো সম্পদ। শিল্পীর জীবিকার জন্য সুখদায়ক ব্যবস্থা ক'রে রাষ্ট্র তার জন্য যে-মূল্য আদায় ক'রে নেয় সেই মূল্যই পরম ও একমাত্র ; তা ধ্বংস হ'লে শিল্পীর পক্ষে আরাম, সম্মান বা নিরাপত্তার কোনো অর্থ আর থাকে না, সমাজ হ'য়ে ওঠে কারাগারের মতোই সুশৃঙ্খল, নিয়মাধীন ও দুঃসহ। স্বাধীনতাই এই মূল্য, চিন্তার স্বাধীনতা, 'মানবো না' বলার স্বাধীনতা, দল ছেড়ে একলা হবার স্বাধীনতা। এরই ফলে যুগে-যুগে সমাজের নাড়ি নতুন ছন্দে সাড়া দেয়, সভ্যতার স্রোত ব'য়ে চলতে পারে। এই মূল্য যেখানে দলিত, যেখানে শিল্পীকে খাইয়ে-পরিয়ে মোটা ক'রে তুলে তার স্বাধীনতা হরণ করা হয়, সেখানে শিল্পের নামে কী-ধরনের প্রভুরঞ্জন জড়বস্তু নির্গত হ'তে থাকে, তার উদাহরণ আজ বহুদিন ধ'রে সোভিয়েট দেশ পৃথিবীর সামনে উপস্থিত করছে।

সমাজের মধ্যে যে-অংশ স্বভাবত সজাগ ও স্বনিষ্ঠ, সেই শিল্পীদেরও ক্রীড়নকে পরিণত করার শক্তি যখন আধুনিক রাষ্ট্র ধারণ করে, তখন তার পক্ষে এক দেশের বারোটি বা তেরোটি ভাষার বিলোপ ঘটিয়ে মাত্র একটিতে স্ফীত ক'রে তোলাও সম্ভবপরতার পরপারে নয়। এই কথাটিকে খুব স্পষ্ট ক'রে বুঝে নিতে হবে আমাদের : আজ ভাষা-কমিশন কাগজে-কলমে যে-সুখস্বপ্ন দেখছেন আগামী পঞ্চাশ বছর, এমনকি পঁচিশ বছরের মধ্যেও তাকে বাস্তবে পরিণত করার ক্ষমতা আছে রাষ্ট্রের, সত্যি-সত্যিই 'রাষ্ট্রভাষা'র প্রচণ্ড দাবিতে অন্য প্রত্যেকটি ভাষার অস্তিত্ব সুদ্ধ বিপন্ন হ'তে পারে, যদি না এখনই, এই মুহূর্তে আমাদের ভস্মাচ্ছাদিত শুভবুদ্ধি জ্বালাতে পারে একটি প্রতিবাদের স্ফুলিঙ্গ, দাঁড় করাতে পারে একটি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ প্রতিরোধ। 'কেন্দ্রিক ভাষা হিন্দি হয় তো হোক না, রাজ্যের মধ্যে মাতৃভাষা তো রইলোই', সরকারি কাজে ক-জন লোক আর যোগ দেবে, আর সেই ক-জনকে হিন্দি শিখতে হ'লে ক্ষতি কী', আমরা বাঙালিরা হিন্দির চাপে বাংলার চর্চা ভুলে যাবো ? পাগল !'— এই ধরনের চিন্তা বা চিন্তাহীনতার মূলে কত বড়ো আত্মপ্রতারণা বিরাজ করছে, একটুখানি বিশ্লেষণেই তা ধরা পড়ে। যদি— কমিশনের দুটি মাত্র অনুমোদন বেছে নেয়া যাক— যদি ভারতের সরকারি সিংহাসনে হিন্দিকে অনন্যভাবে বসানো হয়, আর প্রত্যেক ভারতীয় প্রজাকে বাধ্য করা হয় শৈশব থেকে বা শৈশবকালে হিন্দি শিখতে, তাহ'লে অন্যান্য ভাষা প্রথমে যদি বা চামরধারিণী, বা করঙ্কবাহিকার মর্যাদা পায়, শেষ পর্যন্ত তাদের স'রে যেতে হবে নেপথ্যে, ভারতীয় পটভূমি ছেড়ে অপরিচয়ের ধূসরতায়। ভারতবাসী তাদের ভাষা বলতে হিন্দিকেই বুঝবে, সারা জগৎ ভারতীয় ভাষা বলতে শুধু হিন্দিকেই বুঝবে। আর

তা ঘটতে খুব বেশি দেরিও হবে না, কেননা ইতিমধ্যেই— স্বাধীনতার পর মাত্র এই দশ বছরের প্রচারের ফলে— ভারতের বাইরে কোনো-কোনো দেশ হিন্দিকেই মেনে নিয়েছে ভারত-ভাষার নামান্তর ব'লে, পাশ্চাত্ত্য ভূখণ্ডে হিন্দির চর্চা বর্ধমান, এবং আমরা নিজেরা— এমনকি বাঙালিরাও— মাতৃভাষাকে 'আঞ্চলিক' ও হিন্দিকে 'জাতীয়' ভাষারূপে অক্লেশে উল্লেখ ক'রে থাকি। হিন্দি ভারতের একমাত্র সরকারি ভাষা— শুধু এই সূত্রটি গৃহীত হ'লে অন্য সব স্বতই ঘটতে থাকবে; আইনত আবশ্যিক না-হ'লেও ছাত্রগণ নিজের গরজেই হিন্দি শিখবেন— যাঁরা রাজনৈতিক বা রাজপুরুষ, বাণিজ্য-বা জ্ঞানজীবী হবার উচ্চাশা রাখেন শুধু তাঁরাই নন, কষ্টেসৃষ্টে বেঁচে থাকার উপরে অল্প একটু আকাঙ্ক্ষা করলেও হিন্দি ভিন্ন এগোনো যাবে না। আমাদের মনে রাখতে হবে যে সরকারি কাজে যাঁরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যোগ দেবেন, এমন লোকের সংখ্যা অচিরেই নগণ্য ছেড়ে অগণ্যে পৌঁছবে; পঞ্চবার্ষিকী সংকল্পের পারম্পর্যের ফলে রাষ্ট্রের সূক্ষ্ম কুটিল শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে পড়বে লৌকিক জীবনের স্তরে-স্তরে, জীবিকার এমন ক্ষেত্র কমই থাকবে যাতে সরকারি প্রভাব কোনো-না-কোনো ভাবে প্রবিষ্ট হবে না। আর এ-কথাও ভুলে থাকা অসম্ভব— কেননা এখনই তার বহু প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে— যে একবার 'রাষ্ট্রভাষা' বা 'জাতীয় ভাষা'রূপে প্রতিষ্ঠা পেলে হিন্দি হ'য়ে উঠবে কৌলীন্যের ধ্বজা, ফ্যাশানের আশ্রয়, স্নবারির একটি প্রধান সরঞ্জাম; শুধু চাকরিতে উন্নতির জন্য নয়, জাতে উঠতে হ'লেও প্রয়োজন হবে তার; এমন সুখীজন যাঁরা অবশিষ্ট থাকবেন যাঁদের দায়ে প'ড়ে শিখতে হবে না তাঁরাও অনেকে গায়ে প'ড়ে হিন্দি শিখবেন। এবং যাঁরা রাষ্ট্রপোষিত কৌলীন্যের বাইরে নিজ-নিজ বিনীত কর্ম নিয়ে জীবন কাটাবেন, সেই বিরাট জনসাধারণের মনেও হিন্দির একটি বিশেষ স্থান অবধারিত হবে: জাতীয় পতাকা বা জাতীয় সংগীতের মতো 'জাতীয় ভাষা'ও হ'য়ে উঠবে একটি প্রতীক, চিন্তাহীন ভক্তি ও আত্মনিবেদনের পাত্র; গ্রামের চাষি, ঘরের বৌ, মফস্বলের ছোটো দোকানদার— এমন কেউ থাকবেন না যিনি এক বর্ণ হিন্দি না-জেনেও, বা হিন্দির দ্বারা কোনো সুবিধে না-পেয়েও, ঐ ভাষাকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা না করবেন। সব ভাষাকেই শ্রদ্ধা করা ভালো; কিন্তু এ-ক্ষেত্রে তার সঙ্গে থাকবে নিজ-নিজ মাতৃ-ভাষার প্রতি অবজ্ঞা, এবং সেই অবজ্ঞাটা মারাত্মক। এই যে মনস্তত্ত্বগত প্রভাব, এর শক্তি হিশেব ক'রে বোঝা যায় না; আইনের দ্বারা হিন্দির অধিকার যতই বেঁধে দেয়া হোক, সংবিধানে অন্যান্য ভাষাকে যে-কোনো ভাবেই স্বীকার করা হোক না— 'হিন্দি ভারতের জাতীয় ভাষা বা রাষ্ট্রভাষা', শুধু এই সূত্রটি সর্বসাধারণের মনে জাদুমন্ত্রের মতো কাজ করবে। এরও প্রমাণ ইতিমধ্যেই আমরা পাচ্ছি না তা নয়; পশ্চিম বাংলার বহু বেসরকারি বিদ্যালয়ে হিন্দি এখনই আবশ্যিকভাবে পড়ানো হচ্ছে, যদিও সে-বিষয়ে সরকারের কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশ নেই। স্কুল-কর্তৃপক্ষের যুক্তি বোধ হয় এই: 'কিছুদিন পরে তো শিখতেই হবে, এখনই আরম্ভ করা ভালো।' আজ যেটা প্রস্তাব, সেটা যদি দু-দিন পরে তথ্য হ'য়ে ওঠে তাহ'লে এই যুক্তি আরো

কত বিরাট আকারে সর্বভারতে ব্যাপ্ত হবে, সে-কথাও কি বুঝিয়ে বলা দরকার? সর্বসাধারণ কোনো কথাই তলিয়ে ভেবে দ্যাখে না— সেটা আশা করাও সম্ভব নয়— 'জাতীয় ভাষা'র প্রতীকী মূল্যের জন্যই তার কাছে আত্মসমর্পণ করবে তারা। তাছাড়া উন্নতি জিনিশটা সকলেরই কাম্য, ব্যক্তিগত -ও বংশগতভাবে এক ধাপ উপরে উঠতে না চায় এমন লোক সর্বত্রই বিরল; এবং হিন্দি না-জানলে উন্নতি যদি অসম্ভব হয় তাহ'লে, কাগজে-কলমে তার 'চাপ' যতই মৃদু হোক না, অহিন্দিভাষী ভারতীয় প্রজা মাতৃভাষাকে উপেক্ষা করতে ইচ্ছুক অথবা বাধ্য হবে।

এখানে ইংরেজির কথা আর-একবার বিবেচ্য: কেন, যদি ইংরেজ আমলে ইংরেজির প্রভাবে মাতৃভাষাকে আমরা উপেক্ষা না-ক'রে থাকি, হিন্দির জন্যেই বা মাতৃভাষাকে ভুলতে হবে? এর উত্তরে বহু কথা বলা যেতে পারে, আমি শুধু একটি বিষয়ের উল্লেখ করছি। আজকের দিনে হিন্দি যেমন সর্বভারতে সর্বসাধারণের সমগ্র জীবনকে অধিকার করতে চাচ্ছে, এইরকম বিরাট দাবি ইংরেজি ভাষার কখনোই ছিলো না, তা সম্ভবও ছিলো না তার পক্ষে। ইংরেজ রাজত্ব ছিলো বৈদেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী; দেশের জনসাধারণের সঙ্গে ক্ষীণ ছিলো তার সংযোগ; কলকাতা-দিল্লির ঘটনাবলি বিষয়ে সম্পূর্ণ অচেতন থেকে কোটি-কোটি গ্রামীণ মানুষ বংশ-পরম্পরায় তাদের অভ্যস্ত জীবন যাপন ক'রে গেছে। কিন্তু আজকের দিনে রাষ্ট্রের প্রভাব সর্বত্র পরিকীর্ণ এবং সেই প্রভাব থেকে সর্বসাধারণের হৃদয়াবেগও মুক্ত নয়, কেননা তার পিছনে আছে স্বাধীনতা লাভের গৌরব, স্বাজাত্যবোধের অভিমান। বলা বাহুল্য, রাষ্ট্রের প্রভাব যত ব্যাপক, 'রাষ্ট্রভাষা'র প্রভাবও ঠিক তা-ই হবে। ইংরেজির যা ছিলো না — আর এখনও নেই— হিন্দির আছে সেই স্বদেশীয়তার স্বাক্ষর; সেটা তার মস্ত সুবিধে, আর সেইজন্যই তা এত বেশি বিপজ্জনক। হিন্দিকে আত্মনিবেদনের চরম অর্থ যে মাতৃভাষার প্রতি প্রতারণা— এই কথাটা অধিকাংশের মনে ধরা দেবে না, এবং অধিকাংশকে বোঝানো কঠিন হবে। প্রশংসনীয় দেশপ্রেমের প্ররোচনায় হিন্দিকে গ্রহণ করবো আমরা, নিজে না-জেনে ও না-বুঝে ক্রমশ মাতৃভাষাকে ভুলতে থাকবো। ভুলতে থাকবো, তার কারণ এই মনোভাব তৈরি হ'তে দেরি হবে না (এখনই কিছুটা তৈরি হয়েছে) যে হিন্দি যেহেতু ভারতীয় ভাষা, এবং আমরা সকলেই ভারতীয়, তাই হিন্দিকে আমাদেরই স্বভাষা বললে ভুল হয় না। অন্য দিক থেকেও মাতৃভাষার বিনাশের আশঙ্কা ভয়াবহরূপে বাস্তব— বিশেষত উত্তর-ভারতের পক্ষে। শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর একটি সাম্প্রতিক প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে বাংলা আর হিন্দি খুব কাছাকাছি ভাষা ব'লেই, বাঙালি শিশুকে হিন্দি শেখানো হ'লে, সে বাংলা নামে যে-ভাষাটি শিখবে সেটি আর ঠিক বাংলা থাকবে না। এই দুই ভাষায় বহু সামান্য শব্দ আছে, কিন্তু তাদের বানানে ও উচ্চারণে মিল নেই: একই সঙ্গে 'দশ' ও 'দস', 'কাহিনী' ও 'কহানী' শেখানো হ'তে থাকলে শিশুর শুদ্ধাশুদ্ধ-জ্ঞান বিপর্যস্ত হবে। ফলত সে খুব সম্ভব বাংলা বা হিন্দি কোনোটাই ঠিকমতো শিখবে না, দুয়ের মিশ্রণে তৈরি ক'রে নেবে এক

হিন্দি-ঘেঁষা বাংলা অথবা বাংলা-ঘেঁষা হিন্দি। এবং এই দুর্বিপাকের সম্মুখীন হবে উত্তরভারতের প্রত্যেকটি ভাষা, দাক্ষিণী ভাষাগুলিও এই সংকট পুরোপুরি এড়াতে পারবে না। আর যেহেতু ভাষা-কমিশনের পরামর্শ অনুসারে সর্বভারতের সকল প্রজাকে হিন্দি শিখতে হবেই, কিন্তু হিন্দিভাষীকে অন্য কোনো ভাষা না-শিখলেও চলবে, তাই এই চোদ্দামিশেলি নবব্যঞ্জনের প্রধান উপাদান হবে হিন্দি, অন্যান্য ভাষা হিন্দির গড়ন এড়াতে পারবে না কিংবা অন্য সব ভাষা ক্রমশ ক্ষ'য়ে-ক্ষ'য়ে পুষ্ট ক'রে তুলবে একটি মাত্র ভারতীয় ভাষাকে, যা ঠিক এখনকার হিন্দিও হয়তো আর থাকবে না, কিন্তু যাকে হিন্দি ব'লেই নির্ভুলভাবে চেনা যাবে— বাংলা মরাঠি অথবা তেলুগু ব'লে কখনোই ভুল হবে না। অর্থাৎ, ভাষা-কমিশনের উন্মত্ত উচ্চাশা পূর্ণ হবে তখন, হিন্দির মধ্যে অন্য সব ভারতীয় ভাষার বেলুপ্তি ঘটবে।

স্বাভাবিক 'জাতীয়' ভাষা তাকেই বলে, যে-ভাষা একটি দেশের সমগ্র বা বহুলভাবে অধিকাংশ প্রজাবৃন্দের মাতৃভাষা। এই অর্থে ভারতবাসীর কোনো সামান্য বা 'জাতীয়' ভাষা অতীতের কোনো অধ্যায়েই ছিলো না। তা নিয়ে কোনো আক্ষেপও ছিলো না কারো মনে, কেননা কোনো পূর্বযুগে নেশন অর্থে জাতি ছিলুম না আমরা। 'নেশন' শব্দের কোনো প্রতিশব্দও নেই ভারতীয় ভাষায়, ন্যাশনাল অর্থে 'জাতীয়' কথাটা এখন পর্যন্ত কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক শোনায়। অন্য অনেক কিছুর মতো, নেশনত্বের ধারণাও আমরা পশ্চিম থেকে আহরণ করেছিলাম, এবং আজকের দিনে, স্বাধীনতার পরে, বৈশ্বিক ন্যাশনালিজম-এর সায়াহ্নকালে, আমরা কিছুটা করুণভাবে বদ্ধপরিকর হয়েছি পুরোপুরি ও পাকাপাকি একটি নেশন হ'য়ে উঠতে। যেহেতু ভারতবাসীরা এক জাতি বা নেশন, সেহেতু ভারতে একটি 'ন্যাশনাল' ভাষাও চাই, এই যুক্তির যান্ত্রিক উপযোগে অনেকেই সম্মোহিত হ'য়ে আছেন। তাঁরা, পুরোপুরি হিন্দিকে সমর্থন না-ক'রেও, প্রায়ই ব'লে থাকেন, 'অতীতে ছিলো না ব'লে ভবিষ্যতেও কি একটি সামান্য ভাষা হ'তে পারবে না আমাদের? তা হওয়া কি বাঞ্ছনীয় নয়?'— কিন্তু কোনো কিছুকে বাঞ্ছনীয় ব'লে স্বীকার করলে তার জন্য সচেষ্ট হওয়া নিশ্চয়ই আমাদের কর্তব্য, এবং সামান্য বা 'জাতীয়' ভাষাকে বাঞ্ছনীয় বলার অর্থই হ'লো হিন্দির একাধিপত্যে সানন্দ সম্মতিদান। আসল প্রশ্নটা এই: কোনটা বেশি বাঞ্ছনীয়— একটি 'জাতীয়' ভাষাকে নির্মাণ ক'রে নেয়া, না কি আমাদের নিজ-নিজ মাতৃভাষার স্বাভাবিক ক্রমবিকাশ? কোনটা আমাদের মনুষ্যত্বের পক্ষে বেশি জরুরি – নিজ-নিজ মাতৃভাষার সমৃদ্ধি, না কি এমন একটি ভাষা যা এই মহাদেশতুল্য ভারতভূমিতে সকলেরই ব্যবহার্য হবে? সংলগ্ন আর-একটি প্রশ্নও উত্থাপন করতে হয়; ভারতীয় চিত্তের পুষ্টি ও প্রকাশের পক্ষে কোনটা বেশি অনুকূল: বৈচিত্র্য না একীকরণ, স্বরসংগতি না ঐক্যতান? এবং এ-দুয়ের মধ্যে যেটি কাম্যতর, অন্যটি যদি স্পষ্টত তার বিরোধী হয়, তাহ'লে আমাদের কর্তব্য কী?

খুব সম্ভব আগামী পঁচিশ বা পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই একটি 'জাতীয়' ভাষার অধিকারী হ'তে পারি আমরা, যদি ভাষা কমিশনের মূল প্রস্তাবগুলিতে সম্মত হই।

সেই প্রস্তাবগুলি— শুধু মেনে নিলে নয়— প্রয়োগের জন্য একযোগে সচেষ্ট হ'লে, তবেই তা সম্ভব হ'তে পারে, নচেৎ কোনোমতেই নয়। যদি 'জাতীয়' ভাষাই কাম্যতর মনে হয়, তাহ'লে মাতৃভাষার প্রতি ওষ্ঠপ্রীতি পরিহার ক'রে হিন্দিকেই সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করতে হবে আমাদের। মাতৃভাষার বিকাশ ও 'জাতীয়' ভাষার উত্থান— এ-দুই ভারতভূমিতে যুগপৎ সম্ভবপর, কেউ যেন এমন মোহকে ভ্রমক্রমেও প্রশ্রয় না দেন। ভারতবর্ষে একটি 'জাতীয়' ভাষা বা সামান্য ভাষা তৈরি হ'য়ে উঠতে পারে শুধু এই শর্তে যে অন্য প্রত্যেকটি ভাষার গতিপথ রুদ্ধ ক'রে দেয়া হবে, এবং সেই অবরোধে সহায়তা করবেন তাঁরাই, যাঁদের বলা যেতে পারে সেই-সেই ভাষারই সন্তান। সে-দুর্দিন যদি কখনো আসে, যদি জাতীয়তাবাদের ফুটন্ত কটাহে ভারতবাসীরা তাঁদের প্রাণরস পর্যন্ত জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত হন, তাহ'লে দুটির মধ্যে একটি সম্ভাবনাকে নিশ্চিত ব'লে ধ'রে নেয়া যায়। এক হ'তে পারে— বাঙালি, মরাঠি, তামিল প্রভৃতি অভিজ্ঞান ভুলে গিয়ে আমরা সকলেই 'ভারতীয়' নামক এক অর্ধ-কাল্পনিক ধারণার মধ্যে নিবিষ্ট হবো; আমরা যে মূলত মানুষ, সেই মহাসত্যকে অস্বীকার ক'রে হ'য়ে উঠবো শুধু মাত্র প্রজা, একটি প্রয়োজনীয় জীব— কিংবা জীব পর্যন্ত নয়, বৃহদাকার রাষ্ট্রযন্ত্রের একটি আণুবীক্ষণিক অংশ মাত্র। কিংবা, যেহেতু তামিল, মরাঠি, বাঙালি প্রভৃতি অভিজ্ঞান এক-একটি সপ্রাণ পদার্থ যার পিছনে আছে বহুযুগের বিশেষ-বিশেষ সাধনার ধারা, সেইজন্য এমন সম্ভাবনাও প্রবল যে কিছুদিন পরে, আপন-আপন ভাষা ও সংস্কৃতির অবমাননা ও অবক্ষয় লক্ষ্য ক'রে, অহিন্দিভাষী সমগ্র ভারতে বিচ্ছেদপ্রবণ বিদ্রোহ জেগে উঠবে। দুয়ের মধ্যে প্রথমটি মনুষ্যত্বের প্রতিকূল, দ্বিতীয়টি আমাদের রাষ্ট্রিক ঐক্যের পক্ষে মারাত্মক। প্রথমটির অর্থ ভারতবর্ষের আবহমান ইতিহাসের প্রত্যাখ্যান, দ্বিতীয়টির অর্থ ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎকে বিপন্ন ক'রে তোলা। যে-বৈচিত্র্যবিন্যাসে ভারতবর্ষীয় প্রতিভার মৌলিক বৈশিষ্ট্য তারই মূলোচ্ছেদ হবে প্রথমটিতে, আর দ্বিতীয়টি ঘটলে আমাদের স্বাধীনতাই রক্ষা পাবে কিনা সন্দেহ। এ-দুয়ের মধ্যে কোনোটাকেই কাম্য বলা যায় না। অতএব এই সমস্যার সমাধানে আপোশ অথবা বিলম্বের অনুমোদন করলে কিছুই লাভ হবে না; সবচেয়ে ভালো এখনই এমন কোনো ব্যবস্থা করা, যাতে আমরা নিজেদের বাঙালি ব'লে অনুভব করতে পারি, ভারতীয় ব'লে জানতে পারি, আর সর্বোপরি ভুলে না যাই যে আমরা মানুষ এবং ব্যক্তি, রাষ্ট্রের কলে তৈরি পুতুল নই।

১৯৫৭ 'স্বদেশ ও সংস্কৃতি'

রবীন্দ্রনাথের শেষজীবন

কঠিন রোগসংকটের ছায়ায়, দেশব্যাপী জয়ধ্বনির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের আশি বছর পুরলো। শুনেছিলুম তাঁর রোগযন্ত্রণার, তাঁর ইন্দ্রিয়বিকলতার কথা ; মনে ভয় ছিলো, কেমন না জানি তাঁকে দেখবো। হয়তো দু-একটির বেশি কথা বলবেন না, হয়তো আগেকার মতো নিঃসংশয় নিঃসংকোচে তাঁর পাশে গিয়ে বসা চলবে না। দেখে ভুল ভাঙলো। প্রথম দিন সন্ধ্যায় তাঁকে দেখলুম বাইরের বারান্দায়, মনে হ'লো ক্লান্ত, রাত্রির আসন্ন ছায়ায় ভালো ক'রে যেন দেখতে পেলুম না। পরের দিন সকালে যখন তাঁর কাছে গেলুম, তিনি ব'সে ছিলেন দক্ষিণের ঢাকা বারান্দায়। পরনে হলদে কাপড়, গায়ে শাদা জামা। পাশে একটি থালায় বেলফুলের স্তূপ। মুখ তাঁর শীর্ণ, আগুনের মতো গায়ের রং ফিকে হয়েছে, কিন্তু হাতের মুঠি কি কব্জির দিকে তাকালে বিরাট বলিষ্ঠ দেহের আভাস এখনো পাওয়া যায়। কেশরের মতো যে-কেশগুচ্ছ তাঁর ঘাড় বেয়ে নামতো তা ছেঁটে ফেলা হয়েছে, কিন্তু মাথার মাঝখান দিয়ে দ্বিধা-বিভক্ত কুঞ্চিত শুভ্র দীর্ঘ কেশের সৌন্দর্য এখনো অম্লান। মনে হ'লো তাঁর চোখের সেই মর্মভেদী তীক্ষ্ণ ভাবটা আর নেই। তিনি যখন কারো দিকে তাকান সে-চাহনি স্নিগ্ধকোমল। এইজন্যে তাঁকে মোগল বাদশাহের মতো আর লাগে না, বরং অশীতিপর টলস্টয়ের ছবির সঙ্গে কোথায় যেন সাদৃশ্য ধরা পড়ে। এই অপরূপ রূপবান পুরুষের দিকে এখন স্তব্ধ হ'য়ে তাকিয়ে থাকতে হয়, যেমন ক'রে আমরা শিল্পীর গড়া কোনো মূর্তি দেখি। এত সুন্দর বুঝি রবীন্দ্রনাথও আগে কখনো ছিলেন না, এর জন্যে এই বয়সের ভার আর রোগদুঃখভোগের প্রয়োজন ছিলো। বর্নার্ড শ একবার এলেন টেরির জন্মদিনে একটি পদ্য লেখেন, তাঁর বলবার কথাটা ছিলো এইরকম যে এ কী আশ্চর্য কাণ্ড যে বছর-বছর আমাদের বয়স বাড়ে আর এলেনের বয়স ক'মে যায়! বয়স যত বেড়েছে রবীন্দ্রনাথ ততই সুন্দর হয়েছেন এ-কথা তাঁর বিভিন্ন বয়সের ছবি ধারাবাহিকভাবে দেখলেই বোঝা যাবে। কিছুদিন আগেও তাঁর মুখে তীব্র একটি উজ্জ্বলতা ছিলো, চোখ যেন ধাঁধিয়ে যেতো, বিরাট সভার মধ্যেও অন্য প্রত্যেকটি মুখ তুলনায় মনে হ'তো ম্লান। সে-ও সুন্দর, কিন্তু আজ তাঁর শীর্ণ মুখে যে-সন্ধ্যারাগের কমনীয়তা দেখা দিয়েছে, দৃষ্টিতে ফুটেছে যে-সকরুণ আভা, সৌন্দর্যের এ-ই বোধ হয় চরম পরিণতি।…

তাঁকে দেখে, তাঁর কথা শুনে যখন বেরিয়ে আসতুম, রোজই নতুন ক'রে মনে হ'তো যে সমস্ত জীবন ধন্য হ'য়ে গেলো। তাঁর কথা যেন বর্ণাঢ্য গীতিনিস্বন, যেন সুরস্রাবী ইন্দ্রধনু। তা যেমন শ্রুতিসুখকর তেমনি মনোবিমোহন। বাংলা ভাষার

উপর তাঁর প্রভুত্ব যে কী বিরাট তা তাঁর মুখের কথা না-শুনলে ঠিক ধারণা করা যায় না। তিনি কথা বলেন হুবহু তাঁর শেষের দিককার গদ্য বইগুলোর মতো, অতি সাধারণ কথাকেও অসাধারণ ক'রে বলবার ক্ষমতায় তাঁর গল্পের সকল পাত্রপাত্রীকে তিনি হার মানান, উপমা রূপক থেকে-থেকে ফুটে উঠছে, হঠাৎ অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত মুহূর্তে ঝিলিক দিচ্ছে কৌতুক! তাঁর নিটোল, সুন্দর, স্বর্ণঝংকৃত কণ্ঠস্বর, আর তাঁর উচ্চারণের স্পষ্ট, দৃঢ় অথচ ললিত ভঙ্গির সঙ্গে সকলেই তো পরিচিত, তাঁর মুখে শুনলে বাংলাকে অনেক বেশি জোরালো ও মধুর ভাষা ব'লে মনে হয়। তাঁর অভ্যর্থনার মধুরতা ও আলাপের আন্তরিকতা ভোলবার নয়। অত্যন্ত কুণ্ঠিত হ'য়ে থাকতুম পাছে বেশিক্ষণ থাকা হ'য়ে যায়, পাছে তাঁর কাজের কি বিশ্রামের ক্ষতি করি। তিনি একটু থামলেই মনে হ'তো এখন বোধহয় ওঠা উচিত। কিন্তু তিনি একটার পর একটা নতুন প্রসঙ্গ পাড়তেন— এখানে অনেকেই বললেন যে এত কথা আর এত ভালো কথা কবি অনেকদিন বলেন নি। তাঁর একটি মহৎ গুণ এই যে যখন যাকে কাছে ডাকেন তার প্রতি সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করেন, কারো উপস্থিতিতে উন্মনা কি উদাসীন ভাব তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। হয়তো অনেক সময় দু-চার মিনিটেই কথা শেষ করেন, কিন্তু সেই অল্প সময়েই একটি সরস পরিপূর্ণতার স্বাদ আসে— তিনি যে মস্ত একজন কাজের লোক, তাঁর সময় যে মহামূল্য এ-ভাবটা তাঁর মধ্যে কখনোই ফোটে না। অন্নদাশঙ্কর একবার লিখেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথের কাছে যখনই যাওয়া যায় তখনই মনে হয় তাঁর অফুরন্ত সময়, কোনো কাজই তাঁর নেই। খুব সত্য এ-কথা। ব্যস্ততার ভাব তাঁর স্বভাবে একেবারেই নেই, তাড়াহুড়োর খ্যাপামি কখনো তাঁকে ছোঁয় না; অন্তহীন কাজ নিয়ে অন্তহীন ছুটির মধ্যে তিনি ব'সে আছেন। যখনই যার সঙ্গে কথা বলেন মনে হয় ঠিক ঐ লোকটির সঙ্গে কথা বলা ছাড়া আর-কোনো কাজই নেই তাঁর। তার তুলনায় অতি সামান্য অতি তুচ্ছ কাজ যাঁরা করেন তাঁরাও ব্যস্ততার ঠেলায় নিজেরাও হাঁপিয়ে ওঠেন, অন্যদেরও হাঁপ ধরান; যে-রকম শুনি তাতে বোঝা যায় যে য়োরোপের ক্ষুদ্র লেখকদেরও সাক্ষাৎ পেতে হ'লে বিস্তর বেগ পেতে হয়— এদিকে রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে রয়েছে একটি অকুণ্ঠিত মুক্তি, তাঁর দুয়ার সব সময়েই খোলা। নানা দেশ থেকে নানা লোক আসে তাঁকে দেখতে, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে, পারতপক্ষে কাউকেই প্রত্যাখ্যান করেন না; তাঁর উপর ছোটোবড়ো কত যে দাবি তার অন্ত নেই, সাধ্যমতো সবই পূরণ করেন। সেদিন পর্যন্তও নিজের হাতে সব চিঠির জবাব দিয়েছেন, এমনকি পত্রিকায় প্রকাশের জন্য লেখা পাঠিয়েছেন তাও নিজের হাতে নকল ক'রে। এত কাজের সঙ্গে এত অবকাশকে তিনি কেমন ক'রে মেলাতে পারলেন এ একটা রহস্য হ'য়ে রইলো।

আমরা যখন গিয়েছিলুম রবীন্দ্রনাথ থাকতেন 'উদয়ন'-এর একতলার দক্ষিণ দিকের ঘরগুলিতে। অসুখের পরে তিনি একটু গ্রীষ্মকাতর হ'য়ে পড়েছেন, তাই তাঁর শোবার ঘরে ঠাণ্ডাই যন্ত্র বসানো হয়েছে। ঘরটি বৃহৎ নয়। এক দিকে দেয়াল-

লগ্ন লম্বা টেবিলে সারে-সারে ওষুধ পথ্য শিশি বোতল গেলাশ। আর আছে একটি খাট, একটি ইজিচেয়ার, ছোটো বুক-কেসে কিছু বই, আর অভ্যাগতদের বসবার জন্য কয়েকটি চামড়া আঁটা মোড়া। দেয়ালে তাঁর নিজের আঁকা খান দুই, আর চীনে চিত্রী জুপিয়ঁর একটি ঘোড়ার ছবি, তা ছাড়া একখানা জাপানি মেঘের দৃশ্য। পাশে আর-একটি ঘর, সেটি আরো ছোটো। সমস্ত পৃথিবী, পৃথিবীর সব পর্বত প্রান্তর সমুদ্র নদী নগর, সমস্ত সঙ্গ ও নির্জনতা আজ কবিজীবনে এসে মিলেছে ঐ দুটি ছোটো ঘরে আর দু-দিকের বারান্দায়।

রবীন্দ্র-জীবনের এই অধ্যায়টি মহাকাব্যের উপাদান। মনে করা যাক দিগ্বিজয়ী একজন রাজা, ঐশ্বর্যের সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতায় যাঁর জীবন কেটেছে, একদিন ভাগ্যের কুটিলতায় তাঁকে রিক্ত হ'তে হ'লো। রাজত্ব রইলো, রইলো অন্তরের রাজকীয়তা, কিন্তু যে-সব পথ দিয়ে রাজার সঙ্গে রাজত্বের যোগাযোগ, সেগুলো বন্ধ হ'য়ে গেলো। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিপ্রেরণা অক্ষুণ্ণ, অক্লান্ত তাঁর প্রতিভার উদ্যম, কিন্তু দেহের যে-সামান্য কয়েকটা যন্ত্রের সাহায্য ছাড়া শিল্পরূপ প্রকাশিত হ'তে পারে না, তারা ঘোষণা করেছে অসহযোগ। যে-কবি বলেছিলেন, 'ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করি যোগাসন সে নহে আমার', তাঁর ইন্দ্রিয়ের দরজাগুলো একে-একে বন্ধ হ'য়ে আসছে। দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ, চোখের সঙ্গে বই লাগিয়ে অতি কষ্টে পড়তে হয়, তবু পড়েন। শ্রবণশক্তি নিস্তেজ, আঙুল দুর্বল, তুলি ধরবার মতো জোর নেই, কলমও কেঁপে যায়। তিনি নাকি বলেন, 'বিধাতা মুক্তহস্তেই দিয়েছিলেন, এবার একে-একে ফিরিয়ে নিচ্ছেন। ভেবেছিলুম শেষ জীবন ছবি এঁকে কাটাবো, তাও হ'লো না।' তাঁর মানস-লোকে ছবিরা ভিড় ক'রে আসে, ওদের রঙে রেখায় ফোটানো হয় না, ফিরে যায় তারা প্রেতলোকে। মন জ্বলন্ত, হাত চলে না। ক্ষণে-ক্ষণে প্রাণে লাগে সুর, কণ্ঠে জাগে না— ছবির মতোই শূন্যে হারিয়ে যাচ্ছে গীতস্রোত। নানা শিল্পকর্মের মধ্যে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় যে-গান, তার পালাও ফুরোলো। যেদিন বৃষ্টি নামলো, সন্ধেবেলা গিয়েছিলুম কবির কাছে। উদয়নের বড়ো বসবার ঘরটিতে দেখলুম রবীন্দ্রনাথের গানের অনেকগুলি রেকর্ড বাইরে প'ড়ে আছে— কবি খানিক আগে শুনছিলেন। তিনি ছিলেন ভিতরের দিকের ছোটো ঘরটিতে, খুব ক্লান্ত ছিলেন সেদিন। আমরা যেতে বললেন, 'একটা বর্ষার গান evoke করবার চেষ্টা করছিলুম— এখন আর হয় না।' শান্তিনিকেতনে বর্ষা এসে কবির অভিনন্দন পেলো না এমন ঘটনা বোধ হয় এই প্রথম।

আর তাঁর জীবনের চিরসঙ্গী— তাঁর লেখা? ষোলো বছর বয়স থেকে গদ্যে পদ্যে নানা রূপে নানা বিষয়ে কোটি-কোটি শব্দ যিনি লিখে এসেছেন, তিনি এখন কলম ধরতে পারেন না, নামটা সই করতে কষ্ট হয়। তবু রচনার বিরাম নেই; 'জন্মদিনে' পর্যন্ত নিজের হাতেই লিখেছেন, আজকাল মুখে-মুখে ব'লে যান, যে-কথা পছন্দ হয় না বার-বার তার অদল-বদল করেন, তবু সংশয় থেকে যায় ঠিক কথাটি

ঠিকমতো বুঝি বলা হ'লো না। আজকাল তাই নিজের রচনা সম্বন্ধে তাঁর অদ্ভুত বিনয়। শরীর যত বড়োই শত্রুতা করুক, রচনায় কোনোরকম অপরিচ্ছন্নতা তিনি সইতে পারেন না ; ছোটোদের নাম ক'রে গদ্যে-পদ্যে 'গল্পসল্প' লিখেছেন, তাও হয়েছে উল্লেখযোগ্য শিল্পকর্ম। রবীন্দ্রনাথের বইয়ের সমালোচনায় একটা সুর আজকাল প্রায়ই ধরা পড়ে— 'বুড়ো হয়েছেন, শরীর ভালো নেই, কী আর লিখবেন —যা লিখছেন এই ঢের!' এই পিঠ-চাপড়ানো ভাবটায় তাঁর রচনার প্রতি শুধু নয়, তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রতিও ঘোর অবিচার করা হয়। আজকাল কোনো লেখাই বোধ হয় তাঁকে সম্পূর্ণ তৃপ্তি দেয় না, সমালোচকদের কথা তাই অগ্রাহ্য করেন না, বরং শুনতে চান। শুনতে চান, কিন্তু খাতির চান না, অর্ধমনস্ক আন্দাজি প্রশংসা চান না, তিনি জানতে চান রচনাটি হয়েছে কিনা। এখানেই তাঁর বিনয়। আজকের দিনে নিজের প্রতিষ্ঠাকে তিনি গৃহীত ও অনশ্বর সত্য ব'লে ধ'রে নেন না, প্রতিটি নতুন রচনার পিছনে থাকে নতুন লেখকের উৎসাহ ; প্রতি বারেই তাঁর নতুন জন্ম ব'লে প্রতি বারেই তাঁর নতুন প্রতিষ্ঠার দাবি। 'হে নূতন, দেখা দিক আর বার জন্মের প্রথম শুভক্ষণ' —তাঁর এই নবতম বাণী শুধু কথার কথা নয়, ওতে আছে তাঁর সাহিত্যিক জীবনের মূল সত্য।

সবচেয়ে আশ্চর্য লাগে এই যে 'আমার যা হবার হ'য়ে গেছে' এ-ভাবটি কখনো তাঁর মনে এলো না। এ-জন্যেই এত লিখেও তিনি পুরোনো হলেন না, এত দিনেও তিনি ফুরিয়ে গেলেন না। তাঁর লেখা— রবীন্দ্রনাথের লেখা ব'লে নয়— যে-কোনো লেখকের রচনা হিশেবেই দেশের লোকের মনে লেগেছে কিনা সে-বিষয়ে এখন তিনি অনুসন্ধানী। পাঠকদের তিনি বলেন— আর-কিছু দেখো না, কে লিখেছে, তার বয়স কত, উপজীবিকা কী, সে কোন সমাজের লোক, ও-সব ভুলে যাও, লেখাটা দ্যাখো। অন্য সব বাদ দিয়ে লেখাটাই যদি ভালো লাগে, সেই ভালো লাগাটাই খাঁটি। তাঁর কোনো লেখা কারো ভালো লেগেছে শুনলে তিনি খুশিও হন, যদি সেই ভালো-বলা নেহাৎই খুশি করার জন্য না হয়। কথার মারপ্যাঁচে তাঁকে ফাঁকি দেয়া অসম্ভব, আন্তরিক অনুভূতির যেখানে অভাব তিনি সহজেই ধ'রে ফেলেন। সে-অভাব সমালোচকেরা প্রায়ই পূরণ করার চেষ্টা করেন যুক্তিতর্ক দিয়ে, রবীন্দ্রনাথ জানেন কতটুকু তার মূল্য। ভালো লেগেছে, এই কথাটি ঠিকমতো বলতে পারাই তাঁর মতে যথার্থ সমালোচনা, এর বেশি আর-কোনো কথা নেই। কিন্তু ঠিক-মতো বলা শক্ত। তার জন্য শিক্ষা চাই, চাই অভিজ্ঞতা, শিল্পবোধ। সেটা পাণ্ডিত্য নয়, সেটা অনুভূতিরই শিক্ষা, আলোচ্য শিল্পে প্রত্যক্ষ গভীর অভিজ্ঞতা। তারই জোরে ভালো লেগেছে কথাটা বলবার মতো হয়, শোনবার মতো হয়। এ-কথাটা যেখানে ভালো ক'রে বলা হয় সেখানেই তাঁর মন মেনে নিতে পারে, সমালোচনার অন্যান্য পদ্ধতিতে তাঁর আস্থা নেই। তাঁর সাহিত্য কি ছবির আলোচনায় চুলচেরা বিশ্লেষণ তিনি চান না, ঐতিহাসিক সামাজিক পটভূমিকার বর্ণনাও না, নিছক স্তুতির শূন্যতা তাঁকে পীড়িত করে, তিনি শুধু খোঁজেন বিশুদ্ধ উপভোগের প্রাণবন্ত পরিচয়। তিনি

জানেন ভালো-লাগানোটা কত কঠিন কাজ, তার চেয়ে বড়ো কীর্তি শিল্পীর কিছু নেই, আর শিল্পের শেষ যাচাই সেখানেই। আমাদের বলেছিলেন বিদেশীরা তাঁর ছবি কী-ভাবে নিয়েছে। বার্মিংহামে গিয়েছিলেন, সেখানে ওরা বললে, 'এ-ছবি আমাদের নয় ; তুমি প্যারিসে যাও, ওরা ঠিক ধরতে পারবে।' প্যারিসে সবাই বললে, 'আমরা এতদিন ধ'রে যা করবার চেষ্টা করছি তুমি যে তা-ই করেছো !' ভালেরির সঙ্গে ছবি দেখতে এসেছিলেন ফরাশি দেশের সবচেয়ে বড়ো আর্ট-ক্রিটিক। 'তিনি আমাকে জড়িয়ে ধ'রে, চুমু খেয়ে, বললেন, "তুমি যে কত বড়ো আমরা তা জানতুম, কিন্তু তুমি যে সত্যি এতই বড়ো তা জানতুম না।" তারপর গেলুম মস্কোতে, সেখানে সবাই বললে— "এ কী! এ-ছবি তুমি কোথায় পেলে? এ যে সব সোভিয়েট ছবি।"' বিদেশে সর্বত্রই তাঁর ছবির আশ্চর্য সমাদর হয়েছে, সবচেয়ে বেশি জর্মানিতে। বার্লিনে ওরা ওদের ন্যাশনাল গ্যালারির জন্য সমস্ত দেশের তরফ থেকে তাঁর কয়েকটি ছবি কিনে রেখেছিলো, এ-সম্মান আর-কোনো জীবিত চিত্রকরকে ওরা দেয় নি। তথ্যের দিক থেকে উল্লেখ করতে হয় যে সেবারে য়োরোপে রবীন্দ্রনাথের চিত্রপ্রদর্শনী প্রথমেই প্যারিসে হয়েছিলো ; আসলে তিনি প্যারিসে গিয়েছিলেন বার্মিংহাম যাবার পরে নয়, আগে, আর বার্মিংহামের আর্ট-ক্রিটিকরা তাঁকে বার্লিনে যেতে বলেন, প্যারিসে নয়। আমাদের কাছে বলবার সময় তিনি বিস্মৃতিবশে দুটো ঘটনা মিশিয়ে ফেলেছিলেন। বার্লিনের কথা তিনি উল্লেখ করেন নি, অথচ আমরা তো জানি যে সমস্ত জর্মানি যে-ভাবে তাঁকে বরণ করেছিলো ইতিহাসে তার তুলনা নেই। সেই জর্মানিরও এ-অবস্থা তাঁকে দেখে যেতে হ'লো।

বিশ্বের বৃত তিনি, কিন্তু তাঁর বিশ্বব্যাপী যশ তাঁর মনে মোহ আনে নি। তিনি জানেন কবির প্রকৃত আসন তাঁর স্বদেশ, যদি সে-দেশ মূঢ়ের দেশ হয়, তবুও।

ওর মধ্যে যে বিশ্ববিজয়ী জাদু আছে
ধরা পড়ুক তার রহস্য, মূঢ়ের দেশে নয়,
যে দেশে আছে সমজদার, আছে দরদী,
আছে ইংরেজ জর্মান ফরাসী।

এ-কথা পরোক্ষে তাঁর নিজেরই কথা। স্বদেশের কথা, স্বজাতির কথা উঠলে তাঁর কথার সুর বদলে যায়, এই ঈর্ষাকাতর ক্ষুদ্রস্বার্থমগ্ন আত্মবিভক্ত বাঙালি জাতি নিয়ে তীব্র বেদনাবোধ তাঁর মনে চাপা আগুনের মতো জ্বলছে। অথচ সাহিত্যক্ষেত্রে বাঙালির কৃতিত্বের কথা বলতে তাঁর মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে। ইংরেজ এ-দেশে এলো যে-নবীন সংস্কৃতির বাহন হ'য়ে তার সংঘাতে এত বড়ো ভারতবর্ষের মধ্যে এক বাংলাদেশেই এলো সাহিত্যবন্যা, তার কারণ, রবীন্দ্রনাথ বলেন, বাংলাদেশে ক্ষেত্র প্রস্তুত ছিলো, 'ইংরেজের বদলে ফরাশি হ'লে আমরা সবাই মোপাসাঁ হ'য়ে উঠতুম।' অর্থাৎ, প্রমথ চৌধুরীর ভাষায় বলতে গেলে, এটা ইংরেজের জন্য হয়েছে, কিন্তু ইংরেজের জন্যই হয় নি। এ-নবজীবন আমাদের মধ্যে আসতোই, ইংরেজ উপলক্ষ মাত্র। পাশ্চাত্ত্য প্রেরণা ভারতের অন্যান্য প্রদেশে অন্যান্য বিষয় জাগিয়েছে— কোথাও

আইন, কোথাও গণিত, কোথাও বাণিজ্য, কিন্তু সাহিত্যের বিকাশ হ'লো বাংলা-দেশে। তারই প্রভাবে বাঙালি তার মাতৃভাষাকে ভালোবাসতে শিখেছে, তার দেশ-প্রেমেরও একটি প্রধান অঙ্গ মাতৃভাষার প্রতি মমত্ববোধ।...

কবি প্রকাশিত হন তাঁর মাতৃভাষায়, তাঁর প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রও তাই শেষ পর্যন্ত তাঁর স্বদেশ, তাঁর ভাষায় যারা কথা বলে তাদের মধ্যে। জগৎ-জোড়া খ্যাতি নিয়েও রবীন্দ্রনাথ আজ জানতে চান তাঁর নিজের দেশকে সত্যি তিনি কিছু দিতে পেরেছেন কিনা। বাংলাদেশ যিনি সৃষ্টি করলেন, তাঁর মনে প্রশ্ন জাগে বাংলাদেশ তাঁকে গ্রহণ করেছে তো? তিনি যে ব্যর্থ হন নি এই কথাটি শুনে যেতে চান। তাঁর এবারের জন্মদিনে যত অভিনন্দন তাঁর উপর বর্ষিত হ'লো তাতে তিনি এইটুকু দেখতে পেলেন যে দেশ তাঁকে গ্রহণ করেছে। 'তোমরা দুয়ো দাও নি আমাকে— আমাদের দেশে তা-ই দেয়।'

আমরা যখন গেলুম তখন একটি নতুন ছোটোগল্প তিনি সদ্য শেষ করেছেন। আরো অনেক নতুন ও নতুন ধরনের ছোটোগল্প তাঁর কাছ থেকে আমরা পেতে পারতুম— যদি কোনো উপায়ে ভাবনার সঙ্গে-সঙ্গেই রচনা হ'য়ে যেতো। 'যোগাযোগ'-এর দ্বিতীয় পর্ব সম্পূর্ণ ভাবা আছে, আমাদের বললেন সেই গল্প, রোমাঞ্চিত হ'য়ে শুনলাম। এই গল্প মানসলোকের সীমানা পেরোবে না, অসম্পূর্ণ রইলো 'যোগাযোগ'-এর মতো মহৎ উপন্যাস। বড়ো লেখায় হাত দেবার উপায় নেই, ছোটোদের জন্য ছড়া বাঁধেন, গল্প গাঁথেন, কখনো কবিতা, কখনো সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধ লেখেন— হঠাৎ হয়তো একটি ছোটোগল্প বেরিয়ে যায়, কি রুদ্র তেজে জ্ব'লে ওঠে রণদীর্ণ সভ্যতার প্রতি অভিশাপ— এইভাবে যেটুকু পারেন তৃপ্ত রাখেন মহান আকাঙ্ক্ষাকে। রোগদুঃখের চাইতে ঢের বেশি নিষ্ঠুর এই যন্ত্রণা, শরীর মনের এই দ্বন্দ্ব। এদিক থেকে তাঁর জীবন এখন উৎপীড়িত, কল্পনার সঙ্গে কর্মের, চিন্তার সঙ্গে প্রকাশের বিরোধে অসহনীয়। অন্তত তা-ই হওয়া উচিত। কিন্তু বাইরে থেকে দেখে কিছুই বোঝা যায় না। বরং তাঁর মধ্যে দেখা যায় প্রশান্তির পূর্ণতার ছবি। বধির বেঠোফেনের প্রলয়বিক্ষোভ তাঁর নেই। তিনি আত্মসমাহিত, কিন্তু উদাসীন নন। পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চের দিকে তাঁর চোখ খোলা, বাইরের জগতে অন্যায়ের স্পর্ধা সইতে পারেন না, কিন্তু নিজের সম্বন্ধে সবই যেন মেনে নিয়েছেন। আক্ষেপ নেই। নালিশ করেন না। নিজের অক্ষমতার কথা যখন বলেন তাতে হয় ঈষৎ কৌতুকের, নয় একটি করুণ কোমলতার সুর লাগে। বিক্ষোভ মনে যদি থাকে তো মনেই আছে। আর-কেউ তার খবর জানে না।

অথচ বেঠোফেনের বধিরতার চাইতে রবীন্দ্রনাথের এই বন্দী-জীবন ট্র্যাজেডি হিশেবে কম নয়। দেখতে তিনি ভালোবাসেন। সেবারে আমাদের বলেছিলেন, 'এখন আমি আর-কিছুই করি না, শুধু দেখি।' শান্তিনিকেতনের ঝাঁ-ঝাঁ রোদ্দুরের দুপুরে ঘরে-ঘরে যখন দরজা বন্ধ, তিনি কতদিন বারান্দায় ব'সে কাটিয়েছেন দিগন্ত-

ছোঁয়া মাঠের মধ্যে দৃষ্টি মেলে। রাত কেটে গিয়ে যখন ভোর হয়, সেই সংগম-সময়টিকে প্রতিদিন দেখেছেন, নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছেন আকাশে, অন্ধকারে, জোছনায়। আর আজ একটি অন্ধকার ঠাণ্ডা-করা ঘরে তিনি বন্দী, হঠাৎ ঘুম থেকে চমকে উঠে তাঁকে জিগেস করতে হয়— 'এখন দিন না রাত?' জ্যোৎস্না আজ ছায়ার মতো, মেঘ অদৃশ্য। তাঁর জগতে দিনরাত্রির বৈচিত্র্য আর নেই, ঋতুর লীলা ফুরিয়েছে। আশ্রমের পাখিরা ভোরবেলা ডাকাডাকি করে, তিনি শোনেন না; বৃষ্টি পড়ে, তাঁর জগতের নীরবতা ভাঙে না। বিশ্বপ্রকৃতি তাঁর কাছে পৌঁছয় ক্ষীণ আভাসে, অস্ফুট ইঙ্গিতে, আর কল্পনায়। অসাধারণ তাঁর বৈচিত্র্যপ্রিয়তা; এক জায়গায় বেশিদিন মন টেকে না, কিছুদিন পর-পরই বাড়ি-বদলের ঝোঁক চাপে, তাছাড়া ছিলো অবিরাম দেশভ্রমণ। আর এখন একই বাড়ির মধ্যে ঘর বদল করাও দুঃসাধ্য, ভ্রমণের কথা তো ওঠেই না। ব'সে-ব'সে হয়তো ভাবেন দেশ-বিদেশের নদী নগর পর্বত প্রান্তরের কথা; বিশেষ ক'রে পদ্মার কথা মনে পড়ে, হয়তো ইচ্ছে করে ফিরে যেতে। 'তোমরা পদ্মাপারের মানুষ— আর দেখলে তো এখানকার কোপাই! কী রুক্ষ দেশ— একেবারে রাজপুতনা। পদ্মা থেকে কোন সুদূরে চ'লে এসেছি।' হঠাৎ হয়তো মনে হয় সমুদ্রের ধারে গেলে সেরে উঠবেন। কিন্তু কত দূরে পদ্মা, আরো কত দূরে সমুদ্র। বেশ, এই ঘরের মধ্যেই তাঁর বৈচিত্র্যসাধন। চেয়ারটি এক-একদিন এক-এক দিকে ঘুরিয়ে বসেন, ঘরের অন্যান্য জিনিশ সঙ্গে-সঙ্গে ঘুরছে, পর-পর দু-দিন দেখলুম না ঘরের একরকম ব্যবস্থা।...

রাত্রে ভালো ঘুম হয় না, নানারকম অদ্ভুত স্বপ্ন দ্যাখেন, স্বপ্নের মধ্যে কথাও বলেন। রাত দুটোয় জেগে উঠে আর ঘুম নেই। তখন শুরু হয় গল্প, কি কোনো রচনা মুখে মুখে ব'লে যান। একদিন ইতিহাসের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক নিয়ে কয়েকটি প্রশ্ন লিখে তাঁকে পাঠিয়ে দিয়েছিলুম। এ-বিষয়ে তাঁর মুখে কিছু শুনবো, এর বেশি আশা ছিলো না। পরদিন সকালে যেতেই বললেন, 'কী কতগুলো বর-ঠকানো প্রশ্ন করেছো! এই নাও।' হাতে দিলেন শ্রীমতী রানী চন্দর হস্তলিখিত প্রবন্ধ; তাঁর ঘুম ভাঙার পর শুরু করেছিলেন, আমাদের ঘুম ভাঙার আগে শেষ হ'য়ে গেছে। দু-দিন পরে মনে হ'লো ওটা যথেষ্ট হয় নি, সঙ্গে জুড়ে দিলেন আর-একটি ছোটো প্রবন্ধ। রচনা বিষয়ে কোনো অসম্ভব অনুরোধ জানালেও 'না' শুনতে হয় না, একটু হেসে বলেন, 'আচ্ছা, ভেবে দেখবো।' কোনো প্রশ্নেই তিনি নিরুত্তর নন, কোনো প্রসঙ্গেই অনিচ্ছুক নন। তিনি সর্বদাই প্রস্তুত: একদিকে যেমন তাঁকে ঘিরে আছে অফুরন্ত ছুটি, তেমনি আবার তাঁর মনের কারখানা-ঘরে ছুটির লাল তারিখ কখনো ছিলো না, এখনো নেই।...

চ'লে আসার দিন রবীন্দ্রনাথকে দেখলুম রোগশয্যায়। ভাবি নি এমন দৃশ্য দেখতে হবে। বাইরে বিকেলের উজ্জ্বলতা থেকে হঠাৎ তাঁর ঘরে ঢুকে চমকে গেলুম। অন্ধকার; এক কোণে টেবল-ল্যাম্প জ্বলছে। মস্ত ইজিচেয়ারে অনেকগুলো বালিশে হেলান দিয়ে কবি চোখ বুজে চুপ। ঘরে আছেন ডাক্তার, আছেন সুধাকান্ত—

বাবু। আমরা যেতে একটু চোখ মেললেন, অতি ক্ষীণস্বরে দু-একটি কথা বললেন, তাঁর দক্ষিণ কর আমাদের মাথার উপর ঈষৎ উত্তোলিত হ'য়েই নেমে গেলো। বলতে পারবো না তখন আমার কী মনে হ'লো, কেমন লাগলো। হঠাৎ আঘাত লাগলো হৃদ্‌যন্ত্রে, গলা আটকে এলো, কেমন একটা বিহ্বলতায় তাঁর দিকে ভালো ক'রে তাকাতেও যেন পারলুম না। বাইরে এসে নিশ্বাস পড়লো সহজে। অমর কবি এই উজ্জ্বল আলোর চিরসঙ্গী, রুদ্ধ ঘরে বন্দী হ'য়ে আছে ভঙ্গুর মৃৎপাত্র।

১৯৪১ 'সব-পেয়েছির দেশে' (সংক্ষেপিত ও পরিমার্জিত)

আড্ডা

পণ্ডিত নই, কথাটার উৎপত্তি জানি না। আওয়াজটা অ-সংস্কৃত, মুসলমানি। যদি ওকে হিন্দু ক'রে বলি সভা, তাহ'লে ওর কিছুই থাকে না। যদি ইংরেজি ক'রে বলি পার্টি, তাহ'লে ও প্রাণে মরে। মীটিঙের কাপড় খাকি কিংবা খাদি ; পার্টির কাপড় ফ্যাশন-দুরস্ত কিন্তু ইস্ত্রি বড়ো কড়া ; সভা শুভ্র, শোভন ও আরামহীন। ফরাশি সালঁর অস্তিত্ব এখনো আছে কিনা জানি না, বর্ণনা প'ড়ে বড্ড বেশি জমকালো মনে হয়। আড্ডার ঠিক প্রতিশব্দটি পৃথিবীর অন্য কোনো ভাষাতেই আছে কি ? ভাষাবিদ না-হ'য়েও বলতে পারি, নেই ; কারণ আড্ডার মেজাজ নেই অন্য কোনো দেশে, কিংবা মেজাজ থাকলেও যথোচিত পরিবেশ নেই। অন্যান্য দেশের লোক বক্তৃতা দেয়, রসিকতা করে, তর্ক চালায়, ফুর্তি ক'রে রাত কাটিয়ে দেয়, কিন্তু আড্ডা দেয় না। অত্যন্ত হাসি পায় যখন শুভানুধ্যায়ী ইংরেজ আমাদের করুণা ক'রে বলে— আহা বেচারা, ক্লাব কাকে বলে ওরা জানে না ! আড্ডা যাদের আছে, ক্লাব দিয়ে তারা করবে কী ? আমাদের ক্লাবের প্রচেষ্টা কলের পুতুলের হাত-পা নাড়ার মতো, ওতে আবয়বিক সম্পূর্ণতা আছে, প্রাণের স্পন্দন নেই। যারা আড্ডাদেনেওলা জাত, তারা যে ঘর ভাড়া নিয়ে, চিঠির কাগজ ছাপিয়ে, চাকরদের চাপরাশ পরিয়ে ক্লাবের পত্তন করে, এর চেয়ে হাস্যকর এবং শোচনীয় আর-কিছু আছে কিনা জানি না।

আড্ডা জিনিশটা সর্বভারতীয়, কিন্তু বাংলাদেশের সজল বাতাসেই তার পূর্ণবিকাশ। আমাদের ঋতুগুলি যেমন কবিতা জাগায়, তেমনি আড্ডাও জমায়। আমাদের চৈত্রসন্ধ্যা, বর্ষার সন্ধ্যা, শরতের জ্যোৎস্না-ঢালা রাত্রি, শীতের মধুর উজ্জ্বল সকাল— সবই আড্ডার নীরব ঘণ্টা বাজিয়ে যায়, কেউ শুনতে পায়, কেউ পায় না। যে-সব দেশে শীত-গ্রীষ্ম দু-ই অতি তীব্র, বা বছরের ছ-মাস জুড়েই শীতকাল রাজত্ব করে, সেগুলো আড্ডার পক্ষে ঠিক অনুকূল নয়। বাংলার কমনীয় আবহাওয়ায় যেমন গাছপালার ঘনতা, তেমনি আড্ডার উচ্ছ্বাসও স্বাভাবিক। ছেলেবেলা থেকে এই আড্ডার প্রেমে আমি ম'জে আছি। সভায় যেতে আমার বুক কাঁপে, পার্টির নামে দৌড়ে পালাই, কিন্তু আড্ডা ! ও না-হ'লে আমি বাঁচি না। বলতে গেলে ওরই হাতে আমি মানুষ। বই প'ড়ে যা শিখেছি তার চেয়ে বেশি শিখেছি আড্ডা দিয়ে। বিশ্ববিদ্যাবৃক্ষের উচ্চশাখা থেকে আপাতরমণীয় ফলগুলি একটু সহজেই পেড়েছিলুম —সেটা আড্ডারই উপহার। আমার সাহিত্যরচনায় প্রধান নির্ভররূপেও আড্ডাকে বরণ করি। ছেলেবেলায় গুরুজনেরা আশঙ্কা করেছিলেন যে আড্ডায় আমার সর্বনাশ

হবে, এখন দেখছি ওতে আমার সর্বলাভ হ'লো। তাই শুধু উপাসক হ'য়ে আমার তৃপ্তি নেই, পুরোহিত হ'য়ে তার মহিমা প্রচার করতে বসেছি।

যে কাপড় আমি ভালোবাসি আড্ডার ঠিক সেই কাপড়। ফর্শা, কিন্তু অত্যন্ত বেশি ফর্শা নয়, অনেকটা ঢোলা, প্রয়োজন পার হ'য়েও খানিকটা বাহুল্য আছে, স্পর্শকোমল, নমনীয়। গায়ে কোথাও কড়কড় করে না, হাত-পা ছড়াতে হ'লে বাধা দেয় না, লম্বা হ'য়ে শুয়ে পড়তে চাইলে তাতেও মানা নেই। অথচ তা মলিন নয়, তাতে মাছের ঝোল কিংবা পানের পিক লাগে নি ; কিংবা দাওয়ায় ব'সে গা-খোলা জটলার বেআব্রু শৈথিল্য তাকে কুঁচকে দেয় নি। তাতে আরাম আছে, অযত্ন নেই ; তার স্বাচ্ছন্দ্য ছন্দোহীনতার নামান্তর নয়।

শুনতে মনে হয় যে ইচ্ছে করলেই আড্ডা দেয়া যায়। কিন্তু তার আত্মা বড়ো কোমল, বড়ো খামখেয়ালি তার মেজাজ, অতি সূক্ষ্ম কারণেই উপকরণের অবয়ব ত্যাগ ক'রে সে এমন অলক্ষ্যে উবে যায় যে অনেকক্ষণ পর্যন্ত কিছু বোঝাই যায় না। আড্ডা দিতে গিয়ে প্রায়ই আমরা পরাবিদ্যার— মানে পড়া-বিদ্যার আসর জমাই, আর নয়তো পরচর্চার চণ্ডীমণ্ডপ গ'ড়ে তুলি। হয়তো স্থির করলুম যে সপ্তাহে একদিন কি মাসে দু-দিন সাহিত্যসভা ডাকবো, তাতে জ্ঞানী-গুণীরা আসবেন, এবং নানা রকম সদালাপ হবে। পরিকল্পনাটি মনোরম তাতে সন্দেহ নেই ; প্রথম কয়েকটি অধিবেশন এমন জমলো যে নিজেরাই অবাক হ'য়ে গেলাম, কিন্তু কিছুদিন পরেই দেখা গেলো যে সেটি আড্ডার স্বর্গ থেকে চ্যুত হ'য়ে কর্তব্যপালনের বন্ধ্যা জমিতে পতিত হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ে কর্মস্থলে যাওয়ার মতো নির্দিষ্ট দিনে যেখানে যেতে হয়, তাকে, আর যা-ই হোক, আড্ডা বলা যায় না। কেননা আড্ডার প্রথম নিয়ম এই যে তার কোনো নিয়মই নেই . সেটা যে অনিয়মিত, অসাময়িক, অনায়োজিত, সে-বিষয়ে সচেতন হ'লেও চলবে না। ও যেন বেড়াতে বাবার জায়গা নয়, ও যেন বাড়ি ; কাজের শেষে সেখানেই ফিরবো, এবং কাজ পালিয়ে যখন-তখন এসে পড়লেও কেউ কোনো প্রশ্ন করবে না।

তাই ব'লে এমন নয় যে এলোমেলোভাবেই আড্ডা গ'ড়ে ওঠে। নিজে অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে তার পিছনে কোনো-একজনের প্রচ্ছন্ন কিন্তু প্রখর রচনাশক্তি চাই। অনেকগুলি শর্ত পূরণ হ'লে তবে কতিপয় ব্যক্তির সমাবেশ হ'য়ে ওঠে সত্যিকার আড্ডা— ক্লাব নয়, পার্টি নয়, সভা কিংবা সমিতি নয়। একে-একে সেগুলি পেশ করছি।

আড্ডায় সকলেরই মর্যাদা সমান হওয়া চাই। ব্যবহারিক জীবনে মানুষে-মানুষে নানা রকম প্রভেদ অনিবার্য, কিন্তু সেই ভেদবুদ্ধি আপিশের কাপড়ের সঙ্গে-সঙ্গেই যারা ঝেড়ে ফেলতে না জানে, আড্ডার স্বাদ তারা কোনোদিন পাবে না। যদি এমন কেউ থাকেন যিনি এতই বড়ো যে তাঁর মহিমা কখনো ভুলে থাকা যায় না, তাঁর পায়ের কাছে আমরা ভক্তের মতো বসবো, কিন্তু আমাদের আনন্দে তাঁর নিমন্ত্রণ নেই, কেননা তাঁর দৃষ্টিপাতেই আড্ডার ঝর্নাধারা তুষার হ'য়ে জ'মে যাবে। আবার অন্যদের

তুলনায় অনেকখানি নিচুতে যার মনের সুর, তাকেও বাইরে না-রাখলে কোনো পক্ষেই সুবিচার হবে না। আড্ডায় লোকসংখ্যার একটা স্বাভাবিক সীমা আছে; ঊর্ধ্বসংখ্যা দশ কি বারো, নিম্নতম তিন। দশ-বারোজনের বেশি হ'লে অ্যালবার্ট হল হ'য়ে ওঠে, কিংবা বিয়ে-বাড়িও হ'তে পারে; আর যদি হয় ঠিক দু-জন তাহ'লে তার সঙ্গে কূজনই মিলবে— পদ্যেও, জীবনেও। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে স্বভাবের উপর-তলায় বৈচিত্র্য থাকা চাই, কিন্তু নিচের তলায় মিল না-থাকলে পদে-পদে ছন্দপতন ঘটবে। অনুরাগ এবং পারস্পরিক জ্ঞাতিত্ববোধ স্বতই যাদের কাছে টানে, আড্ডা তাদেরই জন্য, এবং তাদেরই মধ্যে আবদ্ধ থাকা উচিত; চেষ্টা ক'রে সংখ্যা বাড়াতে গেলে আড্ডার প্রাণপাখি কখন উড়ে পালাবে কেউ জানতেও পাবে না।

কিন্তু এমনও নয় যে ঐ ক-জন এক-সুরে-বাঁধা মানুষ একত্র হ'লেই আড্ডা জ'মে উঠবে। জায়গাটিও অনুকূল হওয়া চাই। আড্ডার জন্য ঘর ভাড়া করা আর শোক করার জন্য কাঁদুনে ভাড়া করা একই কথা। অধিগম্য বাড়িগুলির মধ্যে যেটির আবহাওয়া সবচেয়ে অনুকূল, সেই বাড়িই হবে আড্ডার প্রধান পীঠস্থান। সেই সঙ্গে একটি-দুটি পারিপার্শ্বিক তীর্থ থাকাও ভালো, মাঝে-মাঝে জায়গা-বদল করাটা মনের ফলকে শান দেয়ার শামিল; ঋতুর বৈচিত্র্য এবং চাঁদের ভাঙা-গড়া অনুসারে ঘর থেকে বারান্দায়, বারান্দা থেকে ছাতে, এবং ছাত থেকে খোলা মাঠে বদলি হ'লে সেই সম্পূর্ণতা লাভ করা যায়, যা প্রকৃতিরই আপন হাতের সৃষ্টি। কিন্তু কোনো কারণেই, কোনো প্রলোভনেই ভুল জায়গায় যেন যাওয়া না হয়। ভুল জায়গায় মানুষগুলোকেও ভুল মনে হয়, ঠিক সুরটি কিছুতেই লাগে না।

আড্ডার জায়গাটিতে আরাম থাকবে পুরোপুরি, আড়ম্বর থাকবে না। আসবাব হবে নিচু, নরম, অত্যন্ত বেশি ঝকঝকে নয়; মরজি-মতো অযথাস্থানে সরিয়ে নেবার আন্দাজ হালকা হ'লে তো কথাই নেই। চেয়ার-টেবিলের কাছাকাছি একটা ফরাশ গোছেরও কিছু থাকা ভালো— যদি রাত বেড়ে যায়, কিংবা কেউ ক্লান্ত বোধ করে, তাহ'লে শুয়ে পড়ার জন্য কারো অনুমতি নিতে হবে না। পানীয় থাকবে কাচের গেলাশে ঠাণ্ডা জল, আর পাৎলা শাদা পেয়ালায় সোনালি সুগন্ধি চা; আর খাদ্য যদি কিছু থাকে তা হবে স্বাদু, স্বল্প এবং শুকনো, যেন ইচ্ছেমতো মাঝে-মাঝে তুলে নিয়ে খাওয়া যায়, আর খাবার পরে হাত-মুখ ধোবার জন্য উঠতেও হয় না। বাসনগুলো হবে পরিচ্ছন্ন— জমকালো নয়; এবং ভৃত্যদের ছুটি দিয়ে গৃহকর্ত্রী নিজেই যদি খাদ্যপানীয় নিয়ে আসেন এবং বিতরণ করেন তাহ'লেই আড্ডার যথার্থ মানরক্ষা হয়।

কথাবার্তা চলবে মসৃণ, স্বচ্ছন্দ স্রোতে, তার জন্য কোনো চেষ্টা কি চিন্তা থাকবে না; যে-সব ভাবনা ও খেয়াল, সংশয় ও প্রশ্ন মনের মধ্যে সব সময় উঠছে পড়ছে— কেজো দিনের শাসনের তলায় যা চাপা প'ড়ে থাকে, এবং যার অনেকটা অংশই

হয়তো আকস্মিক কিন্তু তাই ব'লে অর্থহীন নয়, তারই মুক্তি-পাওয়া ছলছলানি যেন কথাগুলো। এখানে সংকোচ নেই, বিষয়-বুদ্ধি নেই, দায়িত্ববোধ নেই। ভালো কথা বলার দায় নেই এখানে। ভালো কথা না আসে, এমনি কথাই বলবো ; এমনি কথারও যদি খেই হারিয়ে যায়, মাঝে-মাঝে চুপ ক'রে থাকতে ভয় কিসের। মুহূর্তের জন্যও চুপ ক'রে থাকাকে যাঁরা বুদ্ধির পরাভব কিংবা সৌজন্যের ত্রুটি ব'লে মনে করেন, আড্ডা জিনিশটা তাঁরা বোঝেন না। তার্কিক এবং পেশাদার হাস্যরসিক, আড্ডায় এই দুই শ্রেণীর মানুষের প্রবেশ নিষেধ। যাঁরা প্রাজ্ঞজন, কিংবা যাঁরা লোকহিতে বদ্ধপরিকর, তাঁদেরও সসম্মানে বাইরে রাখতে হবে। কেননা আড্ডার ইডেন থেকে যে-সূক্ষ্ম সর্প বার-বার আমাদের ভ্রষ্ট করে, তারই নাম উদ্দেশ্য। যত মহৎই হোক, কিংবা যত তুচ্ছই হোক, কোনো উদ্দেশ্যকে ভ্রমক্রমেও কখনো ঢুকতে দিতে নেই। আড্ডার মধ্যে তাসপাশার আমদানি যেমন মারাত্মক, তেমনি ক্ষতিকর তার দ্বারা কোনো জ্ঞানলাভের সচেতন চেষ্টা। ধ'রে নিতে হবে যে আড্ডা কোনো উদ্দেশ্যসাধনের উপায় নয়, তা থেকে কোনো কাজ হবে না, নিজের কিংবা অন্যের কিছুমাত্র উপকার হবে না। আড্ডা বিশুদ্ধ ও নিষ্কাম, আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ। তা যদি নিজেরই জন্য আনন্দদায়ক না-হ'তে পারে তাহ'লে তার অস্তিত্বেরই অর্থ নেই।

শুধু পুরুষদের নিয়ে, কিংবা শুধু মেয়েদের নিয়ে, আড্ডা জমে না। শুধু পুরুষরা একত্র হ'লে কথার গাড়ি শেষ পর্যন্ত কাজের লাইন ধ'রেই চলবে ; আবার কখনো লাইন থেকে চ্যুত হ'লে গড়াতে-গড়াতে সুরুচির সীমাও পেরিয়ে যাবে হয়তো। শুধু মেয়েরা একত্র হ'লে ঘরকন্না, ছেলেপুলে, শাড়ি-গয়নার কথা কেউ ঠেকাতে পারবে না। আড্ডার উন্মীলন স্ত্রী-পুরুষের মিশ্রণে। মেয়েরা কাছে থাকলে পুরুষের, এবং পুরুষ কাছে থাকলে মেয়েদের রসনা মার্জিত হয়, কণ্ঠস্বর নিচু পর্দায় থাকে, অঙ্গভঙ্গি শ্রীহীন হ'তে পারে না। মেয়েরা দেন তাঁদের স্নেহ ও লাবণ্য, ন্যূনতম অনুষ্ঠানের সূক্ষ্মতম বন্ধন ; পুরুষ আনে তার ঘরছাড়া মনের দূরকল্পনা। বিচ্ছিন্নভাবে মেয়েদের দ্বারা এবং পুরুষের দ্বারা পৃথিবীতে অনেক ছোটো-বড়ো কাজ হ'য়ে থাকে ; ছন্দ হয় দুয়ের মিলনে।

আড্ডা স্থিতিশীল নয়, নদীর স্রোতের মতো প্রবহমান। সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে তার রূপের বদল হয়। মন যখন যা চায়, তা-ই পাওয়া যায় তাতে। কখনো কৌতুকে সরস, কখনো আলোচনায় উৎসুক, কখনো প্রীতির দ্বারা সুস্নিগ্ধ। বন্ধুতা ও অন্তর্বীক্ষণ, হৃদয়বৃত্তি ও বুদ্ধির চর্চা, উদ্দীপনা ও বিশ্রাম— সব একসঙ্গে শুধু আড্ডাই আমাদের দিতে পারে, যদি সত্যি তা ঐ নামের যোগ্য হয়। বিশ্বসভায় অখ্যাতির কোণে আমরা নির্বাসিত ; যারা ব্যস্ত এবং মস্ত জাত, যাদের কৃপাকটাক্ষ প্রতি মুহূর্তে আমাদের বুকে এসে বিঁধছে, তারা এখনো জানে না যে পৃথিবীর সভ্যতায় আড্ডা আমাদের অতুলনীয় দান। হয়তো একদিন নব-যুগের দুয়ার খুলে আমরা বেরিয়ে পড়বো, অস্ত্র নিয়ে নয়, মানদণ্ড নিয়ে নয়, ধর্মগ্রন্থ নিয়েও নয়, বেরিয়ে পড়বো বিশুদ্ধ বেঁচে

থাকার মন্ত্র নিয়ে, আনন্দের উদ্দেশ্যহীন ব্রত নিয়ে, আড্ডার দ্বারা পৃথিবী জয় করবো আমরা, জয় করবো কিন্তু ধ'রে রাখবো না ; —কেননা আমরা জানি যে ধ'রে রাখতে গেলেই হারাতে হয়, ছেড়ে দিলেই পাওয়া যায়। পৃথিবীর রাষ্ট্রনীতি বলে, কাড়ো ; আমাদের আড্ডা-নীতি বলে, ছাড়ো।

১৯৪৪ 'উত্তরতিরিশ' (পরিমার্জিত)

নোয়াখালি

প্রথম চোখ ফুটলো নোয়াখালিতে। তার আগে অন্ধকার, আর সেই অন্ধকারে আলোর ফুটকি কয়েকটি মাত্র। সন্ধ্যাবেলা চাঁদ ওঠার আগে উঠোন ভ'রে আলপনা দিচ্ছেন বাড়ির বৃদ্ধা, মুগ্ধ হ'য়ে দেখছি। রাতের বিছানা দিনের বেলায় পাহাড়ের ঢালুর মতো ক'রে ওল্টানো, তাইতে ঠেশান দিয়ে পাতা ওল্টাচ্ছি মস্ত বড়ো লাল মলাটের 'বালক' পত্রিকার। রোদ্দুর-মাখা বিকেলে টেনিস খেলা হচ্ছে; একটি সুগোল মসৃণ ধবধবে বল এসে লাগলো আমার পেরাম্বুলেটরের চাকায়, বলটি আমি উপহার পেয়ে গেলুম। কিন্তু সে কোন মাঠ, কোন দেশ, সে কবেকার কথা, আজ পর্যন্ত তা আমি জানি না। আমার জীবনের ধারাবাহিকতার সঙ্গে তাদের যোগ নেই: তারা যেন কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ছবি, অনেক আগে দেখা স্বপ্নের মতো, বছরের পর বছরের আবর্তনেও যে-স্বপ্ন ভুলতে পারি নি। সচেতন জীবন অনবচ্ছিন্নভাবে আরম্ভ হ'লো নোয়াখালিতে: প্রথম যে-জনপদের নাম আমি জানলুম তা নোয়াখালি; নোয়াখালির পথে এবং অপথে আমার প্রথম ভূগোলশিক্ষা, আর সেখানেই এই প্রাথমিক ইতিহাসবোধের বিকাশ যে বছর-বছর আমাদের বয়স বাড়ে। আমার কাছে নোয়াখালি মানেই ছেলেবেলা, ছেলেবেলা মানেই নোয়াখালি।

সব-আগের বাড়িটি একটি বৃহৎ ফল-বাগানের মধ্যে: লোকে বলতো ফেরুল সাহেবের বাগিচা। জানি না ফেরুল কোন পোর্তুগিজ নামের অপভ্রংশ। ফলের এত প্রাচুর্য যে মহিলারা ডাবের জলে পা ধুতেন। খুব সবুজ, মনে পড়ে। একটু অন্ধকার। কাছেই গির্জে। শাদা প্যান্ট-কোট পরা কালো কালো লোকেদের অনাত্মীয় লাগতো। গির্জের ভিতরে গিয়েছি; ভিতরটা থমথমে, বাইরে সবুজ ঘাস, লম্বা ঝাউগাছ, রোদ্দুর। বনবহুল ঘনসবুজ দেশ, সমুদ্র কাছে মেঘনায় রাক্ষসী মোহানার ভীষণ আলিঙ্গনে বাঁধা। সবচেয়ে সুন্দর রাস্তাটির দু-দিকে ঝাউয়ের সারি, সেখানে সারা দিন গোল-গোল আলো-ছায়ার ঝিকিমিকি, আর ঝাউয়ের ডালে-ডালে দীর্ঘশ্বাস, সারা দিন, সারা রাত। দলে-দলে নারকেল গাছ আকাশের দিকে উঠেছে, ছিপছিপে শুপুরি-সখীদের পাশে-পাশে; যেখানে-সেখানে পুকুর, ডোবা, নালা, গাবের আঠা, মাদারের কাঁটা, সাপের ভয়। শাদা ছোটো-ছোটো দ্রোণফুলে প্রজাপতির আশাতীত ভিড়— আর কোথাও আর কখনো দেখি নি সে-ফুল— আর কী-একটা গাছে ছোটো গোল-গোল কাঁটাওলা গুটি ধরতো, মজার খেলা ছিলো সেগুলি পরস্পরের কাপড়ে-জামায় ছুঁড়ে মারা— কী তার নাম ভুলে গিয়েছি। হলদে লাল ম্যাজেন্টা গাঁদায় সারাটা শীত রঙিন, এমন বাড়ি প্রায় ছিলো না যার আঙিনায়

গুচ্ছ-গুচ্ছ গাঁদা ধ'রে না থাকতো— শ্যামল সুঠাম এক-একটি বাড়ি, বেড়া-দেয়া বাগান, নিকোনো উঠোন, চোখ-জুড়োনো খড়ের চাল, মাচার উপর সবুজ উদ্‌গ্রীব লাউ-কুমড়োর লতায় ফোঁটা-ফোঁটা শিশির। শহরের শ্রেষ্ঠ বাড়িটিতেও থেকেছি আমরা, কিন্তু ও-রকম বাড়িতে কখনো থাকি নি, কেননা সরকারি চাকুরেরূপী অধিপতিদের বাসা নয় ওগুলো, অধিবাসীদের বাস্তুভিটা। কতগুলি বাড়ি ছিলো— এমন নিষ্কলঙ্ক-নিকোনো তাদের উঠোন, এমন অস্বাভাবিক পরিচ্ছন্ন, যে যতবার চোখে পড়েছে ততবার অবাক লেগেছে। ও-বাড়িগুলিতে কারা থাকে জিগেস ক'রে গুরুজনের কাছে জবাব পাই নি। পরে জানতে পেরেছিলুম ওগুলি শহরের গণিকালয়, যদিও গণিকা বলতে ঠিক কী বোঝায় তা তখনও আমার ধারণার বাইরে ছিলো।

এমন কোনো পথ ছিলো না নোয়াখালির, যাতে হাঁটি নি, এমন মাঠ ছিলো না যা মাড়াই নি, দূরতম প্রান্ত থেকে প্রান্তে, শহর ছাড়িয়ে, বনের কিনারে, নদীর এবড়োখেবড়ো পাড়িতে, কালো-কালো কাদায়, খোঁচা-খোঁচা কাঁটায়, চোরাবালির বিপদে। শীতের ভোরবেলা নদীর ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছি; যদিও আলস্টর আর কান-ঢাকা টুপিতে মোড়া, তবু বিশ্ববিধান আমার অসম্মান করে নি, শান্তাসীতার নীলাভ রেখাটি যেখানে শেষ হয়েছে, দিগন্তের সেই কুহক থেকে দেখা দিয়েছে আগুন-রঙের সূর্য, প্রথমে কেঁপে-কেঁপে, তারপর লম্বা লাফে উঠে গেছে আকাশে, বিস্তীর্ণ জলকে ঝলকে-ঝলকে লাল ক'রে দিয়ে। আবার সন্ধ্যাবেলা লাল-সোনার খেলা পশ্চিমে। কখনো গিয়েছি সুদূর রেল-স্টেশনে রেল-লাইনের নুড়ি কুড়োতে, কখনো জেলখানার পিছনে ভুতুড়ে মাঠে, কি নৌকো-চলা খালের ধারে বাঁশ-পচা গন্ধে। একবার কী-কারণে পুলিশ লাইনে তাঁবু পড়েছিলো, দুপুরবেলা তাঁবুর মধ্যে শুয়ে-শুয়ে ঘাসের গন্ধে নেশার মতো লেগেছিলো আমার, প্রায় ঘুমিয়ে পড়তে-পড়তে মনে হয়েছিলো সংসারটা জঞ্জাল, সব চেষ্টা অর্থহীন, সবচেয়ে ভালো রাখাল হ'য়ে মাঠে-মাঠে ঘুরে বেড়ানো, গাছের ছায়ায় ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঘুমিয়ে পড়া। হয়তো এখানে বলা দরকার যে তখন পর্যন্ত আমি রবীন্দ্রনাথ পড়ি নি— রবীন্দ্রনাথের কোনো কবিতাই না।

অন্য সব যখন শেষ হ'লো, তখন ফিরতে হয় নদীর কাছেই। নোয়াখালির সর্বস্ব ঐ নদী, নোয়াখালির সর্বনাশ। সবচেয়ে জমকালো সম্পত্তি, সবচেয়ে নিদারুণ বিপদ। সে-নদী মনোহরণ নয়; বাংলাদেশের অন্য কোনো নদীর মতোই নয় সে, না গঙ্গা, না পদ্মা, না কোপাই। বিশাল, শ্রীহীন, দুর্দান্ত, অমিত্র, অসেতুসম্ভব। কেউ স্নান করতে নামে না; উপায় নেই। নানা রঙের শাড়ি-পরা ছিপছিপে তরুণীদের মতো নানা রঙের পাল-তোলা নৌকো নেই এখানে— বছরে দু-এক মাস, ভরা গ্রীষ্মের সময়, অর্ধেকটা নদী জুড়ে প'ড়ে থাকে বালি আর কাদা, তখন একটি খেয়া অতি কষ্টে পারাপার করে, আর বর্ষাকালে যে-একটি নড়বড়ে স্টিমার কুমির-রঙের ঢেউয়ের উপর দিয়ে কেঁপে-কেঁপে সন্দ্বীপে যায়, কিংবা হাতিয়ায়, তার দিকে তাকালেই ভয় হয় এই ডুবলো বুঝি। মানুষের লাভের বা লোভের দিন-মজুরি এ-

নদী করলো না ; মানুষের ভালোবাসাকেও ভাসিয়ে দিলো কুটিল গোগ্রাসী আবর্তে। ধারে-ধারে না উঠলো কারখানা. না বাগানবাড়ি ; ধার দিয়ে বেড়াবার একটি পাকা শড়ক— তা পর্যন্ত হ'তে দিলো না। মেয়েদের সঙ্গে গলাগলি ভাব ক'রে গ'লে যাওয়া তার কোষ্ঠীতে লেখে নি. বাবুদের নৌকো চড়িয়ে হাওয়া খাওয়াবার মতো মেজাজ নয় তার। আর-কিছু না. শুধু ভাঙবে। খাড়া পাড়. পাহাড়ের গায়ের মতো এবড়োখেবড়ো ; তার ঠিক নিচেই ঘুরপাক-খাওয়া তীব্র জল : আর ঝুপঝুপ ক'রে ধ্ব'সে পড়ছে মাটি. যারা দাঁড়িয়ে আছে বা হেঁটে-চ'লে বেড়াচ্ছে. একেবারে তাদের পায়ের তলা থেকে মাটি যাচ্ছে স'রে, ফাটল ধরছে আবার একটু দূরে, কখনো প্রকাণ্ড চাকে গাছপালা সুদ্ধু ভেঙে পড়লো কান-ফাটানো শব্দে. কাছের বাড়িগুলি বলির পাঁঠার মতো দাঁড়িয়ে। আদি শহরটি অত্যন্তই ছোটো হয়তো ছিলো না. নদী নাকি ছিলো তিন-চার মাইল দূরে, কিন্তু ঘোড়ার মতো লাফিয়ে-লাফিয়ে নদী এমন দ্রুতবেগে এগিয়ে এলো যে দেখতে-দেখতে কুঁকড়ে ছোট্ট হ'য়ে গেলো নোয়াখালি। আমি শেষ দেখেছিলাম শহরের ঠিক মাঝখানটিতে টাউন হলের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে অমিতক্ষুধা জল. তার পর শুনেছি আরো ক্ষয়েছে : যে-নোয়াখালি আমি দেখেছি, যাকে আমি বহন করছি আমার স্মৃতিতে ও জীবনে. আজ তার নামমাত্রই হয়তো আছে— কিংবা কিছুই নেই।

আর সেই সব মানুষ ? সেই আধ-বুড়ো প'র্তুগিজ. যে-দুর্দম জলদস্যুরা বঙ্গোপ-সাগরের উপকূলে এক দিন তাণ্ডব বাধিয়েছিলো. তাদেরই প্রক্ষিপ্ত. উচ্ছিন্ন ধ্বংসাবশেষ ? গায়ের রং তার আমাদের মতোই কালো. চুলের রং পুরোনো পয়সার মতো, ময়লা প্যাণ্ট-কোট পরনে. পায়ে জুতো নেই। খাশ নোয়াখালির বাংলা বলতো সে, প্রায় সারা দিনই পথে-পথে ঘুরে বেড়াতো. পথের কোনো ভদ্রলোককে ধ'রে জুড়ে দিতো আলাপ. চেয়ে নিতো চুরুট কিংবা দু-চার আনা পয়সা। আর সেই অদ্ভুত রহস্যময় প্রায়-অলৌকিক মূর্তি— লম্বা. পাথরের মতো মুখে জ্বলজ্বলে চোখ বসানো, গোড়ালি থেকে গলা পর্যন্ত মস্ত ফোলা আলখাল্লায় ঢাকা. পিঠে ঝুলি, হাতে— বোধ হয় একটা শানাই কিংবা ঐ-রকম কোনো যন্ত্র। মনে পড়ে না সে-যন্ত্রে সে কখনো ফু' দিয়েছে, মনে পড়ে না কখনো তাকে কথা বলতে শুনেছি। বেশির ভাগ তাকে দেখা যেতো হাটে-বাজারে, আর যত দূর থেকেই হোক, তাকে দেখামাত্র একটা কিলবিলে অস্বাভাবিক ভয়ে আমি প্রায় ম'রে যেতুম : হাতের আঙুল যদি গুরুজনের মুঠোয় ধরা থাকতো, তবু সে-ভয় পোষ মানতো না। ঋজু, নিঃশব্দ, ঘনগম্ভীর ঐ মূর্তিকে কিছুতেই আমি ভাবতে পারতুম না মানুষ ব'লে। ঐ ঝুলিতে কী আছে ? ভাবতে শিউরে উঠতুম। ও কোথায় যায়, কী খায়, কী করে ? ভাবতে কাঁটা দিতো গায়ে। এমন সব কথা আমার মনে হ'তো যার কোনো ভাষা নেই ; সে যেন বালকের কল্পনামাত্র নয়, পূর্বপুরুষের সমস্ত ভীতিকর অভিজ্ঞতার অচেতন সঞ্চয়। যাতে অকল্যাণ, যাতে অন্ধকার, যাতে অবরোধ. আর যা-কিছু বিকৃত, বীভৎস, পিচ্ছিল, পৈশাচিক, সেই সমস্ত-কিছুর অবতার ছিলো আমার কাছে ঐ— খুব সম্ভব নিরীহ

পাগল। পাগল হোক আর না-ই হোক, সে যে নিরীহ ছিলো এখন তা বোঝা সহজ, তবু তার কথা ভাবলে আজ পর্যন্ত একটা ছমছমানির ঢেউ ওঠে আমার শরীরে।

যারা প্রধানত আমার সঙ্গী ছিলো, তাদের বাবারা কেউ এস. ডি. ও., কেউ পি. ডব্লিউ. ডি.র কর্তা, কেউ বা পুলিশের ইন্সপেক্টর। অনেকেই তারা নোয়াখালিতে এসেছে আমার পরে, অনেকেই বিদায় নিয়েছে বদলির ধাক্কায় আমার আগেই। কিন্তু আরো অনেকে ছিলো যারা বদলির ঘুরপাকের বাইরে, যারা স্থানীয় এবং স্থায়ী— অন্তত তখন তা-ই ভাবতেন তাঁরা— গুহ, গুহরায়, রায়চৌধুরী, কয়েকটি ঈষৎ উঁচকপালে পরিবার। তাদের ছেলেরা পড়ে কলকাতায় কলেজে, ছুটিতে এসে হৈ-হৈ করে শহর ভ'রে, নাটক জমায় টাউন হলে, ডাকের জন্য দল বেঁধে দাঁড়িয়ে আড্ডা দেয় পোস্টাপিশের বাইরে সকালবেলায়। অসহযোগের ঝড় যখন উঠলো, তাদের কেউ-কেউ উড়ে গিয়ে জেলে পড়লো, ঈর্ষায় বুক ফেটে গেলো আমার, নিজেকে শতবার ধিক্কার দিলুম আর কয়েকটা বছর আগে জন্মাই নি ব'লে। আর সেই সঙ্গে তারা ছিলো, যারা অনেক এবং অনুল্লেখ্য, যারা কোনোদিন জেলে যায় নি বা দ্রষ্টব্য কিছু করে নি ; যারা বেঁচেছে তেমনি নিঃশব্দে, যেমন নিঃশব্দ আমাদের নিশ্বাস। যামিনী মাষ্টার অঙ্ক কষাতেন আমাকে, তাঁর রাত্রের আহারের বরাদ্দ ছিলো আমাদের সঙ্গে, ঠিক আটটায় বারান্দায় শোনা যেতো তাঁর কাশি, হ্রস্ব, কুণ্ঠিত, সশ্রদ্ধ— ক্ষুধার সঙ্গে যার পরিচয় আছে, খাদ্যের প্রতি সেই মানুষের শ্রদ্ধা স্বল্পতম শব্দে তিনি প্রকাশ করতেন। তালতলার অশ্বিনী কবিরাজের নাম-ডাক ছিলো শহরে— সময়ে-অসময়ে এবং কারণে-অকারণে তাঁর লাল-কালো বড়ি আমাদের খেতে হ'তো : তাঁর নিজের চেহারা তাঁর ওষুধের বিজ্ঞাপনের কাজ করতো না, কিন্তু বৈঠকখানাটি ভালো লাগতো আমার— রোদালো ঘর, পরিষ্কার ফরাশ, ঝকঝকে দেয়াল-ঘড়ি, আর-একটা ঘন কবরেজি গন্ধ। এই সব পারিবারিক চেনাশোনার বাইরেও দু-একজন বন্ধু হয়েছিলো আমার, মুসলমান তারা, অত্যন্ত বিনীত, আমার বিদ্যাবত্তায় মুগ্ধ। একজন পোস্টাপিশে চিঠির টিকিটে ছাপ দিতো, সুশ্রী ছিলো সে, নম্র ছিলো কণ্ঠস্বর। আর-একজনের সঙ্গে গিয়েছিলুম বনপথ দিয়ে অনেকদূর হেঁটে তাদের গ্রামের বাড়িতে, খেতে দিয়েছিলো ডাবের জল আর ডাবের শাঁস, ঘন গাছপালার ভিতর দিয়ে বিকেলের লাল রোদ্দুর এসে পড়েছিলো।

ভোর আসতো নোয়াখালিতে মোরগ-ডাকের সোনালি রথে চ'ড়ে— কোক্-কোরোক্-কো, কোক্-কোরোক্-কো— দিনের অভ্যর্থনা ধ্বনির ফোয়ারায় লাফিয়ে উঠতো আকাশে, আর সেই সঙ্গে শোনা যেতো পথে-পথে খোলা গলার উল্লাস, গ্রাম থেকে যারা শহরে আসছে সব্জি দুধ গুড়ের হাঁড়ি বেচতে, তারা শীতের কুয়াশায় পরস্পরকে হারিয়ে ফেলে, কিংবা মিছিমিছি, নিছক ফুর্তিতে চীৎকার ক'রে ডাকছে : এড়িও— আড়িডু— ৎ! এড়িও— আড়িডু— ৎ! একজন ডাকলো তো চার জন জবাব দিলো চার দিক থেকে, সমস্ত সকালটা ভ'রে উঠলো সেই তীক্ষ্ণ লম্বা

গিটকিরিতে, শেষের দিকটা ছুঁচোলো হ'য়ে প্রতিধ্বনির পিন ফুটিয়ে দিয়ে গেলো। আর কোথাও শুনি নি ঐ ডাক, ঐ ভাষা, ঐ উচ্চারণের ভঙ্গি। বাংলার দক্ষিণপূর্ব সীমান্তের ভাষাবৈশিষ্ট্য বিস্ময়কর। চট্টগ্রামের যেটা খাঁটি ভাষা, সেটা আমাদের অনেকের পক্ষেই দুর্বোধ্য, আর নোয়াখালির ভাষা, আমার মতো জাত-বাঙালকেও, কথায়-কথায় চমকে দিতো। শুধু যে ক্রিয়াপদের প্রত্যয় অন্য রকম তা নয়, শুধু যে উচ্চারণে অর্ধস্ফুট 'হ'-এর ছড়াছড়ি তাও নয়, নানা জিনিশের নামই শুনতুম আলাদা। সে-সমস্ত কথাই মুসলমানি ব'লে মনে করতে পারি না, সম্ভবত অনেকগুলো মগ ভাষা থেকে গৃহীত, কিছু হয়তো বর্মি, আর ছিটেফোঁটা পর্তুগিজও ধ'রে নেয়া যায়। একে তো সমস্ত বাংলাই পাণ্ডববর্জিত, তার উপর বাংলার মধ্যেও অনার্যতর হ'লো বাঙালদেশ, আবার সেই বাঙালদেশেও সবচেয়ে দূর, বিচ্ছিন্ন মিশ্রিত, অশ্রুত এই নোয়াখালি।

নোয়াখালির নগণ্যতা নিয়ে আক্ষেপ ছিলো আমার মনে। ভেবে পেতুম না, বিধাতা বেছে-বেছে আমাকে এমন জায়গায় ছুঁড়ে ফেললেন কেন, যার নাম কখনো ছাপার অক্ষরে ওঠে না। কলকাতা দিল্লি বম্বাইয়ের কথা ছেড়েই দিচ্ছি— ও সব তো স্বপ্ন— খবরকাগজে দেখতুম ঢাকা বরিশাল বাঁকুড়া শিলচরের কথা, এমনকি তমলুক নেত্রকোনা সিরাজগঞ্জের খবরও মাঝে মাঝে ছাপা হ'তো, কিন্তু নোয়াখালি —ও আবার একটা জায়গা, আর তার আবার একটা খবর! যদি বা দু-চার মাসে একবার মফস্বল নোটস-এর মধ্যে একটু জায়গা হ'তো নোয়াখালির, সে এতই ছোটো আর এতই ছোটো অক্ষরে যে রীতিমতো অপমান বোধ হ'তো আমার। কেন, এমনই কী তুচ্ছ জায়গাটা? এখানে এমন কয়েকটি যুবক তো আছেন যাঁরা 'নূতন'কে লেখেন 'নতুন', আর নতুন লেখেন ন-এ ওকার দিয়ে; এখানে 'সবুজ পত্রে'র একজন অন্তত গ্রাহক আছেন— শুধু তা-ই নয়, এমন একজন ভদ্রলোকও আছেন যাঁর প্রবন্ধ 'সবুজ পত্রে' ছাপা হ'য়ে 'প্রবাসী'র 'কষ্টিপাথরে' উদ্ধৃত হয়েছে। আর অসহযোগের উন্মাদনার দিনে নোয়াখালি কি পেছিয়ে ছিলো কারো তুলনায়? স্কুল ছাড়া বলো, জেলে যাওয়া বলো, মীটিং, বক্তৃতা, গান— কোনটাতে কম! বন্দে মাতরম্ আর আল্লা-হো-আকবর, এই যুগ্ম-নিনাদ কি উচ্ছ্বসিত হয় নি গানের দুই চরণের মতো: মোটা খদ্দর প'রে এ'টেল গ্রীষ্মে কি ঘামি নি আমরা, কুলির রক্ত স্নান ক'রে ত্যাগ করি নি চা? তবু কাগজওলাদের চোখে পড়লো না নোয়াখালি, এমনি অন্ধ তারা! এই মলিন অখ্যাতির মধ্যে বসবাস করতে আমার আর ভালোই লাগছিলো না; কিন্তু চোখের উপর অমুক-অমুক বাবু বদলি হ'য়ে গেলেন, কেউ চট্টগ্রামে, কেউ রংপুরে, কেউ মৈমনসিংহে: আমাদের ভাগ্যে শুধু বাসা-বদল এ-পাড়া থেকে ও-পাড়ায়, আমরা প'ড়ে আছি যে-তিমিরে সে-তিমিরে। শেষ পর্যন্ত যখন নোয়াখালি ছাড়বার দিন এলো আমাদের, এবং বোঝা গেলো আর আমরা ফিরবো না সেখানে, সেদিন আমি সুখী হয়েছিলাম, আমার কিশোর প্রাণ একবারও কাঁদে নি বাল্যকালের লীলাভূমিকে পিছনে ফেলে যেতে।

এতদিনে প্রতিশোধ নিয়েছে নোয়াখালি, ভীষণ প্রতিশোধ ; ছড়িয়ে দিয়েছে তার নাম বড়ো-বড়ো অক্ষরে, শুধু বাংলার বা ভারতের নয়, লণ্ডন, ন্যুয়র্কের খবর-কাগজে, এঁকে দিয়েছে তার নাম আরক্ত অক্ষরে মেয়েদের হৃৎকম্পনে, মায়েদের হৃৎপিণ্ডে। এমনকি সেই রামগঞ্জ থানা, যেখানে খালের উপর বাঁকা সাঁকো, আর খালের জলে কচুরি পানার বেগনি ফুলের আলো, যেখানে একবার নৌকো ক'রে বেড়াতে গিয়ে নারকোল দিয়ে রাঁধা কইমাছ অমৃতের মতো খেয়েছিলুম, যার অস্তিত্ব সমস্ত পৃথিবীতে কেউ জানতো না, সেই রামগঞ্জের নাম আজ সারা বাংলার মুখে-মুখে। রামগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর, শ্রীরামপুর ·· তুচ্ছ ভেবেছি এইসব নাম, অতি তুচ্ছ, আর আজ তারা কত বড়ো, কী মারাত্মকরকম বড়ো। ঈর্ষাযোগ্য নয় এই ভাগ্য, কিন্তু ···কে জানে। গান্ধী আজ সেখানে, আর গান্ধীর চেয়ে বাঞ্ছনীয় আজকের দিনের পৃথিবীতে আর কী ?

ইতিমধ্যেই খবর-কাগজে নোয়াখালির খবরের অক্ষর হয়েছে ছোটো, স্থান সংকুচিত। পয়লা পাতায় আবার জাঁকিয়ে বসেছে দিল্লি লণ্ডন মস্কো ওয়াশিংটন ; কিন্তু বর্তমান সময়ের সবচেয়ে বড়ো ঘটনা আস্তে-আস্তে উন্মীলিত হচ্ছে বাংলার অখ্যাততম অনার্যভূমিতে ; বর্তমান সময়ের শুধু নয়, চিরকালের চরম একটি প্রশ্নের উত্তর সেখানে রচিত হ'লো, যার প্রভাব আজ মনে হ'তে পারে কাকিণ্ডৎকর ;— কিন্তু হয়তো একদিন ছড়িয়ে পড়বে দূরান্তরে ও যুগান্তরে। মানুষের মধ্যে যে-অংশ জীব, তার ইতিহাস আজ যুদ্ধের পরে গ'ড়ে উঠেছে পৃথিবীর শক্তিশালী রাজধানী-গুলিতে ; কিন্তু মানুষের মধ্যে যে-অংশ দেবতা, বা অন্তত দেবাভিমুখী, তার ইতিহাসের ক্ষেত্র আজ সমস্ত পৃথিবীতে একমাত্র নোয়াখালি।

নিষ্ঠুর শোনাবে কথাটা, তবু বলবো, ভাগ্যিশ নোয়াখালি ঘটেছিলো। তাই তো গান্ধী মুক্তি পেলেন দিল্লি-লণ্ডনের কূটচক্র থেকে ; বোম্বাই-আহমেদাবাদের ঘনজটিল জাল থেকে ; সভা, সমিতি, দল, দলপতি, বিতর্ক, যন্ত্রণার অশেষ-বিষাক্ত পরিমণ্ডল থেকে ; সংখ্যা, তথ্য ও আইনের পিচ্ছিলতা থেকে ; লোভীর সঙ্গে লোভীর বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতার প্রচ্ছন্ন-প্রখর আবর্ত থেকে ; স্বর্গরাজ্যের সর্বনাশী পরিকল্পনা থেকে ; মিথ্যা থেকে, মত্ততা থেকে ; গণ-নেতার অনিবার্য ধর্মচ্যুতি থেকে। গণ-নেতার নেতাই তো জনগণ, আর জনতার প্রমত্ততা যেহেতু সমাজের একটা মৌল সত্য, তাই নেতৃপদে একবার অভিষিক্ত হ'লে বার-বার চরিত্রচ্যুত না-হ'য়ে উপায় থাকে না কোনো মানুষের। মানুষের পক্ষে ভালো হওয়া সম্ভব শুধু একলা হ'লে, সংঘবদ্ধ হ'লেই সে মন্দ ; অথচ আমরা এমনি নির্বোধ যে মাত্র পঁচিশ বছরের মধ্যে দু-দু-বার সংঘবদ্ধ মানুষের নারকীয়তা প্রত্যক্ষ ক'রেও, এবং তার অনেকগুলি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ রীতিমতো মুখস্থ থাকা সত্ত্বেও, এখনো আমরা জনগণের উদ্ধার-কারীদের বিশ্বাস করি।

এই মোহ থেকে বেরিয়ে এলেন পৃথিবীতে অন্তত একজন মানুষ। সমস্ত জীবন তিনি স্বদেশের জন্য ক্ষয় করেছেন রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা লাভের চেষ্টায়— দীর্ঘ কঠিন

ঝঞ্ঝাহত বছরের পর বছর ধ'রে ;—তারপর সেই রাষ্ট্রগঠনের সময় যখন এলো; তখন দেখলেন, যে-স্বাধীনতার জন্য সমস্ত দেশকে মাতিয়ে তুলেছিলেন, তার প্রথম-তম সম্ভাবনাতেই হিংসা উঠলো উদ্বেল হ'য়ে। স্তম্ভিত হ'য়ে রইলেন কয়েক দিন, তারপর তাঁর যাত্রা শুরু হ'লো। দিল্লি তাঁকে দলে পেলো না, ওয়ার্ধা তাঁকে বেঁধে রাখলো না, মরীচিকার মতো মিলিয়ে গেলো লণ্ডন জেনিভা ন্যুয়র্ক। পথের মানুষ আবার পথে নামলেন। ভেঙে দিলেন আশ্রম, ছেড়ে দিলেন সঙ্গীদের, দেহের ন্যূনতম প্রয়োজনের অভ্যাসকে বর্জন করলেন, একলা হলেন, মুক্ত হলেন। এ মুক্তিতে তাঁর প্রয়োজন ছিলো। এ না-হ'লে ব্যর্থ হ'তো তাঁর জীবনব্যাপী সাধনা। এই তাঁর পূর্ণতা, তাঁর প্রায়শ্চিত্ত, যুধিষ্ঠিরের মতো কঠিন শোকাচ্ছন্ন নিঃসঙ্গ স্বর্গারোহণ।

কোন স্বর্গে? যেখানে সব আলো, সব খোলা, সব সহজ। যেখানে ভয় নেই, বীরত্বও নেই। লোভ নেই, ত্যাগও নেই। ক্রোধ নেই, সংযমও নেই। যেখানে আশ্রয় নেই, তবু নিশ্চয়তা আছে। যেখানে বিফলতা নিশ্চিত, তবু আশা অন্তহীন। তিনি বেরিয়ে পড়লেন নোয়াখালির পথে, পায়ে হেঁটে, একা। গেলেন গ্রাম থেকে গ্রামে, বাড়ি থেকে বাড়িতে, কথা বললেন প্রত্যেকের সঙ্গে, অংশ নিলেন প্রত্যেকের জীবনের। বয়স তাঁর আটাত্তর। স্বজন বহুদূরে। বজ্রকঠিন শরীর, তবু মানুষের রক্তমাংস। অমিতশান্ত স্বভাব, তবু মানুষের মন। কোথায় প'ড়ে রইলো তাঁর দেশ, যেখানে বছরের পর বছর তিনি কাটিয়েছেন ভক্ত বন্ধুদের সাহচর্যে, আর কোথায় এই সিক্ত, কর্দমাক্ত, অসংস্কৃত, অবান্ধব নোয়াখালি! কোথায় তাঁর পথের শেষ জানেন না, কখনো ফিরবেন কিনা তাও জানেন না।...কিন্তু কেন? অহিংসার অগ্নিপরীক্ষা হবে ব'লে। চিরস্থায়ী শান্তি আনবেন ব'লে? ও-সব কথা কিছু বলতে হয় ব'লেই বলা ; আসলে অর্থহীন। আসল কথা, স্বর্গকে তিনি পেয়েছেন এতদিনে : সেই স্বর্গ নয়, যা দিয়ে রাজনৈতিক রচনা করেন জনগণের সমস্ত বঞ্চিত কামনার, ঈর্ষার, কুসংস্কারের তৃপ্তিস্থল, আর পৃথিবীর মাটি স্পর্শ করতে-না করতে যা প্রতিপন্ন হয় আরো একটি যুদ্ধের মাতৃজঠর ; সেই স্বর্গ, যা মানুষ সৃষ্টি করে একলা তার আপন মনে, সব মানুষ নয়, অনেক মানুষও নয়, কেউ-কেউ যার একটুমাত্র আভাস হয়তো মাঝে-মাঝে পায়, কিন্তু যাকে জীবনের মধ্যে উপলব্ধি করতে যিনি পারেন তেমন মানুষ কমই আসেন পৃথিবীতে ; —আর তেমনি একজনকে আজ আমরা চোখের উপর দেখছি বিদীর্ণ বিহ্বল নোয়াখালির জলে, জঙ্গলে, ধুলোয়। নম্র হও, নোয়াখালি ; পৃথিবী, প্রণাম করো।

১৯৪৭ 'উত্তরতিরিশ'

'যে-আঁধার আলোর অধিক'

পাঁচ মিনিট আগে পৌঁচেছি হোটেল ক্রাস্‌নাপোলাস্কিতে। ঘরে ঢুকেই প্র. ব. শুয়ে পড়েছেন সোফায়, বিশ্রাম ছাড়া অন্য কিছুর জন্যেই এ-মুহূর্তে তাঁর আকাঙ্ক্ষা নেই। ক্লান্ত আমিও— আমাদের সাম্প্রতিক অবস্থায় শরীরের ক্লান্তি অনিবার্য। সেই যে এক বৃষ্টি-পড়া মলিন সন্ধ্যায় ন্যুয়র্ক ছেড়েছিলুম, তারপর থেকে দু-সপ্তাহ ধ'রে অনবরত ঘুরছি— স্থান থেকে স্থানান্তরে, দেশ থেকে দেশান্তরে, হোটেল থেকে প্লেন, এবং প্লেন থেকে আবার এক অন্য হোটেলে। মন চায় জগৎটাকে গ্রাস করতে, কিন্তু দেহের সাধ্য সীমিত। রাস্তায়, চিত্রশালায়, আর মালবাহী অবস্থায় বিমানবন্দরগুলোতে মাইলের পর মাইল হেঁটে-হেঁটে আমার একটা পা খোঁড়া হ'য়ে গেছে, প্যারিসে এসে ব্যাণ্ডেজ বেঁধেছি পায়ে, কিন্তু এখনো স্বাভাবিকভাবে হাঁটতে পারছি না। গত দুই রাত্রি প্যারিসে প্রায় নিদ্রাহীন কাটিয়েছি, সেখানে একটি চমৎকার দল জুটেছিলো আমাদের— কলকাতাবাসিনী বন্ধুপত্নী, দেশত্যাগী ভবঘুরে ভটচায ব্রাহ্মণ, পূর্ব পাকিস্তানি বাংলা সাহিত্যপ্রেমিক, শেষোক্ত দু-জনের বিদেশিনী বান্ধবীরা— এই যোগাযোগের ফলে এবং জুন মাসের রেশম-কোমল বাতাসের উৎসাহে, কাফেতে ঘুরে-ঘুরে রাত্রিযাপন না-করা অসম্ভব হয়েছিলো। মনে হয়েছিলো সারা প্যারিসই কাফেতে ব'সে আছে, কেউ ঘুমোচ্ছে না ; আড্ডার এই রমণীয় রাজধানীতে ঘুম জিনিশটাকে মনে হয় নিতান্তই সময়ের অপব্যয়। আজ কাক-ভোরে উঠে প্লেন ধরতে হয়েছে ; এক ঘণ্টায় আমস্টার্ডাম, নগরের কেন্দ্রস্থলে এই হোটেল, সামনে চওড়া চত্বর, রাজবংশের অন্যতম প্রাসাদ। এখন বেলা দশটা : আকাশ ঈষৎ মেঘলা, ভেজা-ভেজা অনুজ্জ্বল রোদ জানলা দিয়ে চুঁইয়ে পড়ছে আসবাবে ও গালিচায়, রাস্তায় একটি রক্তবর্ণ পুষ্টদেহ লোক বেহালা বাজিয়ে গান গাইছে, আমরা তাকে কয়েকটি মুদ্রা জানলা থেকে ছুঁড়ে দিয়েছি— আমি টেলিফোন তুলে বলেছি আমাদের ঘরে চা দিয়ে যেতে।

আমিও ক্লান্ত, কিন্তু আমার মনের উত্তেজনায় শরীরের ক্লান্তি চাপা প'ড়ে আছে। এই হোটেলে পা দেয়ামাত্র নিরাশ হয়েছিলুম আমি, কেননা এই মধ্য-নাগরিক অবস্থান আমার অভিপ্রেত ছিলো না। ন্যুয়র্কের আমেরিকান এক্সপ্রেসকে আমি বিশেষভাবে বলেছিলুম, আমরা এমন এক হোটেল চাই যেটা খালের ধারে অবস্থিত, আর চাই এমন ঘর যার জানলা দিয়ে খালের জল দেখা যায়। বিদগ্ধ পাঠককে বুঝিয়ে বলতে হবে না যে বোদলেয়ারের 'ভ্রমণের আমন্ত্রণ' কবিতার দৃশ্য ও আবহকে প্রত্যক্ষ করা আমার উদ্দেশ্য ছিলো। পুরোনো কোনো হোটেল, খাঁটি ওলন্দাজ ধরনে সাজানো

একটি ঘর, মেঘে মাস্তুলে চিহ্নিত একটি সান্ধ্য আকাশ, জলে সূর্যাস্তের আভা— এই সব প্রত্যাশা নিয়ে এসেছিলাম। তার বদলে এই ভিড়াক্রান্ত, আনকোরা-বিশ-শতকী, চিক্কণ ও নিশ্চরিত্র হোটেল দেখে মনটা দ'মে গিয়েছিলো— আমেরিকান এক্সপ্রেসের কর্মীটির প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করি নি। কিন্তু এই ক-মিনিটে সেই আশাভঙ্গজনিত অসন্তোষও আমি কাটিয়ে উঠেছি। আমার মন-খারাপ করার সময় নেই, ক্লান্তি অনুভব করার সময় নেই, বিশ্রাম উপভোগ করার সময় নেই। আমি কোনো সাহিত্যিক বা সামাজিক কর্তব্য নিয়ে আমস্টার্ডামে আসি নি, কোনো প্রতিষ্ঠানের নিমন্ত্রিত আমি নই এখানে ; আমি এখানে এসেছি সম্পূর্ণ নিজের গরজে, আমার প্রিয় ও পরিচিত একটি মানুষের সঙ্গে দেখা করতে। যত শিগগির সম্ভব তাঁর কাছে আমি উপস্থিত হ'তে চাই।

প্র. ব. কিছুতেই আজ বেরোতে রাজি নন, লাঞ্চের পর আমি একাই বেরিয়ে পড়লুম। আমার দিন কাটলো রাইক্সম্যুজিয়মে, আমাকে সঙ্গ দিলেন সারাক্ষণ রেমব্রাণ্ট।

স্পিনৎসাকে বাদ দিলে যিনি হল্যাণ্ডের প্রধান পুরুষ, যাঁর কর্মজীবন নিরন্তর আমস্টার্ডামে কেটেছিলো, এই নগরের প্রধান চিত্রশালা সংগতভাবে তাঁরই দ্বারা অধিকৃত। অন্যান্য প্রতিভাবান শিল্পীরা তাঁর প্রতিবেশে যেন ম্লান এখানে ; আজ অন্তত অন্য কারো জন্য আমার সময় নেই। এখানেই আছে সেই আলেখ্য, যা 'নৈশ পাহারা' নামে বিশ্ববাসীর বৃত হয়েছে : সবার আগে সেটি আমি দেখতে চাই। চোখের লোভ সামলে অনেকগুলো ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ পার হ'য়ে এলাম, তারপর একটি শূন্য গলির শেষে মেরূন রঙের মখমলের পর্দা ঠেলে একটি বিশাল কক্ষ পাওয়া গেলো। সামনের দেয়াল সম্পূর্ণ জুড়ে আছে 'নৈশ পাহারা'— বিরাট পট, একটি বিজ্ঞপ্তি প'ড়ে জানলাম একটি অংশ ছেঁটে ফেলে তবে ঐ প্রকাণ্ড দেয়ালে ধরানো গিয়েছিলো। অন্য দেয়ালে ভ্যান ডের-হেলস্ট-এর একটি পট— যিনি সতেরো শতকে রেমব্রাণ্টের চেয়ে অনেক বেশি লোকপ্রিয় ছিলেন, আর আজ যাঁর নাম বিশেষজ্ঞ ছাড়া কেউ জানে না। এই কক্ষে এ-দুটি ভিন্ন ছবি নেই। দ্বিতীয়টির দিকে দৃষ্টিপাত করে লোকেরা, প্রথমটির দিকে তাকিয়ে থাকে।

আমিও দাঁড়িয়েছি এই ছবির সামনে— দূর থেকে, কাছে থেকে, কোণ থেকে, কেন্দ্র থেকে— বিভিন্নভাবে দেখে-দেখে হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করছি। অসাধারণ ভাগ্যরেখা নিয়ে এর জন্ম হয়েছিলো। রচনাকালে প্রত্যাখ্যাত ও অমানিত, পরবর্তীকালে জগৎ-জোড়া যশের অধিকারী, আঠারো শতক থেকে 'নৈশ পাহারা' নামে পরিচিত— যদিও তথ্যের হিশেবে ছবিটি নৈশ নয়, এবং এতে কোনো পাহারাও নেই। শুধু নামে নয়, রচনাশিল্পেও অসংগতি এর লক্ষণ— এর ব্যাখ্যা নিয়ে সমালোচকেরা যুগে-যুগে তর্কপরায়ণ, যেন এতে চিত্ররচনার কোনো-একটি গোপন সূত্র ব্যবহৃত হয়েছে যা কোনো প্রামাণিক আদর্শের মধ্যে পড়ে না। রেমব্রাণ্টের একটি শ্রেষ্ঠ কৃতি একে হয়তো বলা যায় না, অথচ এটি 'মনা লিসা'র মতোই

অফুরন্তভাবে আলোচিত। কেন এত তর্ক এই ছবি নিয়ে, কেন এর খ্যাতি এমন অসামান্য?

তার কারণ, এই চিত্র রহস্যময়— হয়তো বা য়োরোপীয় চিত্রকলায় রোমাণ্টিক ধারার প্রবর্তক, যে-অর্থে শেক্সপীয়র রোমাণ্টিক, সেই অর্থে। আমস্টার্ডামের তেইশ জন নগররক্ষী রেমব্রাণ্টের কাছে চেয়েছিলেন নিজেদের যৌথ প্রতিকৃতি, কিন্তু যা রচিত হ'লো তাতে 'শবব্যবচ্ছেদ'-এর নিখুঁত বাস্তবতা দেখা গেলো না : প্রত্যেকে সুস্পষ্ট ও সম্পূর্ণভাবে চিত্রিত হবেন, এই দাবি উপেক্ষিত হ'লো। অতএব তাঁরা অগ্রাহ্য করলেন ছবিটিকে— তাঁদের দিক থেকে ভুল করলেন না, কেননা তুলির দ্বারা তখন-পর্যন্ত-অজাত ক্যামেরার কর্ম করতে পারেন, এমন শিল্পীর অভাব ছিলো না হল্যাণ্ডে— পরে দলপতি কক্ সন্তুষ্ট হয়েছিলেন ভ্যান ডের হেল্স্ট-এর আঁকা প্রতিকৃতি পেয়ে। রেমব্রাণ্ট নিজেও পারদর্শী ছিলেন সেই বিদ্যায়, কিন্তু 'নৈশ পাহারা'য় নিজেকে তিনি অতিক্রম করলেন— এই ছবি থেকেই শুরু হ'লো তাঁর সংসারভাগ্যের পতন আর শিল্পী হিশেবে তাঁর মহত্ত্বের পর্যায়।

ছবিটির সামনে দাঁড়ানোমাত্র আমরা যা অনুভব করি, তা গতি, চাঞ্চল্য, অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা। 'শবব্যবচ্ছেদ'-এর আঁটো বাঁধুনি— প্রতিটি মুখের উপর সমতল আলো, শবের সুনিশ্চিত শবত্ব, চিকিৎসকবৃন্দের স্পষ্ট জ্ঞানস্পৃহা— এ-সবের সঙ্গে এই অস্থিরতার প্রতিতুলনা কতই না সহজ। 'নৈশ পাহারা'য় বাস্তবতা নেই, যাকে আমরা স্বাভাবিকতা বলি তাও নেই; যেন অনেক বিবাদী সুরের সমন্বয়ে, অনেক স্ববিরোধের ছন্দোবন্ধে এর রচনা। এর অজ্ঞাত-উৎস নামকরণ আসলে ভ্রান্ত নয়, কেননা এই বিরাট পট রেমব্রাণ্টীয় নৈশ আবহে লিপ্ত হ'য়ে আছে। প্রতিবেশীর জামার উপরে ক্যাপ্টেন কক্-এর হাতের ছায়া দেখে সমালোচকেরা যদিও নিঃসংশয়ে বলেছেন যে সূর্য প্রায় মধ্যগগনে, তবু আমাদের চোখের ও মনের কাছে ঘটনাকাল রাত্রি ব'লে প্রতিভাত হয়। এমনকি আমরা উদ্ধত বর্শাগুলোকে মাঝে-মাঝে মশাল ব'লে ভুল করি, পুরোভূমির আংশিক উজ্জ্বলতায় যেন পটভূমির নৈশ তিমির দৃশ্যমান হ'লো। যে-আলো-আঁধারিতে রেমব্রাণ্ট তাঁর ব্যক্তিস্বরূপ প্রকাশ করেছিলেন, যে-ভাবে, রাফায়েলের বিরুদ্ধে, রুবেন্স-এর বিরুদ্ধে, সমগ্র ইটালীয় রেনেসাঁস-শিল্পের বিরুদ্ধে তিনি পটের অধিকাংশ অন্ধকারে রেখে শুধু একটি বা কোনো-কোনো নির্বাচিত অংশকে উদ্ভাসিত ক'রে তুলতেন— তাঁর সেই মায়াজাল 'নৈশ পাহারা'তেও প্রত্যক্ষ করি আমরা। যেমন তাঁর অন্য অনেক স্মরণীয় চিত্রে তেমনি এখানেও অন্ধকারই প্রধান ও ব্যাপ্ত, যেটুকু আলো দেখা যাচ্ছে তা অন্ধকারেরই হৃদয় থেকে উৎসারিত। আমরা বিস্মিত হই, যখন দেখি প্রতিকৃতি আঁকার ফরমাশ নিয়েও বাস্তবধর্মী হবার কোনো চেষ্টাই করেন নি রেমব্রাণ্ট— লোকগুলোর মধ্যে কেউ অত্যন্ত ঢ্যাঙা, কেউ এত বেঁটে যে প্রায় কুঁজো মনে হয়, কেউ অস্বাভাবিক স্থূলকায়, কারো-কারো শুধু মুখ, একজনের শুধু একটি চোখ দেখা যাচ্ছে, কোনো-কোনো মুখ ভৌতিক ধরনে অস্পষ্ট, অনেকে অন্ধকারে অর্ধলীন— আর সব সুদ্ধ এমন ঘেঁষাঘেঁষি ভিড় যে

তেইশ জনকে খুঁজে পাওয়া সহজ হয় না। সবচেয়ে কৌতূহলের বিষয় ছবির অনন্য নারীমূর্তিটি— খর্বকায়, প্রোজ্জ্বল, অসুন্দর, প্রায় অতিপ্রাকৃত— এই বীরবৃন্দের মধ্যে কী করছে সে, কেন সারা ছবিতে একমাত্র সে-ই পূর্ণ আলোয় উদ্ভাসিত, তার কোমর থেকে একটা মুর্গি ঝুলছে কেন? সে কি ইহুদি-পাড়ার কোনো দীন রমণী, কোনো পরি, কোনো রূপকথার নায়িকা, ছবির ডান দিকের ছায়াচ্ছন্ন কুকুরটির সঙ্গে তার কি কোনো সম্পর্ক আছে? কিন্তু— সে যে-ই হোক, এই ছবিতে তাকে কেন স্থান দেয়া হ'লো?

এই প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই, কিন্তু এই রমণীর সূত্র ধ'রে হয়তো রেমব্রাণ্টের অভিপ্রায় অনুমান করা যায়। তিনি কি চেয়েছিলেন এই আত্মাভিমানী ক্ষুদ্র ব্যক্তিদের বিদ্রূপ করতে – যারা যুগধর্ম ও দেশাচার অনুসারে নিজেদের চাটুকারী প্রতিকৃতি দেখতে চেয়েছিলো— আর সেইজন্যেই এত অসংগতি মিশেয়েছিলেন? এর উল্টোটাই সত্য ব'লে মনে হয় আমার: রেমব্রাণ্ট চেয়েছিলেন এই সাধারণ মানুষগুলোকে স্বপ্নের স্তরে, কবিতার স্তরে উন্নীত করতে, কোনো নাটকের চরিত্রে রূপান্তরিত করতে চেয়েছিলেন। হয়তো সেইজন্যেই, একটুখানি লোকোত্তর আভাস দেবার জন্যেই, ঐ আকস্মিক ও দুর্বোধ্য নারীমূর্তির অবতারণা। ইতিহাস হিশেবে আমরা জানি যে ছবিটির বিষয় হ'লো 'ক্যাপ্টেন কক্-এর শোভাযাত্রা'— অর্থাৎ দলপতি তাঁর কার্যালয় থেকে সদলে বেরোচ্ছেন অস্ত্রচালনা অভ্যাস করতে— কিন্তু এই তুচ্ছ বিষয়কে কোন সুদূরে ফেলে এসেছে রেমব্রাণ্টের কল্পনা! ছবিতে আমরা যা পাচ্ছি তা এক তীব্র সংকটের মুহূর্ত— এত অস্থিরতা ও অবিন্যাস সেইজন্যেই, সেইজন্যেই বসনভূষণের অঙ্কন এমন যত্নহীন, আর মানুষগুলোর বিন্যাসেও প্রথাবদ্ধ শৃঙ্খলা নেই। যেন বিরাট কোনো ঘটনা মুহূর্তকাল পরেই ঘটবে, বা মুহূর্তকাল আগে ঘ'টে গেছে, যেন নিশীথকালে অকস্মাৎ শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে নগর বা আশাতীত কোনো সুসমাচার এসে পৌঁছলো— মানুষগুলো যে যেমন ছিলো তেমনি বেরিয়ে এসেছে বর্শা বন্দুক দামামা আর পতাকা নিয়ে, সুপ্রসাধিত হবার জন্য অপেক্ষা করে নি; যে যেখানে জায়গা পেয়েছে দাঁড়িয়ে গেছে, চেষ্টা করে নি শোভনভাবে বিন্যস্ত হ'তে। লক্ষ করলে দেখা যাবে, প্রত্যেকের মুখের পেশী টান হ'য়ে আছে, উৎকণ্ঠিত তারা, কিসের যেন প্রতীক্ষা করছে, প্রস্তুত হচ্ছে যুদ্ধের অথবা অভ্যর্থনার জন্য, যেন দাঁড়িয়েছে এক স্মরণীয় মুহূর্তের মুখোমুখি। কী হচ্ছে, বা হ'তে চলেছে তা আমরা কেউ জানবো না কোনোদিন— কোনো ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক অনুষঙ্গ নেই, এক অনিশ্চিত অনির্ণেয় জগতে, এক রাত্রিপ্রতিম দিবা-লোকের প্রদোষে কতগুলো মানুষ যেন একাধিক অর্থে সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে। এই ব্যাপ্ত উত্তেজনার মধ্যে শুধু মুর্গি-ধারিণী মেয়েটির মুখ নিতান্ত ভাবলেশহীন; তাকে মনে হয় যেন মানুষ নয়, পুতুল, মানবী নয়, প্রতিমা; এই ঘটনায় কোনো অংশ নেই তার— পট জুড়ে যে-বহুমিশ্র নিনাদ ধ্বনিত হচ্ছে তার মধ্যে সে একা শুধু শব্দহীন সাক্ষী।

'নৈশ পাহারা' রচনার সময় রেমব্রাণ্টের বয়স ছিলো ছত্রিশ। পূর্ণ যৌবন, আদরিণী বিত্তশালিনী স্ত্রী সাস্কিয়া, তুলি চালিয়ে বিবর্ধমান খ্যাতি ও উপার্জন— নানা দেশের ছবি, মূর্তি ও কারুকলার সংগ্রহে সমৃদ্ধ তাঁর পরিবেশ। একজন শিল্পীর পক্ষে যা-কিছু কাঙ্ক্ষণীয় হ'তে পারে, প্রায় সবই তাঁর ছিলো তখন। কিন্তু 'নৈশ পাহারা'র স্বল্পকাল পরে সাস্কির মৃত্যু হ'লো, ঐ ছবির প্রত্যাখ্যানের ফলে মন্দা লাগলো ব্যবসায়িক পসারে। স্ত্রীকে হারিয়ে, ক্রেতা হারিয়ে ছবি আঁকা একদিনের জন্যও থামালেন না, সাস্কিয়ার অর্থের উত্তরাধিকারী হ'য়ে তাঁর স্বভাবসংগত অমিত-ব্যয়িতাও বজায় রাখলেন। নিজের ভোগ ও বিলাসিতার জন্য নয়, শিল্প-সামগ্রী সংগ্রহের জন্য এই অমিতব্যয়। ১৬৫৬ সালে— 'নৈশ পাহারা'র চোদ্দ বছর পরে— ঋণজর্জর হ'তে-হ'তে অবশেষে লাল বাতি জ্বালতে হ'লো, পাওনাদারেরা নিলেমে তুললো রেমব্রাণ্টের যাবতীয় সম্পত্তি। সেই একই বছরে অন্য এক কঠিনতর আঘাত পেলেন : তাঁর দ্বিতীয়া প্রেয়সী হেনড্রিকিয়েকে ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের কাছে সশরীরে উপস্থিত হ'য়ে কবুল করতে হ'লো যে তিনি 'চিত্রশিল্পী রেমব্রাণ্টের সঙ্গে বেশ্যার মতো বসবাস করছেন।' সাস্কিয়ার উইলে একটি শর্ত ছিলো যে রেমব্রাণ্ট আবার বিবাহ করতে পারবেন না, কিন্তু— যেমন অন্য অনেক শিল্পীর জীবনে— তেমনি রেমব্রাণ্টের পক্ষেও নারীর প্রেম ও সঙ্গ ছিলো অপরিহার্য— অতএব এক সুশ্রী ও স্বাস্থ্যবতী প্রাক্তন পরিচারিকার সঙ্গে বিনা-অনুষ্ঠানে সংযুক্ত হলেন। খুব সম্ভব রেমব্রাণ্ট ভেবেছিলেন যে ভগবানের চোখে বিবাহ ব'লে কিছু নেই, এবং পারস্পরিক প্রণয়ের দ্বারাই স্ত্রী-পুরুষের মিলন পুণ্য হয়— কিন্তু এ-সব যুক্তি যেহেতু সমাজপতিরা সাধারণত উপেক্ষা ক'রে থাকেন, তাই নিগ্রহভোগ করতেই হ'লো। হেনড্রিকিয়ে ছিলেন অন্তঃসত্ত্বা তখন ; ধর্মপিতারা শাসালেন যে তিনি তাঁর 'পাপ' প্রকাশ্যে স্বীকার না-করলে তাঁরা তাঁর অজাত সন্তানের আত্মাকে অনন্তকালের জন্য নরকে পাঠাবেন। সন্তানের আত্মাকে বাঁচাবার জন্য হেনড্রিকিয়ে মেনে নিলেন নিজের ধর্মচ্যুতি, 'বেশ্যাবৃত্তি'র শাস্তিস্বরূপ যীশুর করুণালাভের সম্ভাবনা থেকে তিনি চিরকালের মতো বঞ্চিত হলেন— অন্ততপক্ষে চার্চের তা-ই ফতোয়া বেরোলো ; তবে যীশু তাঁর স্বনিয়োজিত মর্ত্য প্রতিভূদের সঙ্গে একমত হয়েছিলেন কিনা, তা আমাদের জানা নেই।

যুগপৎ বিখ্যাত ও দরিদ্র হবার বেদনা আমরা কেউ-কেউ প্রত্যক্ষভাবে জেনেছি। দারিদ্র্য শুধু কষ্টের নয়, তা অসম্মানজনক, তা আমাদের বাধ্য করে হৃদয়ের দিক থেকেও সংকুচিত হ'তে, নানা ধরনের ক্ষুদ্র বিষয়ে মনোযোগ দিতে। সৃষ্টিশীলতার সঙ্গে দারিদ্র্য তাই সহজে মেলে না, প্রতিভাবানকে বিকল ক'রে দেবার ক্ষমতা আছে তার। এই অবরোধ ও মালিন্যের মধ্যেই রেমব্রাণ্ট কাটালেন তাঁর জীবনের শেষ অধ্যায়, কিন্তু সাংসারিক দুর্গতি তাঁর সৃষ্টিকে ব্যাহত করতে পারলে না। পুত্র টিটুস ও বুদ্ধিমতী হেনড্রিকিয়ের প্রযত্নে কোনোরকমে সংসার চলে : যা-কিছু তিনি ভালোবাসতেন, তাঁর আজীবনসঞ্চিত শিল্প-সামগ্রী, কিছুই আর নেই এখন,

উঠে এসেছেন ছোটো বাড়িতে, কিন্তু অটুটভাবে স্বধর্মে তিনি প্রতিষ্ঠিত। অবশেষে প্রিয়তমা হেনড্রিকিয়ে ও টিটুসেরও মৃত্যু হ'লো, তবু তিনি সৃষ্টিশীলতায় অবিচল। শুধু যে অবিরাম চিত্ররচনা করছেন তা-ই নয়, শুধু যে অবক্ষয়ের কোনো চিহ্ন নেই তা নয়, দুর্দিনে আরো গভীর হয়েছে তাঁর শিল্প, আরো মনস্বী হ'য়ে উঠেছে বিশ্ববেদনার চিত্ররূপ। মৃত্যুর পরে তাঁর সম্পত্তি রইলো কিছু জীর্ণ বস্ত্র, ছবি আঁকার সরঞ্জাম— আর রইলো অমরতা।

কিন্তু— শুধু শেষ জীবনে নয়, তাঁর সৌভাগ্যের উত্থানকালেও তাঁকে ঘিরে আলোর চেয়ে অন্ধকার কি বেশি ছিলো না, স্বাচ্ছন্দ্যের চেয়ে বেশি ছিলো না গোপনতা? অদৃষ্টের এক চমৎকার খেলা দেখা যায় দুই প্রতিবেশী দেশে, প্রায় একই সময়ে, দুই শিল্পীর জীবনধারা। রুবেন্স— ইটালির আলোকপ্রাপ্ত রোমান ক্যাথলিক, ধর্মরাজ ও পৃথ্বীরাজদের প্রিয়পাত্র, বিদগ্ধ, উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বশালী, য়োরোপের প্রধান বেসরকারি রাজদূত, বিপুল বিত্ত ও প্রতিপত্তি নিয়ে একাধিক অর্থে শিল্পসম্রাট। আর রেমব্রান্ট— প্রটেস্টান্ট, কিন্তু চার্চের দ্বারা নিগৃহীত, অনভিজাত, স্বল্পশিক্ষিত, কুলীনসমাজে প্রবেশের অধিকারহীন, সাংসারিক অর্থে অকৃতী এবং উত্তরজীবনে দরিদ্র— এমন একটি মানুষ, যাঁর সমস্ত মেধা ও উদ্যম, সমস্ত ভাবনা ও প্রয়াস একটিমাত্র লক্ষ্যের দিকে অনবরত ধাবিত হয়েছে। রেমব্রান্ট কখনো ইটালিতে বা ইংলণ্ডে যান নি, কোনো রাজা অথবা গুণীর সঙ্গে পত্রবিনিময় করেন নি, তাঁর কোনো অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলো ব'লে জানা যায় না: ভ্রমণবিমুখ, অমিশুক ও উৎকেন্দ্রিক স্বভাবের জন্য লোকমুখে তাঁর ডাকনাম হয়েছিলো 'প্যাঁচা'; খৃষ্টান হ'য়েও আমস্টার্ডামের ইহুদিপাড়ায় বহু বৎসর কাটিয়েছেন, সরু গলিতে, অবহেলিত বিধর্মীদের সংসর্গে— হয়তো বা স্পিনৎসার প্রতিবেশী ছিলেন কোনো সময়ে— যাদের ম্লান মুখাবয়ব ও অচারু বেশবাস বহুবার তাঁর চিত্রে আমরা দেখতে পাই। রুবেন্সের তুলনায় তাঁর জীবন যেমন বৈচিত্র্যহীন, তেমনি তাঁর শিল্পের বিষয়বস্তুও সীমিত: গ্রীক ও রোমক পুরাণ, ইতিহাস, ভূগোল, খৃষ্টীয় ঐতিহ্য, নারী ও পুরুষ, শিশু ও পশু, মানুষ ও দেবতা— রুবেন্স যেন সারা জগতের লুণ্ঠনকারী: আর রেমব্রান্ট অক্লান্তভাবে নিরীক্ষণ করেছেন শুধু মানুষের মুখ, দর্পণে তাঁর নিজের মুখ, নানা বেশে, নানা ভঙ্গিতে, নানা ভাবে আবিষ্ট তাঁর নিজের মুখ মানুষের দেহের মধ্যে যা সবচেয়ে আধ্যাত্মিক সেই অংশটি তিনি বেছে নিয়েছিলেন, আর তারও মধ্যে সেই মুখের প্রতি তাঁর বিশেষ মনোযোগ, যা আমাদের প্রত্যেকের পক্ষেই নিজস্ব হ'লেও আসলে অচেনা। আমরা অবাক হই না যখন শুনি যে, ১৬৩৬ সালে হল্যাণ্ডে বেড়াতে এসে রুবেন্স সে-দেশের প্রত্যেক বিখ্যাত শিল্পীর সঙ্গে দেখা করেছিলেন; যান নি শুধু রেমব্রান্টের কাছে। শোনা যায়, টলস্টয়ের সঙ্গে ডস্টয়েভস্কির কখনো দেখা হয় নি, কিংবা দেখা হ'লেও যোগাযোগ ক্ষীণ ছিলো। টলস্টয় ও ডস্টয়েভস্কি, গোটে ও হোল্ডার্লিন, উগো ও বোদলেয়ার, টোমাস মান্ ও কাফকা— এইসব বিপরীত যুগল যেমন শিল্পীজীবনের দুই মেরুর প্রতিভূ, তেমনি

রুবেন্স ও রেমব্রাণ্ট। কিন্তু কী ভাগ্যে রেমব্রাণ্ট একজন ওলন্দাজ রুবেন্স হ'য়ে জন্মান নি, কী ভাগ্যে রুবেন্স যা-কিছু নন, রেমব্রাণ্ট ছিলেন অবিকল তা-ই।

আমি কি সাহস ক'রে বলবো যে রুবেন্স, রাফায়েল, হালস, ভেলাস্কেজ, টিৎসিয়ানো, বা এমনকি মিকেলাঞ্জেলো আমার মনে কখনো তেমন প্রবল আলোড়ন তোলেন নি? আমার রুচির পক্ষে রুবেন্স বড়ো বেশি ইন্দ্রিয়পরায়ণ, বড়ো বেশি বিলাসী। তাঁর স্থূলবপু খৃষ্টদের মুখে আমি কোনো দেবত্ব দেখতে পাই না; তাঁর স্থূলবপু মাংসল নারীদের অরুণবর্ণ ত্বক— যার আভা সারা পটে ছড়িয়ে পড়ে— তাঁর শ্মশ্রুধারী, পেশীবহুল দৃপ্তকাম বীরবৃন্দ, তাঁর ফেনোচ্ছল ভোগস্পৃহা— এ-সব দেখে আমার চোখ ধাঁধিয়ে যায়, কিন্তু কোনো চিত্তশুদ্ধি ঘটে না। মিকেলাঞ্জেলোতে আমি দেখতে পাই এক অতিমানবিক ক্ষমতার প্রকাশ, কিন্তু আমার মনে তাঁর কোনো বার্তা পৌঁছয় না; আর রাফায়েলের কেন যে এত খ্যাতি তা আমি আজ পর্যন্ত বুঝতে পারি নি। আধুনিক যুগের পূর্ববর্তী য়োরোপীয় শিল্পীদের মধ্যে আমার পক্ষে যাঁরা মর্মস্পর্শী, তাঁদের মধ্যে আছেন দা ভিঞ্চি, এল গ্রেকো, ড্যুরের, গোইয়া— আর হয়তো বা সবার উপরে রেমব্রাণ্ট।

রাইক্সম্যুজিয়মের কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে ঘুরছি— রেমব্রাণ্টকে অনুসরণ ক'রে। তাঁর বিভিন্ন পর্যায়ের নমুনা ঝুলছে দেয়ালে-দেয়ালে। ভূদৃশ্য, বাইবেল-চিত্র, সাস্কিয়া, হেনাড্রিকিয়ে ও টিটুসের প্রতিকৃতি, বিখ্যাত 'বস্ত্র-ব্যবসায়ীর সংসদ': শেষোক্ত চিত্রটিকে ভালোবাসতে পারলুম না আমি, কিন্তু টিটুসের একটি প্রতিকৃতি আমাকে মুগ্ধ করলো। রেমব্রাণ্ট ছিলেন ব্যক্তিগত জীবনে রমণীপ্রেমিক, কিন্তু নারীচিত্র অল্পই এঁকেছিলেন, এবং তাঁর সাস্কিয়ার নগ্নচিত্রেও ইন্দ্রলোকের উদ্ভাস নেই; উর্বশীরা তাঁর জগৎ থেকে নির্বাসিত। কিন্তু কোনো-এক মুহূর্তে তাঁর তুলি থেকে ক্ষরিত হয়েছিলো কৈশোরের মনোহরণ কান্তি, এই কঠিন ও সাত্ত্বিক প্রকৃতির পুরুষের পক্ষে আশ্চর্য কোমল তাঁর পুত্রের এই প্রতিকৃতি। কিন্তু যে-সব ছবিতে অমোঘ ও গভীরতম রেমব্রাণ্টকে আমরা খুঁজে পাই— হয়তো না-বললেও চলে, তা তাঁর আত্মপ্রতিকৃতির পর্যায়।

আটাশ বছর বয়সে রেমব্রাণ্ট তাঁর নিজের ও সাস্কিয়ার একটি যৌথ প্রতিকৃতি এঁকেছিলেন— পুস্তকে দেখা সেই ছবিটি আমার মনে পড়ছে। তাঁর সাংসারিক সৌভাগ্যের দিন বিধৃত আছে সেই চিত্রে— তাঁর এক হাত স্ত্রীর কটিতে ন্যস্ত, অন্য হাতে উঁচু ক'রে ধরেছেন সুরাপাত্র: ফ্যাশনদুরস্ত তাঁর পোশাক, গোঁফ সুচারু, মুখ হর্ষোৎফুল্ল, চোখ ঈষৎ মদির। এই সুখী রেমব্রাণ্টকেই আবার আমরা দেখতে পেয়েছি ক্রুদ্ধ স্যামসনের ছদ্মবেশে, সমকালীন অন্য একটি আত্ম-প্রতিকৃতিতে। কিন্তু সারা জীবন সুখভোগ করা তাঁর ভাগ্যে ছিলো না, অন্য এক মহত্তর নিয়তির জন্য তিনি চিহ্নিত ছিলেন। এবং সুখী রেমব্রাণ্ট, যুবক রেমব্রাণ্ট— এ-সব কেমন অশোভন মনে হয় আমাদের, প্রায় আস্থার অযোগ্য, যে-রূপে তিনি আমাদের মনে সংশ্লিষ্ট হ'য়ে আছেন তা এক প্রৌঢ়ের, অকালবৃদ্ধের, দুঃখভোগীর। তার বয়স বাড়ছে, অবস্থার

পতন হচ্ছে, শোকের পর শোক পাচ্ছেন, নিঃসঙ্গ থেকে নিঃসঙ্গতর হচ্ছেন কাল-ক্রমে, ক্রমশ নিজের মধ্যে আরো বেশি সংবৃত ও সংহত, মগ্ন হচ্ছেন তাঁর নিভৃত ধ্যানে— এইসব কথাই আমাদের জানিয়ে দেয় তাঁর উত্তরজীবনের পরম্পর আত্ম-প্রতিকৃতি। নারী, সুরা, সুখ— সব অবলুপ্ত ; ত্বক জীর্ণ ও শিথিল, ললাট কুঞ্চিত, ছায়াচ্ছন্ন বিস্রস্ত বেশবাস, বেদনাবিদ্ধ মুখ, অন্তর্বীক্ষণে দীর্ণ, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, মাঝে-মাঝে ব্যঙ্গচ্ছুরিত, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ক্ষমাশীল। আমরা লক্ষ করি, তাঁর উত্তরপর্যায়ে আত্ম-প্রতিকৃতির সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে— যেন উন্মাদের মতো, বোদলেয়ারীয় ড্যাণ্ডি'র মতো, তৃপ্তিহীনভাবে অবলোকন করছেন নিজেকে, সেই আত্মসমীক্ষাই যেন দুর্ভাগ্যের বিরুদ্ধে তাঁর উত্তর বিজয়ঘোষণা। রেনেসাঁস-পরবর্তী শিল্পীদের মধ্যে রেমব্রাণ্টই সবচেয়ে অনুচ্চার— তিনি কোনো ডায়েরি অথবা নোটবই লেখেন নি, তাঁর চিঠিপত্র উল্লেখের অযোগ্য, তাঁর কোনো সংলাপ বা বচনও লিপিবদ্ধ হয় নি, তিনি কোনো দুঃখের আঘাতে বিলাপ যদি বা ক'রে থাকেন তা অন্য কেউ জানে না— কিন্তু এই মৌন ও নিভৃত মানুষের আত্মজীবনী আমরা প'ড়ে নিতে পারছি তাঁর এই চিত্রপর্যায়েই। শুধু আত্মপ্রতিকৃতি নয়— অন্যান্য ছবিতেও মাঝে-মাঝে তাঁকেই আমরা দেখতে পাই— কখনো তিনি আবসালম, কখনো বা তরুণ য়োসেফ, কখনো তিনি কুশকাষ্ঠ থেকে যীশুকে নামাচ্ছেন— কত বিভিন্নভাবেই নিজেকে তিনি অন্বেষণ ও আবিষ্কার করেছেন! এবং যে-সব ছবি আত্ম-প্রতিকৃতি ব'লেই উল্লিখিত সেখানেও তাঁর বেশবাস বিচিত্র, বৈদেশিক, কখনো বা অদ্ভুত, যেন অভিনেতার মতো বিভিন্ন ভূমিকায় নামছেন : কিন্তু এর কারণ নয় কোনো নার্সিসীয় সপ্রীতি, কেননা আসলে তাঁর কৌতূহল সর্বমানবের বিষয়ে। নিজের মুখের দিকে অফুরন্ত বার তাকিয়ে অফুরন্ত বার নতুন মানুষ, অন্য মানুষ আবিষ্কার করেছেন তিনি, তাই এই বেশবাসের বৈচিত্র্য ও বৈদেশিকতা : — আমরা দেখতে পাই যে তিনি শুধু নিজের ইতিহাসই ব'লে যান নি, আমাদের সকলেরই গোপন বেদনা উদঘাটন ক'রে গেছেন। তাই তাঁর সঙ্গে সংলাপ চলে আমাদের, তাঁর কিছু বলার আছে আমাদের জন্য, আমাদের হৃদয়ের ঘুম ভাঙাতে জানেন তিনি। তাঁর ছবি দেখে আমাদের ইন্দ্রিয় পরিশীলিত হয় না, জগৎ বিষয়ে নতুন কোনো তথ্যও পাই না তাতে, কিন্তু নিজেকেই নতুনভাবে— হয়তো আরো একটু তীব্রভাবে— আবিষ্কার করি।

বিখ্যাত শিল্পীদের মধ্যে রেমব্রাণ্ট বোধহয় একমাত্র, যিনি কখনো সুন্দরের বেসাতি করেন নি। নিজে তিনি সুপুরুষ ছিলেন না ; তা গোপন করার তিলতম প্রয়াস নেই তাঁর চিত্রে— বরং কোনো-কোনোটিতে তাঁর অনভিজাত মুখাবয়ব ও বার্ধক্যকে যেন বাস্তবের চেয়েও বেশি ক'রে দেখানো হয়েছে। তাঁর সাস্কিয়া বা হেনড্রিকিয়ে আমাদের নয়ন হরণ করে না ;—স্নানরতা সুজানা বা বাথশিবা বা এমনকি তাঁর মাতা মেরীরাও সুন্দরী নন ; তাঁর যীশুভক্তেরা সামান্য ও দরিদ্র মানুষ ; তাঁর হোমর অথবা আরিস্টটলের মুখাবয়বে ক্লাসিকাল সৌষ্ঠব নেই, তাতে বরং কিছুটা ইহুদিভাব

ধরা পড়ে। তিনি ভালোবাসতেন ইহুদিদের ছবি আঁকতে, দীন, বৃদ্ধ, চিন্তাকুল সেই সব মুখ আমাদের দিকে যে-অব্যক্ত আর্তি নিয়ে তাকিয়ে থাকে, তার অর্থ হয়তো আমরা খুঁজে পাই তাঁর কোনো-কোনো আত্মপ্রতিকৃতির মুখোমুখি হ'লে। আমি ভাবছি সেইসব চিত্রের কথা, যাতে তাঁকে দেখা যায় বার্ধক্যে ও বেদনায় বিধ্বস্ত, যাতে জরাজনিত রেখাগুলি স্থূল ও নিষ্ঠুর, লালিত্য নিঃশেষে ঝ'রে গেছে, সারা মুখ ভাবনার প্রভাবে চিন্ময়। রেমব্রাণ্টকে বলা যায় বিশেষভাবে প্রৌঢ় ও নাস্তিমানের কবি, আত্মিক সৌন্দর্যের, পার্থিব বঞ্চনার। তাঁর সমকালীন চিত্রধারা থেকে এ-বিষয়ে তিনি আশ্চর্যরকম পৃথক।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা উল্লেখযোগ্য। হল্যাণ্ডের তৎকালীন ঐশ্বর্যের চিহ্নমাত্র নেই তাঁর রচনাবলিতে: তাঁর ছবি দেখে এমন সন্দেহ হয় না যে তাঁরই জীবৎকালে হল্যাণ্ড হ'য়ে উঠছিলো পৃথিবীর সবচেয়ে সমৃদ্ধ একটি দেশ, স্পেনের আধিপত্য থেকে মুক্ত হ'য়ে বাণিজ্য বিস্তার করেছিলো পূর্ব-এশিয়ার দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত, ঘরে-ঘরে ঝংকৃত হচ্ছিলো স্বর্ণমুদ্রা, ধনে-মানে প্রধান হ'য়ে উঠছিলো বণিকবৃন্দ। সতেরো শতকের ওলন্দাজ বণিকেরা কী-রকম প্রাচুর্যে ও আরামে দিনযাপন করতেন, কী-রকম সুচারু ছিলো তাঁদের গৃহসজ্জা, কী-রকম পরিপুষ্ট ও সালংকার ছিলেন তাঁদের স্ত্রীরা ও দাসীরা— তা জানতে হ'লে ভেরমের আমাদের শ্রেষ্ঠ প্রদর্শক। এই রাইক্সম্যুজিয়মেই দেখছি ওলন্দাজি শিল্পের অন্য এক ধারা: পৃথিবীর ভোগ্য-বস্তুর হরিলুঠ প'ড়ে গেছে যেন ;— গৃহস্বামী শিকার থেকে ফিরলেন ; ঘরের মধ্যে আসবাবের ভিড়, পোষা কুকুর, পোষা ময়না, দেয়ালে ছবি, টেবিলে মাছ মাংস সব্জি পনির ফলমূলের স্তূপ, বোতলে সুরা, শিকার-করা মৃত পাখিরা মেঝেতে প'ড়ে আছে, এক কোণে কোনো অর্ধাবৃত স্তন এবং সুগোল বাহু নিয়ে আলিঙ্গন করছে প্রণয়ীকে, গৃহস্বামিনী সারা মুখে অভ্যর্থনা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, দরজার বাইরে ঘোড়া, কিছু দূরে কানন, কাননের উপরে আকাশ ;—জীবিত ও মৃত, রচিত ও প্রাকৃত, নিসর্গ ও গার্হস্থ্য জীবন, যুগপৎ সব উপস্থিত। এই রকম ছবি পর-পর কয়েকটি দেখার পরে যাবতীয় সম্ভোগে কেমন বিতৃষ্ণা জন্মে, মানুষকে মনে হয় নিতান্তই ইন্দ্রিয়ের মধ্যে আবদ্ধ জীব। তখন মুক্তির আস্বাদের জন্য আবার রেমব্রাণ্টের কাছে ফিরতে হয়।

চরিত্রসৃষ্টিতে তিনি প্রতিভাবান ব'লে, রেমব্রাণ্টের সঙ্গে শেক্সপীয়রের তুলনা অনেকেই ক'রে থাকেন। কিন্তু শেক্সপীয়রের সর্বমুখিতা তাঁর ছিলো না: তাঁর কল্পনার অতীত ছিলো ক্লিওপ্যাট্রা বা ফলস্টাফ, প্রস্পারো বা লেডি ম্যাকবেথ। য়ান সিক্স-এর প্রতিকৃতি সত্ত্বেও, বস্ত্র-ব্যবসায়ীদের সুনিপুণ চিত্রণ সত্ত্বেও, রেমব্রাণ্ট সর্বোপরি আর্তির কবি, তাঁকে বলা যায় য়োরোপীয় চিত্রকলার বিষাদের আবিষ্কারক, প্রধানত দুঃখের পথ ধ'রেই মানবাত্মার সন্ধান পেয়েছেন তিনি। আমরা অধিকাংশ মানুষই ট্র্যাজিক নই— সক্রিয়ভাবে, প্রায় সচেতনভাবে, সর্বনাশের দিকে ধাবিত হই না: একটি সামাজিক প্রচ্ছদ বজায় রেখে শুধু মনে-মনে দুঃখ ভোগ করি। কিন্তু

কোনো-কোনো নির্জন মুহূর্তে সেই প্রচ্ছদ খ'সে পড়ে, আমাদের মুখমণ্ডলে গাঢ় হয় রেখা, দৃষ্টি যেন কুয়াশায় ডুবে যায় ;— যেমন ঘুমন্ত অবস্থায়, তেমনি এইসব মুহূর্তে, অত্যন্ত পরিচিতকেও হঠাৎ দেখলে হয়তো অচেনা মনে হয় ! সেই অন্তরতম মানুষের দ্রষ্টা হলেন রেমব্রাণ্ট— যে-মানুষ বীর নয়, সন্ত নয়, লিয়র অথবা কর্ডেলিয়া নয়, যে-মানুষ সংঘাতের বাইরে, সংগ্রামের বাইরে একান্ত তার নিজের মধ্যে আবিষ্ট, পরবর্তী কালে রিলকের কবিতায় মাঝে-মাঝে আমরা যার দেখা পেয়েছি। মানুষের মৌল নিঃসঙ্গতাকে এমন ভাস্বর ক'রে তুলতে পারেন নি আর কোনো চিত্রশিল্পী— সেই যে তাঁর পট-জোড়া অন্ধকারের মধ্যে অল্প একটু সংহত ও তীব্র উদ্ভাস তা যেন আমাদের আত্মিক জীবনের আলেখ্য। যাকে আমরা সৌন্দর্য বলি, নৈতিক অর্থে ভালো মন্দ বলি, যে-সব সামাজিক চিহ্ন ধারণ ক'রে আমরা দৈনন্দিন জীবন কাটাই— তাঁর শিল্পের পক্ষে তা সবই অবান্তর : কিন্তু যা আমাদের সত্তার অন্তঃসার গোপন, নামহীন প্রচ্ছন্ন— হঠাৎ কখনো যার দেখা পেলে আমরা চমকে উঠি— রেমব্রাণ্ট আমাদের সেই অংশকে উন্মোচন করেছেন, আর সেই সঙ্গে তাঁর নিজের বেদনাকে রূপান্তরিত করেছেন অমৃতে।

আর কী প্রমাণ আছে ? ভগবান, এই তো পরম,
এ-ই তো নির্ভুল সাক্ষ্য আমাদের দীপ্ত মহিমায়
এই যে আকুল অশ্রু যুগে-যুগে করে পরিশ্রম
অবশেষে লীন হ'তে অসীমের সৈকতে তোমার !

'দেশান্তর'

ঐশ্বর্যের দারিদ্র্য : দারিদ্র্যের ঐশ্বর্য

'গ্যেটের ছিলো ঐশ্বর্যের দারিদ্র্য, আর হ্যোল্ডার্লিন-এর— দারিদ্র্যের ঐশ্বর্য।'
—নর্বার্ট ফন হেলিনগ্রাথ

'আমাদের বান্ধবগণ বিনষ্ট হয়েছে, পাঞ্চালগণ উৎসন্ন, চেদি ও মৎস্যবংশ নিঃশেষ।' —এই ব'লে আক্ষেপ করেছিলেন যুধিষ্ঠির, ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী ও কুন্তীর সঙ্গে তাঁদের আরণ্যক আশ্রমে তাঁর সাক্ষাৎ হ'লো যখন (আশ্রম : ৩৬)। তাঁর যুদ্ধপরবর্তী নির্বেদ তাঁকে তখনও ছেড়ে যায় নি, বানপ্রস্থাবলম্বী প্রাচীনদের সান্নিধ্যে এসে তাঁর নতুন ক'রে অভিলাষ জেগেছে বৈরাগ্যে, মনে হচ্ছে তাঁর নিজের পক্ষেও অরণ্যবাস সবচেয়ে ভালো; তাঁর মুখে আমরা আরো একবার শুনলাম এই লোকশূন্য পৃথিবীর প্রতিপালনে তাঁর কিছুমাত্র উৎসাহ নেই। একটিমাত্র সান্ত্বনা তবু আছে তাঁর : বাসুদেবের কৃপায় বৃষ্ণিকুল এখনো আয়ুষ্মান, শুধু তাঁদেরই কথা ভেবে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যবাস সার্থক মনে হয়। প্রাচীন-প্রাচীনাদের নির্বন্ধাতিশয্যে, আর হয়তো কৃষ্ণের পুনর্দর্শন-কামনায়, যুধিষ্ঠির ফিরে এলেন হস্তিনাপুরে, ছ-মাস পরে কুরুপিতা ও মাতৃদ্বয়ের মৃত্যুসংবাদ পেলেন নারদের মুখে— তারপর মৌষলপর্ব। 'কৃষ্ণের কৃপায় বৃষ্ণিবংশ এখনো স্বস্থ—' ব্যঙ্গে ও বেদনায় মিশ্রিত হ'য়ে এই আশ্বাস-বাক্য এক নতুন অর্থে প্রতিভাত হ'লো।

গীতাকথনের মতোই, যদুবংশধ্বংসের ঘটনাটিও নাটকীয়ভাবে প্রবর্তিত হয়েছে। 'যুদ্ধের পরে ছাত্রিশ বছর কেটে গেলো, যুধিষ্ঠির নানা দুর্লক্ষণ দেখতে লাগলেন—' এই সংবাদটুকু জানিয়ে আরম্ভ হ'লো মৌষলপর্ব, আর তারপর— 'কিছুদিন পরে' —যুধিষ্ঠির শুনতে পেলেন যে 'বৃষ্ণিবংশ মুষলপ্রভাবে বিনষ্ট হয়েছে, বলরাম ও বাসুদেব উভয়েই "বিমুক্ত" — অর্থাৎ মৃত।' বিনা ভূমিকায় বলা হ'লো কথাটা; যেমন গীতাকথন শুরু হবার আগে সঞ্জয় স্বপ্নচালিতের মতো ব'লে উঠেছিলেন, 'মহারাজ, ভীষ্ম নিহত হয়েছেন!', তেমনি আকস্মিক ও অনলংকৃতভাবে— কিন্তু এখানে ধরনটা অত্যন্ত কেজো ও দ্রুত, যেন কারোরই হাতে আর বেশি সময় নেই, অবিলম্বে দু-একটা জরুরি খবর উক্ত এবং শ্রুত হওয়া দরকার। যুধিষ্ঠির 'শুনতে পেলেন'; কিন্তু কার মুখে কখন শুনলেন, বার্তাবহটি কে এবং কতদূর পর্যন্ত বিশ্বস্ত, অথবা কবে, কোন সময়ে, কেমন ক'রে ঘটলো এই ধ্বংস— এই সবই অনুল্লিখিত রইলো, যুধিষ্ঠিরও কোনো কৌতূহল প্রকাশ করলেন না; শুধু কঙ্কালসার তথ্যটুকু যেন হাওয়ায় ভেসে পৌঁছলো তাঁর কানে, এবং সেটুকুই যথেষ্ট, আর প্রয়োজন নেই।

'এখন উপায় ?' যুধিষ্ঠিরের এই প্রশ্ন যখন শূন্যে ঝুলে আছে, তাঁর ভাইয়েরা নির্বাক এবং হতবুদ্ধি, আমরা আশা করছি এর পরে কোনো আলোচনা, বা সমাধানের জন্য নারদ বা ব্যাসদেবের আবির্ভাব— ঠিক সেই মুহূর্তে দৃশ্য বদল হ'লো নৈমিষারণ্যে, আমরা শুনলাম সৌতির মুখে যদুকুলধ্বংসের বিবরণ। বলা বাহুল্য, এখানে আমাদের সহশ্রোতা যুধিষ্ঠির নন, তাঁকে অপেক্ষা করতে হ'লো যতক্ষণ না অর্জুন দ্বারকা থেকে ফিরে এলেন।

মৌষলপর্বের আরম্ভ যুধিষ্ঠিরকে দিয়ে, তার শেষ উক্তিটিও এই যে অর্জুন হস্তিনায় ফিরে যুধিষ্ঠিরকে 'যথাবৃত্ত' নিবেদন করলেন। কিন্তু এখানেও ঐ তথ্যটি শুধু জানানো হ'লো: অর্জুনের মুখের কথা উদ্ধৃত হ'লো না, শোনা গেলো না যুধিষ্ঠিরের কোনো প্রশ্ন বা খেদোক্তি বা বিস্ময়ধ্বনি — শতযোজনব্যাপী কথকতার পর এখানে এসে কবি ব্যয় করলেন ন্যূনতম শব্দ, অর্ধোচ্চারিত অবোক্তি। অর্জুন-কথিত ঐ বৃত্তান্ত— সত্যি তা 'যথাবৃত্ত' বা আনুপূর্বিক কিনা, বা তা হ'তে পারে কিনা, সে-বিষয়েও সন্দেহ জাগে আমাদের, কেননা অর্জুন যদুকুলক্ষয়ের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন না— তিনি চোখে দেখেছিলেন শুধু দ্বারকাপুরীর নিমজ্জন, আর বসুদেবের মুখে যা শুনেছিলেন তা একটি খণ্ডিত বিবরণ মাত্র। মনে রাখা দরকার, বসুদেব নিজেও শুধু সেটুকুই জানতেন যেটুকু কৃষ্ণ তাঁকে বলেছিলেন বা বলা দরকার ব'লে ভেবেছিলেন: তিনি ছিলেন তাঁর বার্ধক্যের বিশ্রাম-লালসা নিয়ে অন্তঃপুরে, যখন সমুদ্রতীরে তাঁর পুত্রগণ হত্যা করছে পরস্পরকে, যখন বলরামের সর্পরূপী প্রাণ বহির্গত হ'লো আর কৃষ্ণ যখন অরণ্যে মৃত্যুশয়ন পেতেছেন; তাঁর শ্রেষ্ঠ পুত্রদ্বয় যে মৃত, তাও বসুদেব জেনেছিলেন কিনা সন্দেহ[১]। সঞ্জয়ের মতো কোনো বরপ্রাপ্ত সংবাদজ্ঞাপক তাঁর কাছে ছিলো না, এবং অর্জুনের আগমন পর্যন্ত কষ্টেসৃষ্টে বেঁচে থাকার মতো প্রাণশক্তি শুধু অবশিষ্ট ছিলো তাঁর; অর্জুনের প্রতি তাঁর ভাষণে বিস্তার বা স্পষ্টতা নেই। মোটের উপর আমরা ধ'রে নিতে পারি যে যুধিষ্ঠির এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ তথ্য অবগত হ'তে পারেন নি; নিশ্চয়ই অর্জুনের বর্ণনা থেকে বহু অনুপুঙ্খ বাদ পড়েছিলো, কৃষ্ণ-বলরামের মৃত্যু ঠিক কী-ভাবে ঘটলো তাও খুব সম্ভব উল্লিখিত হয় নি। কিন্তু যুধিষ্ঠির যেন নিজের মনে সব বুঝে নিয়েছিলেন, সব ধারণা ক'রে নিতে পেরেছিলেন, যেন এর জন্য অনেক আগে থেকেই প্রস্তুত হ'য়ে ছিলেন তিনি। এবং, যা আমাদের পক্ষে আশাতীত, এই মর্মবিদারক বার্তাটি যে-মুহূর্তে তিনি শুনতে পেলেন তখন থেকেই এক অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটলো তাঁর মধ্যে।

এতদিন তিনি ছিলেন অত্যন্ত বেশি শোকপ্রবণ, অতি সহজে ক্রন্দনের বশবর্তী, এবং সন্তাপের বিরুদ্ধে এমন প্রতিরোধহীন যে ক্বচিৎ-দৃষ্ট ঘটোৎকচের মৃত্যুতেও তাঁর বেদনাবেগ উদ্বেল হ'য়ে উঠেছিলো (দ্রোণ : ১৮৪)। এবং ছিলেন— দুঃখের বিষয় বিশেষণসমূহের পুনরুক্তি না-ক'রে উপায় নেই এখানে— অতিমাত্রায় দ্বিধান্বিত ও অব্যবস্থিত, অতিমাত্রায় সাহায্যপ্রার্থী ও পরামর্শলিপ্সু। শান্তিপর্বের শুরুতে তাঁর

বিলাপ আমাদের যতই না শ্রদ্ধেয় ব'লে মনে হ'য়ে থাক, তাঁর রাজ্যাভিষেকের পর থেকে, শান্তিপর্ব ও সারা অনুশাসনপর্ব জুড়ে, তাঁকে ভীষ্মের কাছে দীনভাবে উপদিষ্ট হ'তে দেখে আমাদের মনে হয়েছিলো তিনি বুঝি চিরজীবন শুধু ছাত্র থেকে যাবেন, কখনো নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবেন না। তাঁর এই সব দুর্বলতার এত নিদর্শন আমরা এ-পর্যন্ত দেখে এসেছি যে এ-নিয়ে অধিক আলোচনার কোনো প্রয়োজন নেই। আর এখন কৃষ্ণের তিরোধান ঘটেছে, তাঁর চিরকালীন বন্ধু ও অপরিহার্য উপদেষ্টাকে আর কখনো চোখে দেখবেন না যুধিষ্ঠির, আঠারো-দিনব্যাপী মহাযুদ্ধে এমন একটি ক্ষতিও তাঁর হয় নি যা কোনো দিক থেকেই এর সঙ্গে তুলনীয় : আমরা ভেবেছিলাম এই আঘাতে তিনি একেবারে এলিয়ে পড়বেন, খ'সে যাবে তাঁর পায়ের তলা থেকে মাটি, জগৎসংসার শূন্য হ'য়ে যাবে। কিন্তু— আমরা সবিস্ময়ে লক্ষ করি— এ-মুহূর্তে তাঁর কণ্ঠে কোনো বিলাপ নেই, চক্ষুতে নেই লেশমাত্র সজলতা, মুখে নেই বেদনার কোনো চিহ্ন : মনে হয় তিনি এখন শোকাতিক্রান্ত ও আত্মসমাহিত ; মনে হয় এতদিনে, এতকাল পরে, তাঁর জীবনের সর্বশেষ সংকটের সময় তিনি অর্জন করলেন স্বাবলম্বিতা ও কর্তৃত্ব ; তাঁকে সান্ত্বনার জন্য ম্লান মুখে নানা জনের দিকে তাকাতে হয় না আর— সত্যি বলতে, তাঁর সান্ত্বনার প্রয়োজনও ফুরিয়ে গেছে। এখন তিনি নিজেই আদেশকর্তা, তাঁর অব্যবহিত কর্তব্য বিষয়ে মনস্থির করতে তাঁর মুহূর্তকাল দেরি হ'লো না ; তাঁর জীবনে এই প্রথমবার— কিংবা বলা যাক তাঁর সভাপর্বের দ্যূতোন্মাদনার পরে প্রথমবার— তিনি অন্য কারো পরামর্শ না-নিয়ে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিলেন। যেমন কৃষ্ণ ছিলেন আত্মীয়নিধনের সময়, তেমনি শান্ত এখন যুধিষ্ঠির, এবং তিনি যে-কর্মপন্থাটি বেছে নিলেন সেটি কর্মবিরতিরই নামান্তর— তাও কৃষ্ণেরই মতো।

'কালঃ পচতি ভূতানি সর্বাণ্যেব মহামতে। কালপাশমহং মন্যে ত্বমপি দ্রষ্টুমর্হসি ॥ (মহা : ১ : ৩)— সংস্কৃতের আশ্চর্য সংহতি বাংলাভাষার অগম্য[২] ; কালীপ্রসন্নর বাহুল্যগুলি ছেঁটে ফেলে হয়তো বলা যায় : 'কালই বিনষ্ট করে সর্বপ্রাণীকুল, আমিও সেই কালের কবলে পতিত হবো। অর্জুন, তুমি যথাকর্তব্য স্থির করো।' যুধিষ্ঠিরের এই কথাটি শোকার্ত মানুষের উচ্ছ্বাস নয়— এখানে একটি সুচিন্তিত স্থির সংকল্পের ঘোষণা শোনা গেলো ; পাঠকের নিশ্চয়ই মনে আছে যে কৃষ্ণও 'কালপর্যায়' লক্ষ্য ক'রে যাদবদের ব্যাভিচারে কোনো বাধা দেন নি। আমাদের কানে এখনো ধ্বনিত হচ্ছে ভীম-অর্জুনাদির রূঢ় প্রতিবাদ, শান্তিপর্বে যুধিষ্ঠির যখন সন্ন্যাসের পথে নিক্রান্ত হ'তে চেয়েছিলেন ; কিন্তু এ-মুহূর্তে কারো মুখ থেকে একটি বিরুদ্ধ বাক্য বেরোলো না, তাঁরাও যুধিষ্ঠিরের মতো প্রাণত্যাগের সংকল্প নিলেন। —কিন্তু ঘটনাটা সত্যি কি প্রাণত্যাগ, আক্ষরিক অর্থে মৃত্যু, না কি আসক্তিমোচন, বন্ধনছেদন, মুক্তিঅভিযান ? আমরা তা জানি না এখনো, কোথায় তাঁরা চলেছেন তা জানি না ; শুধু দেখছি যুধিষ্ঠিরের নেতৃত্বে তাঁরা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছেন— দ্রৌপদী ও চার ভাই, বিনা তর্কে ও নিঃশব্দে, যেন এই যাত্রা-

এমন অমোঘ যে এ-বিষয়ে কারোরই কিছু বলার নেই ; প্রজারাও কেউ মুখ ফুটে বলতে পারলো না, 'মহারাজ, ফিরে চলুন।' কিছুদূর পর্যন্ত তাঁদের সহযাত্রী হ'য়ে নাগরিকেরা একে-একে ফিরে এলো স্বগৃহে ; যেমন রামের বনযাত্রার সময়ে অযোধ্যায়, ও পাণ্ডবদের দ্যূত-পরবর্তী নির্বাসনের প্রাক্কালে হস্তিনাপুরে বিলাপধ্বনি তুলেছিলো জনগণ, পাণ্ডবদের এই শেষ বিদায়ের সময়ে সে-রকম কিছুই শোনা গেলো না ; বাতাস এখন অফেন ও অনার্দ্র, নম্রতম স্বর ও মৃদুতম ভঙ্গি ছাড়া আর-কিছুরই স্থান নেই, জড় জগৎ যেন তার আত্মিক নির্যাসে রূপান্তরিত হয়েছে। এবং সেই নির্ভার জগতে, অতি লঘু পা ফেলে-ফেলে নগরসীমা পেরিয়ে এগিয়ে চললেন পাঁচটি পুরুষ ও একটি নারী— এবং একটি কুকুর তাঁদের পিছন-পিছন চললো।

মহাভারতের অন্তিম পর্বগুলি আয়তনে ক্ষুদ্র*, কিন্তু ঘটনায় ও ইঙ্গিতে খুব ঘন ; তাদের পরতে-পরতে অনেক পূর্বস্মৃতি কাজ ক'রে যাচ্ছে : আমরা যা প্রায় ভুলে গিয়েছিলাম তা নতুন অর্থ নিয়ে আঘাত করছে আমাদের মনের উপর ; মানুষের সঙ্গে মানুষের এবং মানুষের সঙ্গে জগতের যে-সব সম্বন্ধ আমরা বুঝে নিয়েছি ব'লে ভেবেছিলাম, এখন দেখা যাচ্ছে তার মধ্যে আরো রহস্য লুকিয়ে ছিলো। এ-রকম একটি রহস্য হলেন আমাদের চিরচেনা অর্জুন : কেননা এই শেষ ধাপে এসে তাঁরও মধ্যে পরিবর্তন ঘটলো— যুধিষ্ঠিরের মতো ঊর্ধ্বতন নয়, বরং বলা যায়, পতন অথবা দরিদ্রীকরণ। যুধিষ্ঠির এমন-কিছু অর্জন করলেন যা পূর্বে তাঁর অধিকারভুক্ত ছিলো না, আর অর্জুন হারাতে-হারাতে চললেন যা-কিছু তাঁর জীবন-জোড়া সম্পদ ছিলো। দুই ভ্রাতার মধ্যে প্রতিতুলনার সূত্রটিকে ব্যাসদেব শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লুপ্ত হ'তে দেন নি ; তাঁদের মুখে বিভিন্ন সময়ে প্রায় একই কথা বসিয়ে সেটি আরো স্পষ্ট ক'রে তুলেছেন।

'কেশব, আমি স্থির থাকতে পারছি না, আমার মন ঘূর্ণিত হচ্ছে, আত্মীয়বধে কোনো শ্রেয়োলাভ আমি দেখতে পাচ্ছি না।' কার কথা এ-সব ? উত্তর দিতে কোনো পাঠকের দেরি হবে না, কেননা গীতার শ্লোকগুলি কাব্যের এমন উঁচু পর্দায় বাঁধা যে একবার শুনলেও ভুলে যাওয়া সহজ নয়। 'আমি চাই না জয়, চাই না রাজ্য, চাই না সুখ। জীবনধারণেই বা কী-প্রয়োজন আমাদের, কেননা যাঁদের জন্য রাজ্যসুখ আমাদের কাম্য, সেই আত্মীয়গণ স্বজনগণ ও আচার্যগণই প্রাণের আশা পরিত্যাগ ক'রে এখানে উপস্থিত। ...মধুসূদন, আমি কী ক'রে ভীষ্ম-দ্রোণকে অস্ত্রের দ্বারা আঘাত করবো ? এর চেয়ে ভিক্ষান্ন খেয়ে বেঁচে থাকলেও আমাদের মঙ্গল হবে। এই যুদ্ধে আমরা যদি জয়লাভ করি, অথবা এ'রা আমাদের পরাজিত করেন— এ-দুয়ের মধ্যে কোনটা শ্রেয় বুঝতে পারছি না। শত্রুহীন সমৃদ্ধ রাজ্য এবং এমনকি স্বর্গের আধিপত্য পেলেও আমার এই ইন্দ্রিয়শোক নিবারিত হবে কী ক'রে ?' (গী : ১ : ৩০-৩৪, ২ : ৪-৬, ৮)। —এমনি সব কথা বলেছিলেন অর্জুন, এক প্রবল উত্তাল আলোড়নের মুহূর্তে নিজের সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যেন ; আর

যুধিষ্ঠির, যিনি গীতা শোনেন নি, তাঁরও মুখ থেকে কোনো-এক সময়ে এই ভাষাই নিঃসৃত হয়েছিলো।

যুধিষ্ঠির-বিলাপের অংশটি ইতিপূর্বে উল্লিখিত ও আলোচিত হ'য়ে গেছে[৪], তবু তুলনার সুবিধের জন্য দু-একটি কথা আবার উদ্ধৃত করছি। 'এই যে আমরা জয়ী হলাম সেটাই আমাদের পরাজয়, আর জয়ী হ'লো তারাই, যারা পরাজিত।... আমরা আত্মঘাতী, কৌরবদের সংহার ক'রে নিজেরাই বিনষ্ট হয়েছি ; আমাদের জয়লাভ হয় নি, তারাও জয়ী হ'তে পারলো না। জ্ঞাতিবর্গকে নিঃশেষ ক'রে বান্ধবহীন অবস্থায় ত্রিলোকের কর্তৃত্ব পেলেই বা কী-লাভ হবে আমাদের ? চলো, অর্জুন, চলো আমরা ভিক্ষার জন্য পর্যটন করি।' —কথাগুলো এক, কিন্তু দুই ভ্রাতার অবস্থার মধ্যে তফাৎটা খুব স্পষ্ট। ভীষ্মপর্বে অর্জুনবিষাদের কারণ ছিলো তাঁর কল্পনা— তখন পর্যন্ত একটিও বাণ নিক্ষিপ্ত হয় নি : যেমন কোনো সংকটের সময় আমরা ক্ষুদ্রজনেরা বিহ্বল হ'য়ে পড়ি আতঙ্কে, হারিয়ে ফেলি দুর্ভাগ্যের সঙ্গে সংগ্রাম করার শক্তি, উপস্থিত কর্তব্য ভুলে সংকট আরো কঠিন ক'রে তুলি, অর্জুনের যুদ্ধবিমুখতাকেও তেমনি মনে হয় স্নায়বিক বৈকল্য শুধু— বীরোচিত নয়, তাঁর পক্ষে বস্তুতই ধর্মভ্রংশ, অপস্মার। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের উক্তির পিছনে বিস্তীর্ণ হ'য়ে আছে কুরুক্ষেত্র ; তাঁর যুদ্ধ-পরবর্তী শোচনায় তিনি প্রত্যাবৃত হলেন তাঁর স্বভাবে, যাকে তিনি উদ্যোগ থেকে শল্যপর্ব পর্যন্ত নিপীড়ন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এবং শুধু কৃতকর্মের জন্য শোচনাই নয়— যেহেতু অনেক হত্যা ও অনেক মৃত্যু তিনি পেরিয়ে এসেছেন, তাই তাঁর দুঃখের তলায় লুকোনো আছে দুটি-একটি উপলব্ধিও, যা তিনি চান তাঁর নিজের জীবনে প্রয়োগ করতে, যদিও যথাযোগ্য অবকাশ তাঁকে দেয়া হচ্ছে না এখনো : এখনো অনেক প্রহরী তাঁকে ঘিরে আছে। কিন্তু তবু, অর্জুন যেমন কৃষ্ণের কথা শুনে শোকমুক্ত হয়েছিলেন (এবং অবিলম্বে ভুলেও গিয়েছিলেন সেই কথাগুলো), সে-রকম কোনো চিকিৎসা বা বিস্মৃতি থেকে বঞ্চিত রইলেন যুধিষ্ঠির : তাঁর শোক চললো তাঁর সঙ্গে-সঙ্গে— ভীষ্মের সব উপদেশের মধ্য দিয়ে ব'য়ে যেতে লাগলো অস্পষ্ট-শ্রুত দীর্ঘশ্বাসের মতো, ঝরা পাতার নিস্বন তুলে ছড়িয়ে পড়লো যজ্ঞের প্রাঙ্গণে; এক গর্তবাসী বেজির বিদ্রূপে আমরা যুধিষ্ঠিরের মনের কথারই প্রতিধ্বনি শুনলাম। 'প্রয়োজন নেই— আর প্রয়োজন নেই।' স্পন্দিত হ'লো বাতাসে এই অব্যক্ত নির্দেশ, এই প্রত্যাহরণের ঘোষণা। তা শুনতে পেয়েছিলেন যুধিষ্ঠির, বহুদিন ধ'রে মনে-মনে শুনছিলেন : সেই কারণেই রাজ্যভার আরো দুর্বহ হ'য়ে উঠেছিলো তাঁর পক্ষে ; সেই কারণেই তাঁর চিরপ্রিয় গার্হস্থ্য থেকে তিনি চ্যুত হয়েছিলেন। কিন্তু অর্জুন তা শুনতে পান নি, শুনে থাকলেও বুঝতে পারেন নি, কখনো বুঝে থাকলেও মনে রাখতে পারেন নি ; অনুগীতা-কথনের আগে কৃষ্ণ যে তাঁকে 'শ্রদ্ধাহীন ও নির্বোধ' বলেছিলেন (আশ্ব : ১৬), সেই তিরস্কার অর্জুনের প্রাপ্য ছিলো বলা যায়। আমরা লক্ষ করি, শল্যপর্বের পর থেকেই কৃষ্ণের ব্যক্তিত্ব যেমন খণ্ডিত, তেমনি অর্জুনের ভূমিকাও

সংকুচিত হ'য়ে আসছে, আর যুধিষ্ঠিরের সত্তার ঘটছে সম্প্রসারণ ; কোনো-এক অন্ধকার অর্জুনকে ঘিরে ফেলছে মনে হয়, এদিকে যুধিষ্ঠির এক নিষ্কম্প্র অন্তর্নিঃসৃত প্রভায় উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হ'য়ে উঠছেন, কোনো সংশয়, কোনো বিক্ষোভ আর নেই তাঁর : যাকে এতদিন আমরা তাঁর দুর্বলতা ব'লে জেনেছি, এখন দেখছি তাঁর সেই চৈতন্যেই তিনি বলীয়ান ; আমরা বুঝে নিলাম মহাভারতের অন্তিম মুহূর্তটিকে সহ্য করার মতো ক্ষমতা যুধিষ্ঠির ছাড়া আর কারোরই ছিলো না।

এমন নয় যে অর্জুনের মনে কখনোই কোনো আলোকবিন্দু জ্ব'লে ওঠে নি। আশ্বমেধিক পর্বে চর্বিতচর্বণ অনুগীতা শোনার পরে অর্জুন বলছেন (অ : ৫২) : 'হে মধুসূদন ! তুমিই এই পৃথিবী ও স্বর্গ ও অন্তরীক্ষ : ···তোমার প্রাণই সতত-গতিশীল বাতাস, তোমার প্রসাদই নিত্যশ্রী, তোমার ক্রোধই সনাতন মৃত্যু। ··হে জনার্দন ! আমার জয় তোমারই কীর্তি, তোমার বুদ্ধি ও বিক্রমেই কর্ণ দুর্যোধন ভূরিশ্রবা ও জয়দ্রথ নিহত হয়েছিলেন।' —[illegible] কাব্যরীতিতে রচিত এই অংশটি কেমন গতানুগতিক শোনাচ্ছে, মনে হয় যেন অর্জুনের মুখে এই কৃষ্ণ-স্তবটি বসিয়ে দেয়া হয়েছিলো এটা তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত উচ্চারণ নয় . কিন্তু মৌষলপর্বের অষ্টম ও শেষ অধ্যায়ে, ব্যর্থতার দুর্বিষহ ভারে অবনত এক অর্জুন ব্যাসদেবকে যে-ক'টি কথা বলেছিলেন, তাতে বোঝা গিয়েছিলো তার জীবনবৃত্তকে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন মুখোমুখি— অন্তত সেই মুহূর্তে ক্ষণিকের জন্য। হায় সেই 'কৃতকার্যতা', যা দুর্যোধনবধের পরে কৃষ্ণের দ্বারা ঘোষিত হয়েছিলো— কী সুতীক্ষ্ণভাবে শোচনীয় তার শেষ পরিণাম ! 'দস্যুরা[a] হরণ ক'রে নিলো নারীদের, আমি গাণ্ডীবে শর-যোজনা করতে পারলাম না, আমার অক্ষয় তূণ নিঃশেষিত হ'লো। যে-পীতবসন দ্যুতিমান পুরুষ আমার রথের আগে ছুটে-ছুটে শত্রুসৈন্যকে দগ্ধ করতেন, আমি আর তাঁকে দেখতে পেলাম না। তিনিই বিনষ্ট করতেন তাদের, আমি শুধু (মৃতের উপরে) শরক্ষেপ করতাম। তাঁর অদর্শনে আমি এখন অবসন্ন, আমার সব দিক শূন্য হ'য়ে গেছে, আমার হৃদয়ে আর শান্তি নেই[b]।'— সেই যে একবার অর্জুন দেখেছিলেন ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ প্রভৃতি যোদ্ধাদের কৃষ্ণের ব্যাদিত মুখে প্রবিষ্ট হ'তে (গী : ১১), অকস্মাৎ কি সে-কথা তাঁর মনে প'ড়ে গিয়েছিলো ? কিন্তু তথ্য হিশেবে আমরা জানি যে কৃষ্ণ নিজের হাতে কুরুক্ষেত্রে কাউকে মারেন নি, তাঁর যন্ত্র বা 'নিমিত্ত'স্বরূপ ব্যবহার করেছিলেন অর্জুনকে, যেন স্মিতহাস্যে ও সকৌতুকে তাঁর বয়স্যকে তুলে ধরেছিলেন অন্য সব যোদ্ধার চাইতে অনেক উঁচুতে : এত সহজ ছিলো কৃষ্ণের এই দান, এত অজস্র ও অযাচিত ও সংশয়হীন যে অর্জুন এতদিন তা স্পষ্টভাবে অনুভব করতে পারেন নি ; আজ তাঁর চির-অভ্যস্ত জয় থেকে স্খলিত হওয়ামাত্র তাঁর মনে হ'লো তিনি নিজে কিছুই নন— কৃষ্ণই সব। এটাও তাঁর ক্ষণিকের অনুভূতিমাত্র, এবং এক নিস্ফল অনুভূতি : তাঁর মনে গ'ড়ে উঠলো না যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে তুলনীয় কোনো অভিনিবেশ ; কৃষ্ণের অপসরণে তিনি সন্তপ্ত হলেন, কিন্তু তার আসল অর্থটিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে ও বিনয়ের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারলেন না। দৃপ্ত তাঁর

স্বভাবসিদ্ধ, নতিস্বীকারে অভ্যস্ত হন নি কখনো, কোনো অর্ধকাঞ্চনময় নকুলের সংকেত তাঁর পক্ষে বোধগম্য নয় : ব্যাসদেবকে তাই স্পষ্ট ভাষায় ব'লে দিতে হ'লো যে তিনি, জগৎবিখ্যাত অর্জুন, তিনিও এখন নিঃশেষিত ও নিষ্প্রয়োজন।

অর্জুন বিষয়ে সব কথাই আগে বলা হ'য়ে গেছে। তিনি অসাধ্যসাধক, তিনি ক্ষাত্রিয়ের সর্বগুণে ভূষিত, কীর্তিকরীটধারী মনোমুগ্ধকর এক পুরুষ তিনি— তাঁর জীবনকাহিনীর সারাংশমাত্র জানলেও এই কথাগুলি মেনে নিতে কারো বাধবে না। শুধু একটি তথ্য অর্ধাচ্ছাদিত ছিলো এতদিন, তাঁরই শরজালের নিবিড়তায় আচ্ছন্ন ছিলো বলা যায় : আমরা তা চকিতে কখনো দেখতে পেয়ে থাকলেও তা নিয়ে চিন্তা করার অবকাশ পাই নি[৭] : সেটি এই যে তিনি কৃষ্ণের এক ক্রীড়নকমাত্র, কৃষ্ণের আত্মপ্রকাশের একটি উপলক্ষ শুধু ; —তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তিগুলির একটিও উপার্জিত নয়, উপহারপ্রাপ্ত ; তাঁর মুকুটের উজ্জ্বলতম সব রত্নই কৃষ্ণের দ্বারা সন্নিবিষ্ট হয়েছিলো। এই কথাটা তাত্ত্বিক দিক থেকে সমস্ত মানুষ বিষয়েই প্রয়োজ্য হ'তে পারে— অন্তত গীতায় তা-ই বলা হয়েছে[৮] : কিন্তু মহাভারতে আর-কোনো চরিত্র নেই যাকে নিয়ে কৃষ্ণ (বা কৃষ্ণ-নামাঙ্কিত ঈশ্বর) এমন ধারাবাহিক একটি খেলা খেলেছেন : ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ ভীম দুর্যোধনেরা তাঁদের সব ভালো-মন্দ নিয়ে তাঁদেরই স্বপ্রকাশ ব্যক্তিত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। বিষয়টিকে আরো একটু অনুধাবন করলে আমরা এই অদ্ভুত বৈপরীত্যের মুখোমুখি এসে দাঁড়াই যে বীর অর্জুনই সবচেয়ে কম স্বাবলম্বী এবং সবচেয়ে বেশি পরমুখাপেক্ষী ; তাঁর তুলনায় 'ভীরু দুর্বল' যুধিষ্ঠিরকেই স্বনির্ভর ব'লে আমাদের মনে হচ্ছে এখন— কেননা মহাপ্রস্থানিক পর্বে, ভীষ্ম বিদুর কৃষ্ণ যখন অন্তর্হিত, চঞ্চলরসনা হিতৈষিণী পাঞ্চালীও নির্বাক, তখন যুধিষ্ঠির একাই তাঁর সংকটের সমাধান করতে পারলেন, কোথাও কোনো সাহায্যকারী নেই বলে উদ্বিগ্ন হলেন না। কিন্তু— এই কথাটা এতক্ষণে বলার সময় হ'লো— এ-রকম কোনো বিশুদ্ধ স্বকীয় কর্ম অর্জুনের জীবনে একটিও নেই : সবই তাঁর জন্য ক'রে দেয়া হয়েছিলো, তাঁর বিঘ্নহীন পথ বহু যত্নে রচনা ক'রে দিয়েছিলেন অন্যেরা, তিনি শুধু পথের বাঁকে-বাঁকে জয়মাল্যগুলি গ্রহণ করেছিলেন।

ইতিপূর্বে কৃষ্ণের একটি উক্তি সংক্ষেপিত আকারে উদ্ধৃত করেছিলাম[৯], এবারে সম্পূর্ণ কথাটা পাঠকদের গোচরে আনতে চাই। কর্ণবধ বিষয়ে উপদেশ দিতে গিয়ে কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন (দ্রোণ : ১৮১) : 'আমি তোমারই মঙ্গলের জন্য জরাসন্ধ ও মহাত্মা শিশুপাল, মহাবাহু নিষাদ একলব্য, এবং হিড়িম্ব কির্মীর বক অলায়ুধ, ও উগ্রকর্মা ঘটোৎকচ প্রভৃতি রাক্ষসদের[১০] নানা উপায়ে বধ করেছি।' বাক্যটির মধ্যে অনেক কৌতুক বিচ্ছুরিত হচ্ছে : প্রথমত, উক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কৃষ্ণ স্বহস্তে নিধন করেছিলেন শুধু শিশুপালকে ; হিড়িম্ব কির্মীর বক অলায়ুধের মৃত্যুর সময় তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিতও ছিলেন না, একলব্যের মৃত্যুপ্রতিম অঙ্গুষ্ঠ-কর্তনের সময়ে তিনি মহাভারতীয় কাহিনীর মধ্যে প্রবেশ পর্যন্ত করেন নি। যে-সব কর্ম সাধন করলেন অন্যেরা, সেগুলি তিনি তাঁরই স্বকৃত ব'লে ঘোষণা করলেন— যেন

দ্রোণ ভীম অর্জুনেরা তাঁরই উদ্ভাবিত 'উপায়' ছাড়া আর-কিছু নন। আর তারপর : বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় জরাসন্ধ ও শিশুপাল, নিষাদরাজপুত্র একলব্য— যাঁদের বিষয়ে কৃষ্ণকে মনে হয় সশ্রদ্ধ— তাঁদের সঙ্গে রাক্ষসীপুত্র ঘটোৎকচ ও নগণ্য বক কির্মীর ইত্যাদি সকলকেই যে একই নিশ্বাসে যুক্ত করা হ'লো এর একমাত্র অর্থ আমরা এই করতে পারি যে পাণ্ডবদের যে-কোনো শত্রু এবং অর্জুনের যে-কোনো সম্ভবপর প্রতিদ্বন্দ্বী কৃষ্ণের মতে বধযোগ্য ; তাই তিনি, কৃষ্ণ-অর্জুনের হিতসাধনার্থে এই হত্যাকাণ্ডগুলিকে ঘটিয়ে তুলেছিলেন। যে-কোনো উপায়ে, যে-কোনো অন্যায় ও অবিচার দ্বারা অর্জুনকে বড়ো ক'রে তুলতে হবে, এ-রকম একটি পরিকল্পনা ত্রিলোকের মধ্যে ছড়িয়ে আছে ব'লে মনে হয়, কেননা শুধু কৃষ্ণ নন, পিতামহ ভীষ্ম ও আচার্য দ্রোণ, পাতালবাসিনী নাগরাজকন্যা উলূপী, গন্ধর্ব অঙ্গারপর্ণ ও চিত্রসেন, এবং স্বর্গের প্রধানতম দেবতারা— সকলেই বিশেষভাবে ও ব্যক্তিগতভাবে অর্জুনের পক্ষপাতী। অর্জুনের জয়যাত্রার পথে প্রথম বলি একলব্য (আদি : ১৩২) : সেই শ্যামলকান্তি নিষ্ঠাবান নিষাদ-বালক, আচার্যহীন মৌলিক প্রতিভায় ধনুর্বিদ্যায় দক্ষতা অর্জন ছাড়া অন্য কোনো অপরাধ যে করে নি, এবং সেই অপরাধেই দ্রোণ যাকে ক্ষাত্রিয়োচিত হৃদয়হীনতায় বিনষ্ট করলেন কিন্তু ব্রাহ্মণোচিত করুণার সঙ্গে শাপমুক্তির কোনো উপায় ব'লে দিলেন না। সেই অরণ্যে প'ড়ে রইলো একলব্য, লোষ্ট্রের মতো জড়ীভূত ও প্রতিবাদহীন, ধীরে-ধীরে পৃথিবীর ধুলোয় মিশে গেলো ; আমরা দ্বিতীয়বার তার বিষয়ে কিছু শুনলাম না। এবং আছেন অন্য একজন, একলব্যের চেয়ে অনেক বড়ো, যে-কোনো মুহূর্তে অর্জুনকে অতিক্রম করার যোগ্যতা নিয়ে যিনি জন্মেছিলেন— এবং যাঁকে তাঁর গর্ভধারিণী নিজের হাতে ঠেলে দিয়েছিলেন অপমান ও অবজ্ঞা ও পরাজয়ের পথে : কুন্তী— কুন্তী নিজে চক্রান্তকারীদের একজন, অর্জুনকে জিতিয়ে দেবার জন্য তিনিও তাঁর প্রথম-জাত মহৎ পুত্রকে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা দিয়েছিলেন। তিনি সূতপুত্র, তিনি অনভিজাত— এই অপবাদে অস্ত্রপরীক্ষার সভামণ্ডপ থেকে বিতাড়িত হলেন কর্ণ (আদি : ১৩৮-১৩৭) ; পাঞ্চালনগরে স্বয়ংবরসভায় দ্রৌপদী তাঁকে নিজের মুখে প্রত্যাখ্যান করলেন[১১] (আদি : ১৮৭) ; —তবু কুন্তী রইলেন নীরব ; নিজে কলঙ্ক থেকে গা বাঁচিয়ে পুত্রের মাথায় ঢেলে দিলেন গ্লানি লজ্জা অবমাননার পুঞ্জ। অর্জুনের সঙ্গে ঋজু প্রতিদ্বন্দ্বিতায় একবারও নামতে দেয়া হ'লো না কর্ণকে ; কর্ণের উপর অর্জুনের জয় নিশ্চিত ক'রে তোলার জন্য প্রাণ নিতে হ'লো সাক্ষাৎ বৃকোদরতনয় পাণ্ডবসহায় ঘটোৎকচের · কেননা সকলেরই মনের তলায় এই কথাটা লুকিয়ে আছে যে কর্ণের তুলনায় অর্জুন দুর্বলতর প্রতিপক্ষ ; এ-দু'জনের মধ্যে সরল যুদ্ধ ঘটলে অর্জুন রক্ষা পাবেন না। দেবতারা কত না অস্ত্র দান করলেন অর্জুনকে, এদিকে এক ছদ্মবেশী প্রতারক দেবতা হরণ ক'রে নিলেন কর্ণের সহজাত পিতৃদত্ত বর্ম ও যুগলকুণ্ডল— বিনিময়ে দক্ষিণ হস্তে যা দান করলেন তাও ফিরিয়ে নিলেন বাম হস্তে। উর্বশী-দত্ত অভিশাপ দ্বারাও উপকৃত হলেন অর্জুন— অজ্ঞাতবাসের বছরটিতে সেই নপুংসকত্বই তাঁর প্রচ্ছদের

কাজ করলো ; কিন্তু কর্ণের জীবনে পরশুরামের অভিশাপ হ'লো মারাত্মকভাবে ফলপ্রসূ[১২]। —কিন্তু কেন, কেন অর্জুনের প্রতি ত্রিলোকবাসীর এই পক্ষপাত ? তাঁর মধ্যে কোনো বিশেষ নৈতিক অথবা হার্দ্য গুণ কখনো লক্ষিত হয়েছে কি ? কিছুমাত্র নয়— বরং নারীত্বের মদিরায় ম'জে অতি সহজে তাঁর ব্রহ্মচর্য-পণ ভেঙে-ছিলেন তিনি, একলব্যের অঙ্গুষ্ঠকর্তনে বিবেকবোধহীন বালকের মতো হেসেছিলেন। দ্রোণ কথা দিয়েছিলেন অর্জুনের তুল্য কোনো যোদ্ধা থাকবে না – তার কি কোনো বিশেষ কারণ ছিলো ? কিছুই না— একমাত্র কারণ : দ্রোণ তাঁর সব শিষ্যের চেয়ে অর্জুনকে বেশি ভালোবাসতেন। যেমন দ্রোণ, ভীষ্মও তেমনি অকারণে অর্জুনের অনুরাগী : শরশয্যায় শুয়ে তিনি যে পানীয় জল প্রার্থনা করলেন (ভীষ্ম : ১২৩), সেটাও অর্জুনের টুপিতে একটা বাড়তি পালক গুঁজে দেবারই কৌশলমাত্র : সেই উপলক্ষে কুরুপিতামহ আরো একবার অর্জুনের প্রশংসা ও দুর্যোধনের নিন্দা করার সুযোগ পেলেন। ভীষ্ম কেন অন্তিম শয়নেও অর্জুনের ডঙ্কায় নিনাদ না-তুলে পারলেন না, এই প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই সত্যি বলতে ; এই প্রশ্ন তোলার অধিকারও বোধহয় নেই আমাদের। আমাদের মেনে নিতে হবে অর্জুন বিশ্বপ্রকৃতির আদুরে ছেলে, স্বভাবতই দেবগণের প্রিয়পাত্র ; তিনি সেই অতি বিরল মানুষদের একজন, যাঁকে ভাগ্যদেবীরা হাজার হাত উজোড় ক'রে দান করেন যা-কিছু মানুষের কাম্য হ'তে পারে। যেমন গ্যেটে সব-কিছু প্রাপ্ত হয়েছিলেন— শুধু প্রতিভা নয়, সেই সঙ্গে আরো অনেক-কিছু যা কবিদের ভাগ্যে সাধারণত জোটে না : স্বাস্থ্য, আয়ু, যশ, কান্তি, ও এমনকি বিত্তের প্রাচুর্য– পেয়েছিলেন সব দীনতা ও মালিন্যের ঊর্ধ্বে রাজার মতো জীবন, আর বহু নারী যাদের অন্তঃসার নিংড়ে নিয়ে তাঁর প্রেরণার অনলকে তিনি দীপ্ত রেখেছিলেন : যেমন তাঁর সম্ভবপর সব প্রতিদ্বন্দ্বীকে প্রকৃতি দেবী অপসৃত করেছিলেন একে-একে— শিলার-এর অকালমৃত্যু ঘটিয়ে, হ্যেল্ডার্লিন-কে যৌবনেই উন্মাদরোগে বন্দী ক'রে দিয়ে, হাইনেকে এক অকথ্য পীড়ায় শৃঙ্খলিত ক'রে— যাতে গ্যেটে হ'তে পারেন তাঁর চেয়ে ভালো কবিদের উপর বিজয়ী— তেমনি একটি আশ্চর্য রূপকথা অর্জুনের জীবনেও চিত্রিত হ'য়ে আছে। অথবা, আরো সংগতভাবে ও সার্থকভাবে এ-কথাও বলা যায় যে অর্জুন আমাদের ভারতীয় সাহিত্যের ফাউস্ট - দুঃখের বিষয় এক অচেতন ফাউস্ট . তিনি জ্ঞানত বিশ্বজয়ী হ'তে চান নি, বিজয়ী ভূমিকা আরোপিত হয়েছিলো তাঁর উপর— এবং তাঁর জীবনে যিনি মেফিস্টোফেলেস তিনিই গ্রীকদের ভাষায় তাঁর 'দাইমোন' বা অন্তঃপ্রতিভা, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় জীবন-দেবতা, এবং হিন্দুর ভাষায় সেই হৃদিস্থিত হৃষীকেশ, যাঁর হাত দিয়ে সব দেবতার সমস্ত দান অর্জুনের কাছে পৌঁচেছিলো। গ্যেটে তাঁর ফাউস্টের পরিত্রাণ ঘটিয়ে মানবাত্মাকে পাপ-পুণ্যের ঊর্ধ্বে মহিমান্বিত করেছিলেন, কিছুটা অযৌক্তিকভাবে ঈশ্বরকে জিতিয়ে দিয়েছিলেন শয়তানের উপর : কিন্তু হিন্দু দর্শনে শয়তানের যেহেতু স্থান নেই, তাই মহাভারতের ঈশ্বর-কৃষ্ণকেই মেফিস্টোর ভূমিকা নিতে হ'লো, হ'তে হ'লো নিজেই নিজের বিপরীত, একাধারে অর্জুন-ফাউস্টের

বিজয়সাধক ও সংহারকর্তা। টোমাস মান-এর একটি উপন্যাস[১৩] থেকে ইঙ্গিত নিয়ে, আমি ফাউস্ট-কাহিনীর এই অর্থ করি যে অসামান্য প্রতিভাও দণ্ডনীয়, মানবিক সীমান্তলঙ্ঘী অভীপ্সার জন্য কঠিন মূল্য না-দিয়ে কোনো উপায় নেই—আর অর্জুনের জীবনচরিতের মধ্য দিয়েও এই কথাটা স্পষ্টভাবে বেরিয়ে আসে। আমরা দেখে এসেছি কুরুক্ষেত্রে অর্জুনের প্রতিটি যুদ্ধের সম্পাদক ছিলেন কৃষ্ণ : কোন সময়ে কাকে আক্রমণ বা রক্ষা করতে হবে, কখন কোন অস্ত্রের ব্যবহার সমীচীন, কখন প্রতিদ্বন্দ্বীকে অন্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে নিজে স'রে পড়া ভালো, কী-উপায়ে মহাযোদ্ধারা বধ্য হ'তে পারেন— এইসব, প্রতিটি অনুপুঙ্খ, কৃষ্ণ ব'লে দিয়েছেন, অর্জুন শুধু আজ্ঞাপালন করেছেন ভৃত্যের মতো। কৃষ্ণ সারথি – ব্যাপকতম, সম্পূর্ণতম অর্থে তা-ই ; তিনিই পরিচালক ও অধিনায়ক— ধৃষ্টদ্যুম্ন নামত মাত্র পাণ্ডবপক্ষের সেনাপতি – পাণ্ডবের যুদ্ধ সাধারণভাবে কৃষ্ণেরই যুদ্ধ : কিন্তু কৃষ্ণ বেছে নিয়েছিলেন বিশেষভাবে অর্জুনকে যুদ্ধে বিশ্রামে কর্মে ও প্রমোদে তাঁর নিত্যসঙ্গী -- যদিও সেই সম্বন্ধটিকে যথোচিত মর্যাদা দিতে পারেন নি অর্জুন[১৪]। অনেকদিন আগে, এক অর্বুদ নারায়ণী সেনার বদলে তিনি গ্রহণ করেছিলেন সমর-পরাঙ্মুখ একক কৃষ্ণকে, এটাই অর্জুনের জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ সন্দেহ নেই ; কিন্তু এ ব্যাপারেও তিনি যে বৃত, বরণকারী নন, এই সহজ কথাটা তাঁর বোধগম্য হয় নি : রবীন্দ্রনাথের বালিকাবধূর মতোই বুদ্ধিহীন, তিনি যেন ধ'রে নিয়েছিলেন এই মধুর খেলাই চলবে চিরকাল। আর তাই, যখন দাম চুকিয়ে দেবার সময় হ'লো, যখন অর্জুনের মেফিস্টোফেলেস তাঁকে পতনের মুখে নিক্ষেপ ক'রে চ'লে গেলেন কিন্তু অন্য কোনো ঈশ্বর স্বর্গের দ্বার খুলে দিলেন না তাঁর জন্য, তখনও অর্জুন বুঝলেন না যে এই দারিদ্র্য তাঁর ঐশ্বর্যের মধ্যেই নিহিত ছিলো, এই নিঃস্বতা ঘটিয়ে কৃষ্ণ তাঁকে শেষশিক্ষা দিয়ে গেলেন। অভিনয়ের শেষে অভিনেতার মতো অর্জুন এখন নগ্নীকৃত হচ্ছেন— নেপথ্যে নয়, আমাদেরই চোখের সামনে ; খুলে নেয়া হচ্ছে তাঁর উজ্জ্বল বেশবাস ও শিরস্ত্রাণ ও রত্নাভরণ, রূপসজ্জার সব মোহন বর্ণ ধৌত হ'য়ে গিয়ে ফুটে উঠছে মরণশীলতায় রেখাঙ্কিত এক মুখমণ্ডল। কিন্তু তাঁকে নিয়ে 'চির-সারথি ভাগ্যবিধাতা'র এই নিষ্ঠুর বিদ্রূপ[১৫] অনেক আগেই শুরু হ'য়ে গিয়েছিলো, শল্যপর্বের সমাপ্তিকালেই আমরা তার প্রথম লক্ষণ দেখতে পেয়েছিলাম। সেই সূত্রটির সন্ধানের জন্য আমাদের পূর্বপরিচিত অন্য এক দেবতার কাছে ফিরে যাওয়া প্রয়োজন।

'মহাভারতের কথা'

টীকা ও উল্লেখপঞ্জি

রামায়ণ

১। 'কোথাও ভ্রমরকুল গুঞ্জন করছে, কোথাও ময়ূর নাচছে, কোথাও গজেন্দ্র প্রমত্ত হ'য়ে রয়েছে।' বসু-মহাশয়ের এই ভাবান্তর সাধারণ পাঠককে একটু বেশি খাতির করা হয়ে গেছে; বাংলা যথাসম্ভব সরল হয়েছে, কিন্তু মূলের জোরটুকু নেই। বনভূমি ভ্রমরকুল দ্বারা প্রগীত ময়ূরকুলদ্বারা প্রনৃত্ত এবং গজযূথদ্বারা প্রমত্ত— ভাষার এই বিশেষ ভঙ্গিতেই এর সরসতা। বিভক্তিহীন বাংলা ভাষায় এর যথাযথ অনুবাদ অবশ্য সম্ভব নয়, তবে কোনো বাঙালি কবিকে যদি কথাটা বলতে হ'তো তাহ'লে তিনি বোধহয় এইরকম কিছু বলতেন— কোথাও ভ্রমর তাকে গাওয়াচ্ছে, কোথাও ময়ূর তাকে নাচাচ্ছে, কোথাও তাকে পাগল ক'রে দিচ্ছে হাতির পাল।

২। শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী তাঁর সংক্ষেপিত ইংরেজি অনুবাদে সপ্তম কাণ্ডটি সম্পূর্ণ বাদ দিয়েছেন, কেননা তাঁর মতে সীতার দ্বিতীয় বর্জন কিছুতেই সহ্য করা যায় না!

৩। রামচন্দ্রের বিবিধ অন্যায়ের মধ্যে এই শম্বুকবধটাই আধুনিক দৃষ্টিতে সবচেয়ে অক্ষম্য। রবীন্দ্রনাথ একে প্রক্ষিপ্ত বলেছেন: কিন্তু রামায়ণকে কাব্য হিশেবে দেখি তাহ'লে বলতে হয় এর শিল্পগত প্রয়োজন ছিলো। রামচন্দ্রকে এতটা নিচে নামতে হয়েছিলো ব'লে তাঁর মানবিক স্বরূপ আমরা আরো বেশি উপলব্ধি করতে পারি।

বাংলা শিশুসাহিত্য

১। এই অনুবাদের দ্বারা উনিশ শতকেই আরম্ভ হয়েছিলো— আর তা শুধু নাবালক সাহিত্যেই নয়— বিদ্যাসাগরের 'কথামালা'র পাশে কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতও আমরা দেখতে পাই। পরবর্তীকালে অবনীন্দ্রনাথও অনেকাংশে অনুলেখক। এ-প্রসঙ্গে আরো স্মর্তব্য যে বাংলার 'স্বদেশী' যুগে দেশজ রত্ন উদ্ধার করার যে-আবেগ এসেছিলো, তা তথাকথিত শিশুসাহিত্যেই আবদ্ধ থাকে নি, যে প্রেরণায় যোগীন্দ্রনাথ ছড়া সংগ্রহ করছেন, উপেন্দ্রকিশোর লৌকিক গল্প আর দক্ষিণারঞ্জন রূপকথা সেই একই প্রেরণার মহার্ঘ ফল 'কথা ও কাহিনী'।

২। 'slithy' কথাটাই পিছল-পিছল শোনায়, আর 'mimsy' মানে যে তুচ্ছ কিছু, তা আর ব'লে দিতে হয় না। প্রথম কথাটি— একটু ভাবলে বোঝা যাবে— তৈরি হয়েছে 'lithe' আর 'slimy' মিশিয়ে, আর দ্বিতীয়টিকে মিশেছে 'flimsy'

আর 'miserable'। ইংরিজিতে এই প্রথম দেখা দিলো 'তোরঙ্গ-শব্দ' বা 'portmanteau word' যাকে পরিণতির চরম সোপানে নিয়ে গেলেন জেমস জয়স। বাংলাভাষায় 'womoon' বা 'hominous' এখনো সম্ভব হয় নি, কিন্তু 'গল্পসল্পে রবীন্দ্রনাথ খেলাচ্ছলে দু-একটি নমুনা বানিয়েছিলেন, যেমন 'হিদিক্কার' বা 'বুদবুধি'। এর প্রথমটিতে 'হৃদয়', 'হিক্কা', 'ধিক্কার' এই তিনটি শব্দেরই আভাস দেয়, আর দ্বিতীয়টিতে 'বুধ' আর 'বুদ্বুদ' মিশে পাণ্ডিত্যের প্রতি কটাক্ষ পড়েছে।

৩। 'অবস্থাগতিকে' কথাটা অনুধাবনযোগ্য। অ্যাডভেঞ্চারঘটিত গল্প জমাবার মতো উপকরণ বাঙালির জীবনে বেশি নেই; পুরো মাপে লিখতে গেলেই সম্ভাব্যতার সীমা ডিঙোবার আশঙ্কা ঘটে। হয়তো এই কারণেই প্রেমেন্দ্র মিত্র এইচ. জি. ওএলসের অনুগামী হ'তে পারেন নি, আর হেমেন্দ্রকুমারও স্টীভেনসনকে সাত হাত তফাতে রেখেছেন। জলে-স্থলে অন্তরীক্ষে অ্যাডভেঞ্চার নামক পদার্থটা পশ্চিমবাসীর জীবনের মধ্যে সত্য, তাই তার সাহিত্যেও সেটা জীবন্ত হ'য়ে দেখা দিয়েছে। আমাদের পক্ষে ও বস্তুটি এখনো অনেকটাই বানানো, অমূল কল্পনা বা ইচ্ছাপূরণ। এই একই কারণে, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের প্রশংসনীয় হুকা-কাশি সত্ত্বেও, বাংলা ভাষায় সত্যিকার গোয়েন্দা গল্প এখনো হ'তে পারলো না, শুধু তার বিকৃতি জ'মে উঠলো কিশোর-সাহিত্যের কুপথ্যশালায়!

৪। অন্নদাশঙ্করের ছড়া বা অজিত দত্তের 'নইলে' নামক উৎকৃষ্ট কৌতুকাবহ কবিতা— এ-সবের জাত আসলে হালকা কবিতার, ইংরেজিতে যাকে বলে লাইট ভার্স, সেখানে বিষয়টাতেই সাবালক মনের খোরাক থাকে।

৫। এখানে 'ভূতপত্রী'র নাম করলুম না এইজন্য যে এ-বইটির গড়ন কিছু নড়বড়ে, গল্প, গুজব পুরাণ, ইতিহাস, ভূগোল, আজগুবি, এই সমস্ত মিলে-মিশে 'বুড়ো আংলা'র মতো নতুন এবং অবিকল একটা পদার্থ হ'য়ে ওঠে নি, কোথাও-কোথাও অসংলগ্নতার দোষ ঘটেছে। (যেমন হারুন-বাদশার উপাখ্যানের সঙ্গে সাগর-তলের মাসিবাড়ির গল্পটিকে শুধু বাইরে থেকে জুড়ে দেখা হয়েছে, ভিতর থেকে ঘটকালি করা হয় নি।) অবশ্য এ-কথা বলার মানে এ-নয় যে বইটির অন্যবিধ মূল্য বিষয়ে আমি সচেতন নই!

৬। ব্যতিক্রমস্বরূপ উল্লেখ করবো 'শকুন্তলা'। 'শকুন্তলা'য় কালিদাসকেই কেটেছেঁটে পাৎলা ক'রে বলা হয়েছে, লেখক নিজের কিছু যোগ করেন নি, নতুন কোনো সৃষ্টি নেই এখানে, তাই এটি সীমিত অর্থেই শিশুপাঠ্য। পক্ষান্তরে, 'আপন কথা'কে ছোটোদের বই ব'লে ভাবতে রীতিমতো প্রয়াসের প্রয়োজন হয়; 'ছেলেবেলা'র মতো, এরও মূল্য বিষয়ে নয়, বিষয়ীতে, আর গদ্য ভাষার বিশেষ একটি প্রকরণকলায়। অবনীন্দ্রনাথের সবচেয়ে পাৎলা-হাওয়ার বই এই 'আপন কথা', পড়তে-পড়তে মাঝে-মাঝে ঈষৎ হাঁপ ধরে।

৭। অনেক সময় প্রেমের গল্পে লেখক নিজেই তাঁর নায়িকার প্রেমে পড়েন, কিন্তু— 'নষ্টনীড়' বাদ দিলে— 'গল্পগুচ্ছে' রবীন্দ্রনাথের মনের ভাবটি প্রেমিকের

নয়, পিতার ; তাঁর নায়িকাদের মধ্যে প্রিয়াকে ততটা দেখতে পাই না, যতটা কন্যাকে। বালক-বালিকার চরিত্র-কথা, 'সবুজ পত্র' যুগের আগে পর্যন্ত, এখানে কিছু অত্যধিক মাত্রাতেই দেখা যায় : 'দিদি', 'খাতা', 'আপদ', 'অতিথি' ; 'স্বর্ণমৃগে' বৈদ্যনাথের স্বহস্তে প্রস্তুত খেলার নৌকো, 'রাসমণির ছেলে'তে বাজনকারিণী মহার্ঘ মেমপুতুলের সুন্দর ঘটনাটি – সমস্ত মিলিয়ে এই গ্রন্থ যেন স্নেহরসে পরিপ্লুত হ'য়ে আছে। আর এই শিশুচিত্রাবলি— শুধু 'গল্পগুচ্ছে' নয়— সমগ্রভাবে বাংলা সাহিত্যেই লক্ষণীয় : 'রামের সুমতি', 'বিন্দুর ছেলে', শ্রীকান্ত ও দেবদাসের বাল্যপ্রণয়, তারপর 'পথের পাঁচালী' ; 'রাণুর প্রথম ভাগ' -- চারদিকে তাকিয়ে দেখলে ধরা পড়ে যে বাংলা কথা শিল্পের একটি বড় অংশ শৈশবঘটিত। হয়তো বাঙালির মনে স্বভাবতই বাৎসল্য বেশি ; অন্তত কোনো-কোনো লেখক সার্থক হয়েছেন – দ্বন্দ্বজটিল বয়স্ক জীবনের ক্ষেত্রে নয়, শৈশবের সরল পরিবেশেরই মধ্যে।

৮। 'আলোর ফুলকি', 'বুড়ো আংলা', এই দুটি গ্রন্থই বিদেশী গল্পের অবলম্বনে লেখা। মূল গ্রন্থ দুটি আমার পড়া নেই, ঘটনাবিন্যাসে অবনীন্দ্রনাথের নিজের অংশ কতখানি তা আমি বলতে পারবো না। কিন্তু ঘটনাগুলির ভিতর দিয়ে তাঁর যে-মন প্রকাশ পেয়েছে, এই আলোচনার পক্ষে তা-ই যথেষ্ট।

৯। এই 'তিনি'র আশ্চর্য ব্যবহার অবনীন্দ্রনাথে সর্বত্র পাওয়া যায় 'নালক'-এর একটি অংশ উল্লেখ করি। 'রাত ভোর হ'য়ে এসেছে, শিশিরে নুয়ে পদ্ম বলছে-- নমো, চাঁদ পশ্চিমে হেলে বলছেন— নমো, সমস্ত সকালের আলো পৃথিবীর মাটিতে লুটিয়ে প'ড়ে বলছেন— নমো –' এখানে এই 'বলছেন'টা হঠাৎ যেন পূজোর ঘণ্টা বাজিয়ে দিয়ে চ'লে যায়।

১০। আণ্ডেরসেনের সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের তুলনা বার-বার এসে পড়ছে। কিন্তু একটি পার্থক্য উল্লেখ করবো। খৃষ্টান ঐতিহ্যে পাপবোধ প্রবল ; যে-মেয়ে ঘাবরা বাঁচাতে রুটি মাড়িয়েছিলো, আর লাল জুতো প'রে দেমাক হয়েছিলো যার, তাদের অতি কঠিন শাস্তি দিয়ে তবে আণ্ডেরসেন পুণ্যলোকে পৌঁছিয়ে দিলেন। আর হৃদয়হীন নির্দয় ছেলেটার উপর গণেশের শাপ লাগলো বটে, কিন্তু যে উপায়ে তার ত্রাণ হ'লো সেটা বিপদসংকুল হ'লেও মনোরম। হিন্দুর মনে নরকের ধারণা স্পষ্ট নয় : সেটা তার শক্তির কারণ, দুর্বলতারও।

১১। শুনেছি অধুনা-প্রচলিত সংস্করণে সংশোধিত হয়েছে।

১২। বর্ণপরিচয় পুস্তকে অনুপ্রাস-প্রয়োগ অপরিহার্য, তার প্রকটতাও এড়ানো সম্ভব নয়। কিন্তু 'সহজ পাঠে' অনুপ্রাস অনেকটা বিনীত হ'য়ে আছে, যেন অলক্ষ্যে কাজ ক'রে যাচ্ছে, কোথাও কোথাও স্বর-ব্যঞ্জনের নমুনাগুলি, নিজেরা অনেকটা অগোচরে থেকে, দিয়ে যায় সাহিত্যেরই স্বাদ, ছন্দেরই আনন্দ।

সংস্কৃত কবিতা ও আধুনিক যুগ

১। আমি লক্ষ করছি, এই চারজন লেখকের মধ্যে তিনজনই মার্কিন, আর

এটাকে নেহাৎ আপতনও বলা যায় না। কলম্বাস চেয়েছিলেন সমুদ্রপথে ভারতে পৌঁছতে, তাঁর প্রাপ্ত দেশকেও ভারত ব'লে ভেবেছিলেন, ভারতের সঙ্গে এই ঐতিহাসিক সম্বন্ধ মার্কিনের পক্ষে ভোলা সহজ নয় এবং যেকালে য়োরোপের পরাক্রান্ত জাতিরা প্রাচীলুণ্ঠনে লিপ্ত ছিলো, আমেরিকায় তখন ঐতিহ্য-সন্ধানের চেষ্টা চলেছে, যে-সন্ধানের প্রবক্তা ওঅল্ট হুইটম্যান, শ্বেতাঙ্গের ধর্মদ্রোহিতা ক'রে, সারা পৃথিবীকে এক ব'লে ভেবেছিলেন। বৈদেশিক সংস্কৃতি বিষয়ে অনীহামুক্তি য়োরোপে সাম্প্রতিক ঘটনা, কিন্তু মার্কিনেরা জাতি হিশেবে তরুণ ও বহুমিশ্রিত ব'লে, ও প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যময় মহাদেশের অধিবাসী ব'লে, অপরিচিত বিষয়ে প্রথম থেকেই সহজে সাড়া দিয়েছে। গ্যেটের কথা আলাদা, 'বিশ্বসাহিত্যে'র ধারণার তিনিই জনক এবং তাঁরই উত্তরসাধক টোমাস মান্ আধুনিক য়োরোপে বিশ্বচেতনার ভাস্বর প্রতিভূ।

২। আমি ভুলি নি উনিশ শতকে সুকৃতি কত প্রচুর : কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাভারতের মহৎ অনুবাদ প্রণয়ন করেন ; বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য লেখকদের অনুবাদে, অনুলিখনে ও প্রবন্ধাবলিতে সংস্কৃত সাহিত্য ও প্রাচীন ভারত সর্বসমক্ষে প্রকাশিত হয়। কিন্তু তৎকালীন মনীষীরা যেন ধ'রে নিয়েছিলেন যে প্রাচীন ভারতে যা-কিছু ছিলো তা-ই মহিমান্বিত : তাঁরা অতীতকে শ্রদ্ধা করতে শিখিয়েছিলেন, যাচাই করতে শেখান নি। রেলগাড়ি-টেলিগ্রাফের যুগে সংস্কৃত সাহিত্যের সংলগ্নতা কোথায়, এ-প্রশ্ন তাঁদের মনে জাগে নি ; তাঁদের মুখে আমরা শুনেছি শুধু বর্তমানের নিন্দা ও লুপ্ত তপোবনের স্তবগান। এই মনোভাবের প্রকৃষ্ট উদাহরণ রবীন্দ্রনাথ, তাঁর সমগ্র রচনাবলি অন্বেষণ করলে দেখা যাবে, শুধু একটি স্থলে 'কালিদাসের কালে'র তুলনায় স্বকালকে তিনি প্রশ্রয় দিয়েছেন (যদিও তির্যক পরিহাসের ভঙ্গিতে) ; কিন্তু 'বিদুষী বিনোদিনী'র সান্ত্বনা সত্ত্বেও 'উজ্জয়িনীর কানন-ঘেরা বাড়ি' বা কবিতাপাঠান্তে নায়িকার হাত-থেকে-পাওয়া 'বেলফুলের মালা'র জন্য তাঁর আক্ষেপ শেষ পর্যন্ত কিছুতেই ফুরোয় না। সংস্কৃত সাহিত্যের কথা উঠলে এক মুগ্ধ আবেশ তাঁকে আচ্ছন্ন করে ; তাঁর 'মেঘদূত' নামক কবিতায় ও প্রবন্ধে এমন কিছু নেই যা 'মেঘদূতম্'-এ না আছে, এবং 'মেঘদূতম্'-এ এমন অনেক কিছু আছে যা তাঁর রচনা দুটিতে নেই। যৌনতা ও ইন্দ্রিয়বিলাস ছেঁটে দিলে 'মেঘদূত'-এর কঙ্কালমাত্র বাকি থাকে, আর কালিদাসের যা বাকি থাকে ; তা আর যা-ই হোক তাঁর চরিত্র নয়।

৩। 'The *Bhagavad-Gita* is the second greatest philosophical poem in my experience' —এলিয়টের মতে প্রথমটি অবশ্য 'দি ডিভাইন কমেডি'। লক্ষণীয়, সাহিত্যিক কারণে যাঁরা বাইবেল পড়েন বা তার প্রশংসা করেন এলিয়ট তাঁদের পক্ষপাতী নন, কিন্তু ঐশ্বরিক মহিমা থেকে বিশ্লিষ্ট ক'রে গীতাকে তিনি কবিতা হিশেবেই দেখেছেন ব'লে আমরা তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।

১। এই উদ্দেশ্য মানে সুস্পষ্ট কোনো বিষয় নাও হ'তে পারে, অনেক সময় শুধু একটি অনুভূতি থেকেই লক্ষ্য পায় রচনা, পায় সার্থকতার পক্ষে প্রয়োজনীয় সংহতি। উদাহরণত তুলনা করা যাক সত্যেন্দ্রনাথের 'তুলতুল টুকটুক / টুকটুক তুলতুল / কোন ফুল তার তুল / তার তুল কোন ফুল / টুকটুক রঙ্গন / কিংশুক ফুল্ল / নয় নয় নিশ্চয় / নয় তার তুল্য', আর রবীন্দ্রনাথের 'ওগো বধু সুন্দরী, / তুমি মধুমঞ্জরী, / পুলকিত চম্পার লহো অভিনন্দন / পর্ণের পাত্রে / ফাল্গুনরাত্রে। মুকুলিত মল্লিকা-মাল্যের বন্ধন।' এ-দুটি একই ছন্দে লেখা, প্রায় একই রকম খেলাচ্ছলে রচিত, আর কোনোটিতেই স্পর্শসহ কোনো বক্তব্য নেই। কিন্তু কেন যে দ্বিতীয়টি ছন্দের আদর্শ হিশেবেও অতুলনীয়রূপে বেশি ভালো হয়েছে তার কারণ শুধু অনুপ্রাস আর যুক্তবর্ণের বিতরণ দিয়েই বোঝানো যাবে না, তার কাব্যগুণের কথাটাই এখানে আসল। প্রথম উদাহরণটি অনুভব ক'রে লেখা হয় নি, নেহাৎই যান্ত্রিকভাবে বানানো হয়েছে, তাই ওর ছন্দটাও এমন কাঁচা, এমন বালকোচিত। 'ওগো বধু সুন্দরী'তে প্রাণের যে-স্পর্শটুকু আছে, যার জন্য ওটি কবিতা হ'তে পেরেছে, তার ছন্দনৈপুণ্যের মূল কারণটা সেখানেই খুঁজতে হবে। কথাটা এই যে ভালো কবি না-হ'লে ভালো ছন্দও লেখা যায় না; যিনি যত বড়ো কবি কলাকৌশলেও তত বড়োই অধিকার তাঁর; আর যিনি শুধু ছন্দ লেখেন, আর সেইজন্য 'ছন্দোরাজ' আখ্যা পেয়ে থাকেন, তাঁর কাছে— শেষ পর্যন্ত— ছন্দ বিষয়েও শেখবার কিছু থাকে না।

২। অবশ্য একটি বিরুদ্ধ ভাবও দেশের মধ্যে একই সময়ে সক্রিয় ছিলো, কিন্তু তার সমস্তটাই সমালোচনার ক্ষেত্রে, আর সেই সমালোচনাও বুদ্ধিমান নয়, শুধু ছিদ্রান্বেষী। যেটা সাহিত্যের পক্ষে প্রয়োজনীয় ছিলো, সেটা রবীন্দ্রনাথের 'বিরুদ্ধে' যাওয়া নয়, রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত রূপ চিনিয়ে দেয়া। এইখানে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি বা বিপিনচন্দ্র পাল কোনো সাহায্য করেন নি ব'লেই বাংলা কবিতার ভাঙা-গড়ায় তাঁরা একটুও আঁচড় কাটতে পারলেন না।

৩। এর আগের লাইনেই অমিত রায় বলছে, 'এ কথা বলবো না যে পরবর্তীদের কাছ থেকে আরো ভালো কিছু চাই, বলবো অন্য কিছু চাই।' এটা একেবারেই খাঁটি কথা। কবিতার সঙ্গে কবিতার তুলনা করলে ভালো আর আরো-ভালোর তফাৎটা তেমন জরুরি নয়, সমগ্রভাবে কবির সঙ্গে কবির তুলনাই এই তারতম্যের প্রয়োগের ক্ষেত্র। অর্থাৎ অন্যান্য বাঙালি কবিদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যদিও অপরিমেয় ব্যবধান, তবু যে-কোনো ক্ষুদ্র কবির কোনো একটি ভালো কবিতা রবীন্দ্রনাথেরই 'সমান' ভালো হ'তে পারে, যদি তাতে বৈশিষ্ট্য থাকে, থাকে চরিত্রের পরিচয়। আর এ-বিষয়েও সন্দেহ নেই যে ফজলি আম ফুরোবার পর চালান-দেয়া মান্দ্রাজি আম অথবা আম্রগন্ধী সিরাপের চাইতে ঢের ভালো ঋতুপন্থী, প্রকৃতিজাত

আতাফল, যেমন ভালো, মধুসূদনের পরে, 'বৃত্রসংহারে'র চাইতে 'সন্ধ্যাসংগীত'। 'শেষের কবিতা'য় অমিত রায়ের সাহিত্যিক বক্তৃতাটিতে 'কল্লোল'কালীন আন্দোলনেরই একটি বিবরণ দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ— যদিও পরিহাসের ছলে, আর অবশ্য সাহিত্যের ইতিহাসের একটি সাধারণ নিয়মও লিপিবদ্ধ করেছেন। নিবারণ চক্রবর্তীর ওকালতি ভালোই হয়েছিলো, কিন্তু বক্তৃতার পর কবিতাটি যথেষ্ট পরিমাণে অ-রাবীন্দ্রিক হ'লো না ব'লেই তার মামলা ফেঁশে গেলো শেষ পর্যন্ত।

জীবনানন্দ দাশ-এর স্মরণে

১। উদ্ধৃতি দুটোতে বানানের সংগতি রক্ষা করা হ'লো।

২। তাঁর মধ্য পর্যায়ের কবিতায় মাঝে-মাঝে একটি সংক্ষুব্ধ বিবমিষা লক্ষ্য করা যায়— আসলে তার আরম্ভ 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র সময়েই, সেই সময়েই 'অন্ধকার' কবিতা লিখেছিলেন, যেখানে 'সূর্যের রৌদ্রে আক্রান্ত পৃথিবী'তে কোটি-কোটি শূয়ারের আর্তনাদে'র 'উৎসব' দেখে তিনি 'অন্ধকারের অনন্ত মৃত্যু'র ভিতর মিশে যেতে চেয়েছিলেন। তারই কিছুকাল পরে 'আদিম দেবতারা' কবিতায় তীব্র হ'য়ে উঠলো জীবন ও কবিতার দ্বন্দ্ববোধজনিত বেদনা :

> অবাক হয়ে ভাবি, আজ রাতে কোথায় তুমি ?
> রূপ কেন নির্জন দেবদারু-দ্বীপের নক্ষত্রের ছায়া চেনে না—
> পৃথিবীর সেই মানুষীর রূপ ?
> স্থূল হাতে ব্যবহৃত হয়ে— ব্যবহৃত— ব্যবহৃত— ব্যবহৃত হ'য়ে
> ব্যবহৃত— ব্যবহৃত—
> আগুন বাতাস জল, আদিম দেবতারা হো হো ক'রে হেসে উঠল :
> 'ব্যবহৃত – ব্যবহৃত হয়ে শূয়ারের মাংস হয়ে যায় ?'

'মহাপৃথিবী' ও 'সাতটি তারার তিমির'-এর অনেক কবিতাতেই এই বিবমিষা বা বিদ্রূপের আঘাত পড়েছে ; তাঁর প্রৌঢ় বয়সের রচনার মধ্যে এটিকে একটি প্রধান সুর বললে ভুল হয় না।

৩। উপমা ও উৎপ্রেক্ষাকে আলাদা ক'রে দেখছি এখানে, উৎপ্রেক্ষা ও চিত্রকল্পেও তফাৎ আছে। 'হাঙরের ঢেউ' বা 'তোমার হৃদয় আজ ঘাস' বড়ো অর্থে উপমা হ'তে পারে, কিন্তু ব্যাকরণগত অর্থে নয় ; আর সেই বড়ো অর্থ নিলে এ কথাই বলতে হয় যে কবিতার ভাষাই উপমা।

৪। অর্থাৎ, এক হিশেবে তিনি বাংলা কাব্যের প্রথম খাঁটি আধুনিক।

ঐশ্বর্যের দারিদ্র্য : দারিদ্র্যের ঐশ্বর্য

১। পিতার সঙ্গে শেষ সাক্ষাতের সময় কৃষ্ণ তাঁকে শুধু এই ক-টি কথা বলেছিলেন (মৌষল : ৪) : 'যতক্ষণ অর্জুন এসে না-পৌঁছন আপনি এখানে পুরস্ত্রীদের রক্ষা করুন ; বলরাম বনের মধ্যে আমার প্রতীক্ষায় আছেন, আমি তাঁর কাছে

যাই। বহু কুরুবীরের নিধনকাণ্ড আমি দেখেছি, আজ যদুকুলের বিনষ্টিও দেখলাম। এখন আমি বলরামের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে তপস্যা করবো।' অর্জুনের প্রতি বসুদেবের ভাষণটিতেও (মৌষল : ৬) কোনো বিবরণ প্রকাশ পেলো না ; কৃষ্ণ-বলরামের মৃত্যুর কোনো উল্লেখ নেই তাতে, কৃষ্ণ তাঁর স্বকুলের ধ্বংস উপেক্ষা করলেন ব'লেই তাঁর শোচনা। 'তিনি (কৃষ্ণ) আমাকে বালকদের সঙ্গে এখানে রেখে যে কোথায় গেলেন তাও আমি জানি না—' বসুদেবের এই উক্তিটি লক্ষণীয়।

পরবর্তী অংশে বসুদেব, বলরাম ও কৃষ্ণের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন ক'রে অর্জুন সপ্তম দিনে নারীবৃন্দ-সমেত দ্বারকা ত্যাগ করলেন, কিন্তু পুঁথির মধ্যে এমন কোনো ইঙ্গিত নেই যে ইতিমধ্যে সব ঘটনা তিনি জানতে পেরেছিলেন।

২। 'হে মহামতি (অর্জুন), কাল সর্বপ্রাণীকুল বিনষ্ট করে, আমি কালবন্ধন চিন্তা করছি, তোমার পক্ষেও তা দর্শনযোগ্য।' —শ্লোকটির নিকটতম আক্ষরিক অনুবাদ এইরকম দাঁড়াবে। 'দেহত্যাগ', 'মৃত্যু' প্রভৃতি শব্দ পাওয়া যায় নীলকণ্ঠের টীকায়, মূল লেখনে নয়। এখানে, এবং অন্য অনেক স্থলেও, কালীপ্রসন্ন অনুবাদ ব্যাখ্যায় পরিণত হয়েছে।

লক্ষণীয়, যুধিষ্ঠিরের নির্দেশটি শুধু অর্জুনের উদ্দেশেই উক্ত হ'লো, একবচনে —দুই বিপরীতমতি প্রতিভূ-ভ্রাতা হঠাৎ যেন এক সূত্রে আবদ্ধ হলেন। এও বিস্ময়কর যে অর্জুন এর উত্তরে শুধু 'কাল কাল' ব'লে উঠলেন ; আর অন্য ভ্রাতারা তৎক্ষণাৎ সম্মত হলেন এই অস্পষ্ট-ঘোষিত প্রস্তাবে— তিনটিমাত্র শ্লোকের মধ্যে এত বড়ো একটা সিদ্ধান্ত উত্থাপিত ও গৃহীত। যেমন অনেক সময় মহাভারতের অতিবিস্তারে আমরা ক্লান্ত হ'য়ে পড়ি, তেমনি— কোনো-কোনো চরম মুহূর্তে— তার সংকেত-ভাষণও আমাদের নিশ্বাস কেড়ে নেয়।

৩। মহাভারতের শেষ তিনটি সর্গ গ্রন্থের মধ্যে ক্ষুদ্রতম : শ্লোকসংখ্যা যথাক্রমে ২২৭, ১১০ ও ৩০৩।

৪। পরি : ১৮ ('নীলচক্ষু নকুল') দ্র।

৫। মূল সংস্কৃতে এদের কখনো 'দস্যু' কখনো আভীর' বলা হয়েছে। 'আভীর' শব্দের প্রচলিত অর্থ গোয়ালা, হরিচরণ ব্যুৎপত্তিগত অর্থ দিয়েছেন 'ভীতি-উৎপাদন-কারী'। এরা বৈদেশিক জাতি ব'লে অনুমিত, এদের আদি বাসস্থান পঞ্চনদভূমি— সেখানেই যদুরমণীরা অপহৃত হন। আশ্ব : ২৯-এ কথিত আছে, পরশুরামের ভয়ে দ্রাবিড় আভীর পুণ্ড্র ও শবরজাতিরা ক্ষাত্রধর্ম পরিহার ক'রে শূদ্রত্বে অধঃপতিত হয়। গোপালক জাতির পুরুষগণ আজ পর্যন্ত যষ্টিযুদ্ধে দুর্ধর্ষ ব'লে কথিত - মৌষলপর্বেও যষ্টিপ্রহারের উল্লেখ আছে।

মনুসংহিতার দশম অধ্যায়টি নৃতত্ত্বের এক আকর-গ্রন্থ ভারতের এমন কোনো সংকর-বা উপজাতি নেই যার সংজ্ঞার্থ সেখানে না-পাওয়া যায়। সেখানে দেখি, অম্বষ্ঠকন্যার গর্ভজাত ব্রাহ্মণসন্তানের নাম আভীর, আর অম্বষ্ঠ বলে তাদের যাঁরা ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যাপত্নীর গর্ভে জন্মেছেন (শ্লোক ১৫ ও ৮। অম্বষ্ঠজাতির বৃত্তি

চিকিৎসা (শ্লোক ৪৭), আধুনিক বৈদ্যজাতির এ'রাই মনে হয় পূর্বপুরুষ। আভীরদের বৃত্তি বিষয়ে মনু কিছু বলেন নি, কিন্তু তাঁর মতেও দ্রাবিড়, ঔড্র, পৌণ্ড্রক ইত্যাদি অনেকগুলি জাতি ক্রিয়ালোপের ফলে ক্ষত্রিয়াংশে জ'ন্মেও শূদ্রত্ব লাভ করে, এবং সেই একই কারণে সদ্বংশজাত লোকেরাও 'দস্যু' ব'লে গণ্য হ'য়ে থাকেন— তারা আর্যভাষী বা ম্লেচ্ছভাষী যা-ই হোন না (শ্লোক ৪২-৪৫)।

৬। ভাগবতপুরাণে এই স্বীকারোক্তিটি বিস্ফারিত আকারে পাওয়া যায় ; দ্বারকা থেকে হস্তিনায় ফিরে অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে বলছেন (১ : ১৫) :

'মহারাজ, বন্ধুরূপী হরি আমাকে বঞ্চনা করেছেন। তিনি হরণ করেছেন আমার সেই তেজ, যা দেবগণেরও বিস্ময় জাগাতো। ···তাঁরই বলে আমি জয় করেছিলাম স্বয়ংবরসভায় দ্রৌপদীকে, দেবগণকে পরাভূত ক'রে খাণ্ডববন দগ্ধ করেছিলাম,··· তাঁরই কারণে মহেশ্বর আমাকে পাশুপত অস্ত্র দান করেন, তাঁরই প্রভাবে আমি সশরীরে স্বর্গধামে গিয়ে ইন্দ্রের সঙ্গে অর্ধাসনে বসেছিলাম' —ইত্যাদি, ইত্যাদি। —কিন্তু ভাগবতের পুঁথির মধ্যে উক্ত ঘটনাসমূহের কোনো বিবৃতি নেই ব'লে কথাগুলো মর্মস্পর্শী হ'তে পারে নি ; তাছাড়া, যে-সব ব্যাপারে কৃষ্ণের কোনো আখ্যানগত ভূমিকা ছিলো না, তাও কৃষ্ণ-কৃত ব'লে ধ'রে নিলে অর্জুনের বাস্তবতাকেই উড়িয়ে দেয়া হয়। 'তিনিই সব—' এই কথাটা মহাভারতে প্রচ্ছন্ন রাখা হয়েছে ব'লেই মৌষলপর্বের অর্জুন এমন বিশ্বাস্যভাবে শোচনীয় ও শোকার্ত।

৭। কিন্তু কৌরবপক্ষের লোকেরা যে এ-বিষয়ে অবহিত ছিলেন, ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি সঞ্জয়ের একটি উক্তি থেকে তা বোঝা যায় (দ্রোণ : ১৮৩) :

'অর্জুন কৃষ্ণ-কর্তৃক রক্ষিত হ'য়েই সম্মুখীন শত্রুগণকে পরাজিত ক'রে থাকেন। রাজা দুর্যোধন, শকুনি, দুঃশাসন ও আমি— আমরা প্রতিদিনই সূতপুত্রকে বলতাম : "হে কর্ণ, তুমি সমস্ত সৈন্য পরিত্যাগ ক'রে ধনঞ্জয়কে সংহার করো। অথবা অর্জুনকে ছেড়ে বিনাশ করো কৃষ্ণকে। কৃষ্ণ পাণ্ডবদের মূলস্বরূপ এবং পাঞ্চালেরা পুত্রস্বরূপ। কৃষ্ণই পাণ্ডবদের আশ্রয়, কৃষ্ণই বল, কৃষ্ণই নাথ এবং পরমগতি।" '

যুধিষ্ঠিরও যুদ্ধের পরে বুঝেছিলেন যে অর্জুনের শৌর্য আসলে কৃষ্ণনির্ভর। তাঁর একটি উক্তি এ-প্রসঙ্গে উদ্ধৃতিযোগ্য (শল্য : ৬৩) : 'হে জনার্দন, মহাবীর দ্রোণ ও কর্ণ যে-সব ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করেছিলেন তা তুমি ছাড়া আর কে সহ্য করতে পারতো ! তোমারই জন্য সংশপ্তকগণ পরাস্ত হয়েছে, এবং অর্জুন অপ্রতিহতভাবে যুদ্ধ করতে পেরেছেন।'

৮। ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥

(গী : ১৮ : ৬১)

—'হে অর্জুন, ঈশ্বর সর্বজীবের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হ'য়ে যন্ত্রারূঢ় [পুতুলের মতো] সর্বজীবকে মায়ার দ্বারা চালনা করেন।'

কথাটা আমরা মার্কণ্ডেয় মুনির মুখে আগেও শুনেছিলাম (বন : ১৮৯), তিনি কৃষ্ণকে বলেছিলেন 'ক্রীড়াপরায়ণ'। বন : ১২-তে দ্রৌপদীও বললেন যে বালকের পক্ষে যেমন খেলার পুতুল, তেমনি কৃষ্ণের পক্ষে ব্রহ্মাদি দেবগণ। মার্কণ্ডেয় মুনির উক্তির পিছনে ছিলো এক বালকের উদরে বিশ্বরূপদর্শনের অভিজ্ঞতা ; কিন্তু দ্রৌপদীর সে-রকম কোনো দর্শন ঘটে নি, তাই তাঁর মুখে কথাটা নেহাৎ স্তাবকতার মতো শোনালো।

৯। টী ১২২, চতুর্থ অনুচ্ছেদ দ্র।

১০। 'রাক্ষস' বলতে আমরা সাধারণত কোনো বিকটদর্শন নরমাংসভুক প্রাণীকে বুঝি — এবং মহাভারত-রামায়ণের অনেক বর্ণনাও তদনুরূপ। ব্যুৎপত্তিগত অর্থে তারাই রাক্ষস যাদের দৃষ্টি থেকে যজ্ঞের হবি রক্ষণীয় : ঋগ্বেদ ৭ : ১০৪ ও ১০ : ৮৭ প'ড়ে মনে হয় অরণ্যবাসী অগ্নিপূজক আদিম আর্যেরা নিশাচর হিংস্র জন্তুকেও রাক্ষস বলতেন।

কিন্তু পুরাণসাহিত্যে 'রাক্ষসে'র অর্থ আরো ব্যাপক। একদিকে তারা যক্ষ-কিন্নরাদি প্রীতিকর প্রাণীদের সগোত্র, মানুষের ঊর্ধ্বে ও দেবতার নিম্নে তাদের স্থান ; অন্যদিকে তারা বিশেষভাবে ভয়াবহ ও ঘৃণাভাজন। কৃষ্ণের ভাষায় তামসিক প্রকৃতির মনুষ্যমাত্রেই 'রাক্ষস' (গীতা : ৯ : ১২) ; এবং যারা অনার্য বা আধুনিক ভাষায় আদিবাসী, অথবা আর্যবংশীয় হ'য়েও ব্রাহ্মণ্য ধর্মে অবিশ্বাসী, তারাও আমাদের এপিক দুটিতে 'রাক্ষস' ব'লে অভিহিত। এই অর্থেই রাবণ ও চার্বাক মুনিকে রাক্ষস বলা হয়েছে সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। অবশ্য শুধু তাঁরাই নন, রামানুচর বানর ও মহাভারতোক্ত নাগেরাও যে অনার্য বা আর্যবিধিচ্যুত মনুষ্যকুলেরই নামান্তর, তা প্রত্নতাত্ত্বিকেরা ব'লে না-দিলেও আমরা অনুমান করতে পারতাম — যদিও কাব্যপ্রসঙ্গে তা মেনে নিতে পারতাম না এবং এখনো পারি না।

রাক্ষসদের একটি চরিত্রলক্ষণ হ'লো অত্যধিক বলপ্রদর্শন — আজকালকার চলতি বাংলায় যাকে বলে 'জোয়ানকি দেখানো'। এই লক্ষণটি ভীমের মধ্যে পুরোমাত্রায় বিদ্যমান, ভীমকে 'রক্তপ রাক্ষস' ব'লে বঙ্কিম কোনো ভুল করেন নি ; কিন্তু তিনি পাণ্ডুপুত্র ব'লেই কৃষ্ণের কুদৃষ্টিতে পড়লেন না।

১১। ঘটনাটি তিনটি মাত্র শ্লোকে সুন্দরভাবে বলা হয়েছে — অনেক কথাই প্রচ্ছন্ন, কিন্তু স্পষ্ট একটি ছবি পাওয়া যায়। শাল্ব, শল্য, পৌণ্ড্র ইত্যাদি নৃপতিরা যখন ধনুতে জ্যারোপণও করতে পারলেন না, তখন —

সর্বান্ নৃপাংস্তান্ প্রসমীক্ষ্য কর্ণো
ধনুর্ধরাণাং প্রবরো জগাম।
উদ্ধৃত্য তূর্ণং ধনুরুদ্যতং তৎ
সজ্যং চকারাশু যুযোজ বাণান্ ॥

দৃষ্ট্বা সূতং মেনিরে পাণ্ডুপুত্রা
ভিত্বা নীতং লক্ষ্যবরং ধরায়াং।
ধনুর্ধরা রাগকৃতপ্রতিজ্ঞ-
মত্যগ্নিসোমার্কমথার্কপুত্রম্ ॥
দৃষ্ট্বা তু তং দ্রৌপদী বাক্যমুচ্চৈ-
র্জগাদ নাহং বরয়ামি সূতং।
সামর্ষহাসং প্রসমীক্ষ্য সূর্যং
তত্যাজ কর্ণঃ স্ফুরিতং ধনুস্তৎ ॥

(আদি : ১৮৬ : ২১-২৩)

'—নৃপগণকে ব্যর্থ দেখে মহাধনুর্ধর কর্ণ অগ্রসর হলেন ; ধনু উত্তোলন ক'রে অচিরাৎ যোজনা করলেন বাণ ;

'অনুরাগবশত কৃতপ্রতিজ্ঞ, অগ্নি সোম ও সূর্য-সদৃশ সূর্যপুত্র সূতকে শরযোজনা করতে দেখে পাণ্ডবেরা ভাবলেন ইনি নিশ্চয়ই লক্ষ্যটিকে ভূপাতিত করবেন।

'[কিন্তু] দ্রৌপদী তাঁকে দেখে উচ্চস্বরে ব'লে উঠলেন, "আমি সূতপুত্রকে বরণ করবো না।" আর কর্ণ, সরোষে [ঈষৎ] হাস্য ক'রে, সূর্যের দিকে [একবার] তাকিয়ে স্পন্দিত ধনু পরিত্যাগ করলেন।'

১২। কবচ কুণ্ডলের বিনিময়ে ইন্দ্র কর্ণকে শক্তি অস্ত্র দিয়েছিলেন এই শর্তে যে কর্ণের করচ্যুত হ'য়ে তা একটিমাত্র শত্রুকে বধ ক'রে আবার তাঁরই (ইন্দ্রের) কাছে ফিরে আসবে (বন : ৩০৯)। পাঠক হয়তো ভুলে যান নি যে এই দিব্যাস্ত্রেই অযোগ্য ঘটোৎকচ নিহত হয়েছিলো।

কর্ণের অভিশাপ-বৃত্তান্ত শান্তি : ২-৫এ বিবৃত আছে।

১৩। আমি মান্-এর যে-উপন্যাসটির কথা ভাবছি সেটি অবশ্য দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত 'ডক্টর ফাউস্টুস'। উপন্যাসের নায়ক লেভেরক্যুহ্ন এক সুরকার : তিনি বোদলেয়ার ও নীটশের মতো প্রথম যৌবনে উপদংশ রোগে আক্রান্ত হন (সেটাই তাঁর 'শয়তান') ; কুড়ি বছর ধ'রে অলোকসামান্য সৃষ্টি-প্রতিভার পরিচয় দেবার পর সেই গুপ্ত ব্যাধির বিষক্রিয়ায় জড়বুদ্ধি ছন্নমস্তিষ্কে পরিণত হ'য়ে আরো দীর্ঘকাল জীবিত থাকেন। অন্য এক সুরে, মান্-এর ফাউস্ট তাঁর জন্মভূমি জর্মানি ; সারা উনিশ শতক ধ'রে জ্ঞান-বিজ্ঞান শিল্পকলার সকল ক্ষেত্রে জর্মানিতে যে-সৃষ্টিশীলতার বিস্ফোরণ ঘটেছিলো, হিটলার ও নাৎসিবাদের ভয়াবহ মুদ্রা গুনে-গুনে বিশ শতকে তারই মূল্য তাকে দিতে হ'লো।

১৪। বিশ্বরূপদর্শনের পরে অর্জুন স্বেদাক্ত দেহে বাষ্পাকুল স্বরে ব'লে উঠেছিলেন :

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি

অজানতা মহিমানং তবেদং
মযা প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥
যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি
বিহারশয্যাসনভোজনেষু।
একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং
তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্ ॥
(গী : ১১ : ৪১-৪২)

— 'আপনার মহিমা না-জেনে, ভ্রান্তি অথবা প্রণয়বশত, আমি আপনাকে বন্ধু ব'লে ভেবেছি, সম্বোধন করেছি দুর্বিনীতভাবে কৃষ্ণ, যাদব, সখা ব'লে ;

'অসম্মান করেছি আপনাকে, নিভৃতে বা লোকসমক্ষে. আসন বিহার শয্যা ও ভোজনের সময়— হে অপ্রমেয় অচ্যুত, সেজন্য আমাকে ক্ষমা করুন।'

কিন্তু এই উপলব্ধি মুহূর্তকাল পরে মিলিয়ে গিয়েছিলো— তা না-হ'লে অর্জুনের জীবন অচল হ'য়ে যেতো, মহাভারতের কাহিনী আর এগোতে পারতো না। অর্জুনের পক্ষে যুদ্ধবিমুখতা যেমন অস্বভাবী, ঈশ্বরচেতনাও তেমনি অসহনীয়।

১৫। অর্জুন দ্বারকায় এসে যদুকুলের রমণী ও শিশুদের উদ্ধার ক'রে নিয়ে যাবেন (মৌষল ৬), কৃষ্ণের এই শেষ নির্দেশটিতে কৃষ্ণের বিদ্রূপ স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো, কেননা তিনি নিশ্চয়ই জানতেন যে তাঁর অন্তর্ধানের সঙ্গে-সঙ্গে অর্জুনের ক্ষমতাও লুপ্ত হবে।